ফিরে ফিরে চাই

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : শ্রীরেবন্ত গোস্বামী

মুদ্রণ : ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

"শুধায়ো না, কবে কোন গান
কাহাকে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান

ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয় 'কথাসাহিত্যে'। তারপর কয়েক বৎসর পরে প্রখ্যাত বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যখন গল্পভারতীর সম্পাদক, তখন তিনি আমাকে জীবনকথা লিখতে বলেন। তখন শুরু করি। তার পর পত্রিকার সম্পাদক হন সত্যেন রায়—ভারতীভবনের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁর অনুরোধে লিখে চলি এই জীবনকথা।

বহুকাল পরে বন্ধুবর শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে 'ফিরে ফিরে চাই' সম্বন্ধে লিখলে তিনি রাজী হলেন বই ছাপতে তৎক্ষণাৎ।

এই বইটির মুদ্রণাদি ব্যাপারের দায়িত্ব পড়ে শ্রীভানু রায়ের উপর। তিনি নিরলস চেষ্টায় এই কাজ নিষ্পন্ন করেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



ফিরে ফিরে চাই

ভূমিকা

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। না-দেখা কোনো গুণ (?) গ্রাহী তরুণ সাহিত্যিক আমাকে অনুরোধ জানালেন—আমি যেন আমার আত্মকথা লিখি। পত্রটি পড়ে বেশ কৌতুক বোধ হলো। উত্তরে জানিয়ে দিলাম, 'হ্যাঁ লিখবো—আরও কিছুকাল পরে—যখন মাথার ঘিলুটা আর একটু থলথলে নরম হবে (brain-softening) ; যখন নতুন তত্ত্বকথা শোনবার ও জানবার উৎসাহ যাবে মিলিয়ে, তখন পুরানো কথা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করবো। আরও লিখলাম—যখন নতুন কথা সহজভাবে ও পুরানো কথা নতুনভাবে বলবার উৎসাহ পড়বে ঝিমিয়ে,—যখন নতুন যুগের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবার সময় পুরানো যুগের বাক্স-পড়া কথার চর্বিতচর্বণ করে বলবো—"আমাদের যুগে কী ছিল—কী দেখেছিলাম—আর এই তোমাদের কালে···" বলেই নতুন যুগের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবো—সেদিন বুঝবো ব্রেনের সেই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছি—যখন আত্মকথা লেখা যেতে পারে।

এককালের নামী, মানী, গুণী-জ্ঞানীর যশ-গৌরব চিরকাল সমভাবে চলতে পারে না। তথাচ দেখা যায় গুরুবাদী ভক্তশিষ্যর দল অচল রথকে আধুনিক পথযাত্রীদের কৌতুক ও হাস্য উদ্রেক করে টেনে নিয়ে চলেছেন সভামণ্ডপে। কিন্তু কালান্তরে নতুন শ্রোতারা এসেছে—তারা এককালের নামজাদা সাহিত্যিক, শিল্পী, ওস্তাদদের কথাবার্তা শুনে পরস্পরের মধ্যে ফিসফিসিয়ে বলবে—'পুরানো রেকর্ড—শুনেছিলাম—পাটনায়, গুসকরায়, বরাকরে বালিতে—!' এই কথা কানে আসার আগেই থামা উচিত। কিন্তু মানুষ থামতে জানে না ; কাজ ফুরুলে সে আত্মকথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়। আমিও সেই অপকর্মে প্রবৃত্ত হবো ?

'আত্মকথা' শব্দটা লিখেই মনের মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠলো। আত্মকথা অর্থাৎ মনের কথা বলবার সাহস হবে তো ? মনের গহনে স্তব্ধ ভীমরুলের চাকে নাড়া দেবে এমন দুঃসাহসিক কেউ কি আছে ? মনের পরতে-পরতে কত বৎসরের স্মৃতি অবচেতনের তলে সমাধি-শয়নে বিলীন,—সেই স্মৃতি ভাণ্ডার উজার করে ছড়িয়ে দেবার দুর্মতি কার হবে ? আর তার প্রয়োজনই বা কি ? একবার যদি মূক মন মুখর হয়ে ওঠে তো—দেখা যাবে মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত উন্মাদাশ্রমের অগণিত বদ্ধ জীব অকস্মাৎ রাজপথে বের হয়ে অসংলগ্ন কথা বলছে ! কিন্তু সে কি কথা ? না, প্রলাপ। ভাগ্যে মানুষের মনের কথা ভাষায় রূপ

নেয়। কিন্তু স্বভাবতই মানুষ ভাষাদীন—সব কথা বলতে পারে না—ভাষার দৈন্যে মনের কথা ব্যক্ত হয় না বলেই সংসার চলছে। কিন্তু তার প্রকাশের চেষ্টা বা সংগ্রাম চলছে নিরন্তর বলেই পৃথিবীতে এত সাহিত্য, এত শিল্প, এত সঙ্গীত। মানুষ ভাষার সাহায্যে মনের প্রলাপকে অবরুদ্ধ করে,—এই সংগ্রামের পর ইনিয়ে-বিনিয়ে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে-তোলা কথা ও সুর যে-রূপে প্রকাশিত হয়, তাকে স্রষ্টাই চিনতে পারে না; রচয়িতারই সন্দেহ হয়—এ কী তাঁরই কথা—না আর কারও বাণী? অবচেতনের অনুভূতি যখন স্পষ্ট-আলোকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, তখন তাকে সংযত করার জন্য রুচি, নীতি, ধর্ম, প্রেস্টিজ্ প্রভৃতি বিচিত্র এমন কি বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ ঠেলাঠেলি করে, যেন অবচেতনের রুদ্ধতা থেকে চেতনলোকে তারা আসতে না পারে। কিন্তু এতো বাধা সরিয়েও সেই অশরীরীরা রূপ পরিগ্রহ করে। তখন তাকে স্রষ্টাই চিনতে পারেন না।…সেই অরূপকে রূপ দেবার চেষ্টার শেষ হয়নি আজও। যুগ-যুগান্ত থেকে চলে আসছে 'আমি'র চাপা কান্না, 'আমার কিছু কথা আছে'—সে কথার শেষ আর হলো না। প্রেমের কবিতা আজও লিখছে নূতন ভাষায়! প্রত্যেকের মনের কোণে-লুকানো-কথা, চাপা কান্না, বীভৎস ভাবনা সশব্দে ফেটে পড়েনি—তাই তো সংসারে বাস করা যায়। কতটুকু প্রকাশ পায় ছাপার হরফে, সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সৌধে, সঙ্গীতে, সুরে, আলাপে। বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিচিত্র রূপে মানুষ আপনাকে নতুন করে দেখতে ও দেখাতে চায়। এই দেখতে চাওয়া ও দেখাতে চাওয়া থেকে অসংখ্য চারুকলা, কারুকলার, সাহিত্যের, সঙ্গীতের জন্ম। কিন্তু আমার প্রশ্ন—কতটুকু সে প্রকাশ করতে পেরেছে?

তবে কি আত্মকথা লিখবে না?…নিশ্চয়ই লিখবে!…কি লিখবে? লিখবো—আমার মত ক্ষণজন্মা মানুষ দুর্লভ! পরিবারের কুলচম্পক—বলেছিল গণৎকার। ঠিকুজি বাবা করাননি—তা থাকলে পংক্তি ধরে ধরে দেখিয়ে দিতাম চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত পরামর্শ করে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কি সুন্দর ভাবে করে গেছেন! লিখবো আমি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ছাত্র, আদর্শ পিতা, আদর্শ গৃহস্বামী—ধর্মে কর্মে হিন্দুর আদর্শস্থল! আর আত্মকথা পড়ে পাঠকদের মনে হবে দুনিয়াটা আমায় কেন্দ্র করে ঘুরছে। কবিই তো গেয়েছেন—আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। সুতরাং লেখবার অনেক জিনিস আছে।

বহু বৎসর কেটে গেছে তরুণ গুণগ্রাহীর পত্র পাবার পর আত্মকথা এতকাল লিখিনি। তবে এখন লিখতে বাসনা হয়েছে কেন? কারণটা পূর্বে বলেছি—

পুনরুক্তি করতে লজ্জা করছে, আমিই সেই যজ্ঞের বলি হয়েছি।—তবে কি এটাই তোমার 'সোয়ান সঙ্' ? কে জানে ? পাঠ শেষের পর পুনশ্চ করবার দৃষ্টান্ত সামনেই আছে। তবে একটা কথা—আয়নার পাটে মুখটা দেখা যায়—মনটা কি ধরা পড়ে আত্মকথায়—তা নিয়ে পূর্বেই যা বলবার এবং না-বলবার সবই তো বলেছি। তবুও জানাচ্ছি, প্রত্যেক মানুষই ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড বা সায়ামীজ টুইন। দুটো রূপ কেন—একই দেহে বহুরূপী সে। সমাজে চলা-ফেরা করতে করতে প্রত্যেক মানুষই অভিনেতা হয়ে ওঠে—মুখ চোখ অভিনয় করতে জানে বলে—মনের কথা সে বেশ চাপতে পারে। আবার অন্যের কথা নিজের বলে চালিয়ে দিতেও সে ওস্তাদ। মুখ দেখে কারও সাধ্য নেই তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে!—সার্কাসের ক্লাউন বা রাজার বিদূষকের কী অন্তর্দাহ চাপা আছে, তার হাস্য-পরিহাস ও ভাঁড়ামির মধ্যে তার খবর কেউ রাখে না। রঙ্গালয়ে লোকে ভাবে ওর মতো রসিক মানুষ দুটো মেলা ভার! কিন্তু রঙ্গমঞ্চের বাইরে দেখেছি তার বিষাদমাখা মুখ! আত্মকথা লেখার অর্থ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয়! এতো বৎসর পরে—জীবন-সায়াহ্নে কেন এ আত্মপ্রতারণার প্রয়াস।

সামনেটা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আর যুগপৎ অতীতটা দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। আর একটা আশ্চর্যের কথা। যেসব কথা ভুলে ছিলাম বহুকাল, কল্পনাও করিনি কখনো যে তারা স্মৃতি-সমাধি থেকে উঠে আসছে—তারা আজ সায়াহ্নে দেখা দিচ্ছে—কোথায় ছিল তারা এত কাল ? কে জানে ?

সূর্য সারাদিন রোশনাই দিয়ে অস্তাচলের পারে অদৃশ্য হবার পূর্বে সমগ্র আকাশটার দিকে চেয়ে থাকে—সে কি তাকিয়ে দেখে কী দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে এই স্বল্পকালের মধ্যে। মানুষও অন্তকালের কূলে এসে দাঁড়িয়ে 'ফিরে ফিরে চায়' অতীতের দিকে। আজ তার সামনে আশা করার কিছু নেই—যা যা পাবার তা সে পেয়ালা ভরে পেয়েছে। আজ তার কাজ নেই, কর্তব্য নেই ; তাই তার কাজের নেশাও নেই। অর্জনের পালা সারা হবার পর এখন বর্জনের বা বিদায় পালা শুরু হবে—তারই জন্য অপেক্ষা। আজ পিছন ফিরে চেয়ে দেখার মধ্যেই মনের বিলাস ও বিরাম—যে-কাল আর ফিরবে না, যে-মানুষদের সঙ্গে দেখা আর কখনো হবে না,—যে-ঘটনার পুনরাবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা নেই—তার মধ্যে মনের অভিসার—কায়াহীন ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ বিচরণের অপার আনন্দ—'সেই যে আমার নানা-রঙের দিনগুলি'কে লেখনীর রেখায় রেখায় রূপ দিতে দিতে—সেই অরূপলোকে বাসের আনন্দ উপভোগ করবো। অতীতের মধ্যে বাসের লালসা আজও রয়েছে ; হারানো দিনগুলিকে মানসলোকে পাবার—

সেই ছায়াহীন কায়াহীন স্বপ্নলোকে বাসের অবাধ স্বাধীনতা পাবার জন্ত অতীতের স্মৃতিমন্থন প্রয়াস।

বই তো লিখবে—কিন্তু তার নামকরণ কি করবে—তা ভেবেছ? রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখার মতো—গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তার নামকরণ করতে চাইছ? গৃহিণী বারান্দায় বসে তরকারী কুটছেন—তাঁকে বলি, "ওগো শুনছো—নূতন একটা বই লিখবো ভাবছি।" গৃহিণী বললেন, "গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে তো এক কুড়ি বই লিখেছ। লক্ষশ্লোকী সূর্য ভাগবত না মার্তণ্ড পুরাণ ও দশসহস্রী রামকথা লিখে কত নাম, কত মান তো পেলে—আর কেন? সমে এসে থামতে হয়; তা না হলে তাল কাটতে পারে।" আমি বললাম, "এতদিন লিখেছি পেশার জন্য, ধন, মান, নামের জন্য। সে-পালা শেষ হয়েছে, এখন 'শুধু অকারণ পুলকে' ক্ষণিকের গান শোনাবার নেশা, সেই নেশার তাগিদে সাদা কাগজ কালো করবো। এখন, যা লিখবো তার ভূমিকাটা শোন—তারপর গ্রন্থের নামকরণ কী করেছি জানতে পারবে।

"পথের পাশে সে শুয়ে: বিশাল দেহ—কিন্তু পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায়। ল্যাজে-গোবরে এক হয়ে পড়ে আছে। শীর্ণ দেহের বৃহৎ ককুদটা ভেঙে পড়েছে এক পাশে; কাঁধে ক্ষত—মাছি উড়ছে ভনভনিয়ে—তারা তাদের সুখাদ্য পাচ্ছে এর বেদনাক্ষত রক্ত পানে। মাথা নাড়ছে—সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা শিঙটা দুলছে ঠক ঠক করে—মাছিরা মুহূর্তের জন্য উড়ে যাচ্ছে—মুহূর্তপরে যথাস্থানে আসন করে নিচ্ছে। ...চোখ বুজে রোমন্থন করছে—কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কেন?... একদিন এই পথ দিয়ে তার দোসরের সঙ্গে মালবোঝাই গাড়ি টেনেছে—মাঠে দুজনে হাল চষেছে। মুনীবের ফসল ঘরে তুলেছে—বাড়ির মেয়েকে গাড়ি করে বরের ঘরে পৌঁছিয়ে এসেছে।...পরের ঘরের কচি বউ বাড়িতে এনেছে। আজ সেই বধুর কর্ত্রীত্বে সে আজ গৃহছাড়া;—কোথায় তার সাথী, কোথায় তার মুনীব, কোথায় তার রাখাল ছেলে যে সারাদিনের পর তাকে দানাপানি দিয়ে তুষ্ট করে ঘরে যেতো। এই সবই ভাবছে হয়তো—কে জানে? মানুষ কি এই মূক প্রাণীদের বেদনার ভাষা পড়তে পারে?"

এইটুকু ভূমিকা পড়ে গৃহিণীকে বললাম, "বলো তো ও কি ভাবছে—ঐ পথের ধারে বসে?" গৃহিণী এঁচোড়ের আঠা সাফ করতে করতে বললেন, "ভাবছে আবার কি! যা খেয়েছে—তাই রোমন্থন করছে—।" আমি বেশ উচ্চস্বরেই বলে উঠলাম, 'ইউরেকা, ইউরেকা—পেয়েছি পেয়েছি—বই-এর নাম পেয়েছি 'স্মৃতি-রোমন্থন'।" গৃহিণী অতি গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মহিলা—একে

তত্ত্ববাগীশ পণ্ডিতের কন্যা, তাতে স্বয়ং-বিদুষী। বললেন, "স্মৃতি কি রোমন্থনের বিষয়! তোমার ছ্যাবলামি আর যাবে না?" আমি বললাম, "আমাকে আশীর্বাদ করার অধিকার শাস্ত্রে তোমার থাকলে বলতাম—আশীর্বাদ করো শেষ দিন পর্যন্ত এই ছ্যাবলামি যেন বজায় রাখতে পারি। গর্দানের উপর কুড়ুল পড়বে—তখন যে লোকটি বলেছিল—'সাবধান দাড়িটা কেটো না'—তাকে রসিকই বলবো।...আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো লক্ষশ্লোকী সূর্য ভাগবত কী ছ্যাবলামি করে লেখা? হ্যাঁ—তবে তোমাদের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় মধ্যযুগীয় মত-বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা-ঠুট্টি করি; তা করবোই। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি রাখতে পারি নে—তাই ছ্যাবলামি আপনা থেকে প্রকাশ পেয়ে যায়।"

গৃহিণী শুধুলেন, "আমাদের বিংশশতককে নিয়ে তোমার হাসি পায়—অন্যদের?"

অন্যদের কাণ্ডকারখানা দেখে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে। কেউ সপ্তম শতক, কেউ খৃষ্টপূর্বক শতকের বাসিন্দা—অচল মত আঁকড়ে বসে আছেন, তাঁরা 'বিশ্বাস করেন,—এর উপর আর কথা চলে না। এমন করে যারা বুদ্ধির বলি দেয়, তাদের দেখলে ও তাদের কথা শুনলে হাসি পাবে না?

গৃহিণী বললেন, "মেয়েরাই বুঝি দোষী আর পুরুষরা?" আমি বললাম, "এখন মেয়ে পুরুষ নিয়ে তর্কে প্রবেশ করবো না—এখন আমার মাথায় ঘুরছে বইটার কি নাম দেবো...ঠিক...স্মৃতি-রোমন্থন—পুরানো কথা ভুলে যাওয়া দিন-গুলোকে জাইয়ে তোলার নাম আর কী দেবো? কেউ লিখেছেন জীবনস্মৃতি, কেউ বলেছেন স্মৃতিচারণ, 'স্মৃতি মন্থন' করেছেন কেউ—আমি আর এক ধাপ আগিয়ে তার নাম রাখলাম 'স্মৃতি-রোমন্থন' ফিরে ফিরে চাই।

আমি গৃহিণীকে বললাম, "গ্রন্থের ভূমিকা শুনলে তো; এবার উপসংহারটা শোন।" গৃহিণী আঙুলে এঁচোড়ের আঠা তেল দিয়ে সাফ করতে চেষ্টা করছেন। বললেন, "কী রকম? ভূমিকার পরেই উপসংহার—আদিকাণ্ডের পরেই উত্তরকাণ্ড—মাঝের কাণ্ডগুলো গেল কোথায়?" তোমার বই কোথায়? কথার সুরে বুঝলাম মনটা নরম হয়েছে এবং আমার লেখনী থেকে আর একটি মহান্ সৃষ্টি উৎসারিত হবে (প্রত্যেক স্ত্রী মনে করেন তাঁর স্বামীরত্নের লেখার কদর হতভাগ্য কাগজ-ওয়ালারা করলে না, তাই যা-তা' লেখে) ভেবেই পুলকিত হচ্ছেন। আমি বললাম, "ওগো তত্ত্ববাগীশের কন্যা, আদিও অস্পষ্ট অন্ত্যও অজ্ঞাত—কেবল মধ্যটাই ব্যক্ত এটা তো জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত শুনে আসছো! আমি আগা-গোড়া ঠিক করে বেঁধে মধ্যটা গড়বো ঠিক করেছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—মধ্যটাকে

ধরাছোঁয়া যায় না যে। নদীর পাশে দাঁড়িয়ে নদীর জল তো দেখেছো চূর্ণী নদীতে—কিন্তু যে জল ও ঢেউকে এই মুহূর্তে দেখলাম—পরমুহূর্তে সে সেখানে নেই ; কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিকই আছে—নদী আছে জল নেই।"

গৃহিণী এঁচোড়ের আঠা থেকে আঙুলগুলিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বললেন, "ওগো তত্ত্ববাগীশের জামাতা, তোমার মুখে তত্ত্বকথা ! ভূতের মুখে রামনাম সবই সরে সরে যাচ্ছে বলেই তো একে সংসার বলে। চিরকাল তো তত্ত্ববাগীশের তত্ত্ব নিয়ে ঠাট্টা করে এসেছ—আজ কি মত বদলালো নাকি ?"

"মোটেই না। কোন তত্ত্বই স্থায়ী নয়। তবে সে তর্কের মধ্যে আজ প্রবেশ করবো না। যে-কথাটা হচ্ছিল—মধ্যটা ব্যক্ত বলে মনে হয় অথবা ব্যবহারিক দিক থেকে তাকে না মেনে নিলে কাজ চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, যাকে দেখেছি বলে মনে করছি, সেই পদার্থের কী পরিবর্তনটা হয়ে গেল—এই কথা বলতে বলতেই ! এই ধরো—তোমার বয়স ছিল যখন এঁচোড় কাটতে বসেছিলে তখন যাট বৎসর…"

"কি গো, এখন আর বয়স কমিয়ে কী করবে—বয়সটা পুরো আটষট্টি বৎসর ছয় মাস তিন দিন—তারপর ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড হিসাব করো…। ঠিক বলেছো—এঁচোড় কাটতে আরম্ভ ও এঁচোড় কাটা শেষের মধ্যে বয়সটা বেড়েছে ত্রিশ মিনিট।'

আমি বললাম, আমি আজ একটু ধুনোর গন্ধ যুগিয়ে দিই—"এই যেখানে বসে আছ সেই পৃথিবী এই কয় মিনিটে ঘুরে গেছে অনেকটা ও নিজে বহু দূরে চলে গেছে—সকাল গড়িয়ে দুপুরে ঢলে পড়তে চলেছে—আর বসন্তকাল পেরিয়ে গ্রীষ্মের দিকে ছুটেছে। সুতরাং স্থান-কাল পাত্র সবই সরে সরে চলেছে।"

গৃহিণী বঁটি ছেড়ে উঠে বললেন, "ঘাট হয়েছে, তোমায় 'ছ্যাবলা' বলে—বেশ বুঝতে পারছি, বাহাত্তরের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছ। এবার উপসংহার করো—শুনি।"

"দীর্ঘ পথ ধরে এসেছি : সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে জনারণ্য ভেদ করে এই পথমোচন করতে হয়েছে। কোটি জনতার সরব-নীরব কোলাহলের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরও যোগ দিয়েছিল। এই সীমাহীন জনারণ্যে অনাদিকাল থেকে অগণিত 'আমি'র বুদ্বুদ কখনো সবাক্ কখনো নির্বাক হয়ে অনর্গল কথা বলে গেছে। যখন আপাত-দৃষ্টিতে কাউকে নীরব দেখি, সত্যই কি সে নীরব ? কথা মুখ না বলছে বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কত লোকের সঙ্গে কত কথা। কত মীমাংসা করে নিল এই নীরব অবস্থায়। মানুষের বাণী বুদ্বুদের অতি সামান্য

অংশ রূপ নিয়েছে সাহিত্যে। ভাষার অন্তরালে, ভাবের ওড়নার আড়ালে কতটুকু আজ আমার কাছে দেখা দিচ্ছে। আমার স্মৃতিকথা মহাকালের সূক্ষ্ম রুচির ছাঁকুনি ভেদ করে ভাবীকালের হাতে পৌঁছবে? সে-আশা করি নে। বাগানে 'উষা-গৌরব' ও 'সন্ধ্যা-গৌরব' নামে লতায় ফুল ফোটে—এক সকালের, এক সাঁঝের জন্য। তাতেই তাদের সার্থকতা, আনন্দ, কেন সূর্যমুখীর ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হলাম না বলে যদি আপসোস করে, তবে বুঝবো তাদের আসাটাই ব্যর্থ হয়েছে। আমার এই বাণী-বুদ্বুদ ক্ষণিকের তরে সপ্তরঙের খেলা খেলে যথাস্থানে প্রয়াণ করবে। প্রশ্ন করো—বুদ্বুদ গেল কোথায়—সেখানে যে উত্তর পাবে আমারও বাণীবুদ্বুদের সেই উত্তরই জানবে। বুদ্বুদের সার্থকতা ফুৎকারে লুপ্তি।"

উপসংহার পড়ার পর কেবল শোনা গেল মৃদু দীর্ঘশ্বাস। বৃদ্ধার চোখ কি অকারণে ছলছল করে উঠলো বলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন?

লাইব্রেরী ঘরে ফিরে এলাম। একটা গানের কলি ঘুরে ফিরে মনে আসছে --'অনেক দিয়েছ নাথ'। গীতবিতানটা হাতের পাশেই রিভলভিং শেলফ থেকে টেনে নিয়ে গানটা পড়লাম

'অনেক দিয়েছ নাথ
আমায় অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না --
দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না, মিটিল না॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভাধরণী।'

এইটুকু পড়েই মনে হলো সব কথা বলা হয়ে গেছে—পরের দুটো পঙক্তি অবান্তর। সংগ্রাম করার শক্তি পেয়েছি, আবার কাকে পেতে হবে—মানুষ ও প্রকৃতিকে তো পেলাম—ব্যাস্! 'তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না।'—এ কথার অর্থ কী? আকাশ, বাতাস, শ্যামধরণী যখন পেয়েছি—প্রাণপ্রিয় পরিজন পেয়েছি—এর বাইরে আবার কাকে পেতে হবে? এ সবের বাইরে কি তিনি? গীতবিতান বন্ধ করে দিলাম।

দেশের বাড়ি

লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্মমূর্তি শ্রীমতী আমার পড়বার ঘরে ঢুকে বললেন, "কেবলই তো লিখছো। শোনাবে না? বৃদ্ধ বয়সে পুরনো কথা বলতে ও শুনতে ভালো লাগে। কেন জানি নে।" আমি বললাম, "মানুষ প্রতিমুহূর্তে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। প্রতিদিন একটা কিছু ঘটবে, তারই প্রতীক্ষায়। দেখতে দেখতে সময় যায় চলে, যার জন্য প্রতীক্ষা তা কখন বর্তমান হয়ে চলে গেছে অতীতে।…সামনে তো আর কিছু হবার নেই, আর কিছু পাবার নেই, তাই সে 'ফিরে ফিরে চায়' অতীতের দিকে।"

"বেশ তো ফিরে ফিরে চেয়ে লিখবে এখন। দুই একটা গল্প বলো—শুনি।"

বুঝলাম—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন টেবিল থেকে আমাকে উঠিয়ে বাইরের বারান্দায় নিয়ে যাবার জন্য এই অনুরোধ। আমার বিলাস-গৃহ আমার এই লাইব্রেরী। এখান থেকে নডতে ইচ্ছা করে না। তবুও উঠতে হলো।

বারান্দায় বেতের লম্বা চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম। শ্রীমতী তাঁর আরাম-কেদারায় আশ্রয় নিলেন। প্রশ্ন করলেন, "তোমার মনে আছে সেই যেবার আমরা সবাই মিলে দেশের বাড়ি গিয়েছিলাম—সেজো কাকার মেয়ের বিয়েতে? তখন একটা কথা শুনি গ্রামবৃদ্ধাদের কাছে। তোমায় বলেছিলাম কি?"

আমি বললাম, "দেশে যাবার পূর্বে এবং দেশ থেকে ফিরে আসার পর এই ত্রিশ বৎসর—অর্থাৎ যৌবনারম্ভের শুরু থেকে অশীতিপর হবার পর পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ধরে এতো কথা শুনিয়েছ এবং এত কথা শুনেছ, সব কথা মনে রাখতে হলে রাবণের দশমুণ্ডের প্রয়োজন—এই এক মাথায় সব ধরে রাখতে পারা শক্ত। এখন কোন্ কথাটা বল, শুনি।"

শ্রীমতী বললেন, "তোমার মুখে কি সাদা কথা হয় না? কথা বলতে গেলেই কি 'সাহিত্য' করে তুলতে হবে?"

আমি বলি, "রসাত্মক বাক্যই সাহিত্য—এটা বুঝতে পার নিশ্চয়ই! কিন্তু রসের কথা বলবার বয়স পেরিয়েছে—অতএব থাক্।"

শ্রীমতী বললেন, "পুরনো কথা 'রোমন্থন' করছ বলেই—না কথাটা পেড়েছিলাম।"

সেজো কাকার মেয়ের বিয়ে। তিনি হয়েছিলেন জেলাজজ। সেই জন্য

সাহেবের কন্যার সঙ্গে হাইকোর্টের উদীয়মান তরুণ অ্যাডভোকেটের বিবাহ। আয়োজনটা রাজসিক হয়েছিল। গৃহিণীকে কে এক গ্রামবৃদ্ধা এসে অনেক ভনিতা করে বলেছিলেন, 'জানো মা, এই যে সব বাড়ি ঘর দেখছো এ সবই তোমার ঠাকুরের (শ্বশুর অর্থাৎ আমার পিতার) ঘরবাড়ি—এ সবই তাঁর তৈরী। ছেলেরা তো এসব ভোগ করবার জন্য এলো না, দাবী-দাওয়া করলে না—এখন সবই ভোগ করছেন এঁরা।"

তাঁর বক্তব্য শুনে আমি বললাম, "এ সব গ্রাম্যতা। কাকাদের অবস্থা ফিরেছে—এটা ওদের ভাল লাগছে না। অথচ নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে,—পেট ভরে খেয়েছে, আঁচল ভরে নিয়েছে, আর তোমার কাছে নিন্দে ছড়িয়ে গেছে।" …একটু চুপ করে থেকে বললাম, "ভাগ্যে বাবা দেশ ছেড়েছিলেন, ভাগ্যে দেশে ফেরবার দুর্বুদ্ধি আমাদের মনে আসেনি, তা না হলে কি করতাম ? হয় ওখান-কার হাইস্কুলের মাস্টারি, না-হয় আদালতে ওকালতী। তা না জুটলে কলকাতায় চাকরি করে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী ! মাস্টারি যদি করতাম, শিশু ও বালকদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মনটা তাদের বয়সের মধ্যেই থেকে যেতো—মানসিক বামন-অবতার হয়ে থাকতাম। আর উকিল হলে মিথ্যাবাদী, অসৎ লোকের মামলা নিয়ে সত্যকে মিথ্যা, অথবা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করতাম —নিজের বিবেককে বলি দিতাম কয়েকটা টাকার জন্যে। দুনিয়াটার সবকিছুই দেখতাম উকিলের পরকলা পরে। মুক্তি পেয়েছি এসব ছেড়ে। তুমি গান শোনালে পারতে—

'বাহির করেছে পাগল মোরে—
যাব না যাব না যাব না ঘরে।'

যাক্ ওসব কথা। পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনাই তা হলে, কি বলো ?" শ্রীমতী খুশি হলেন।

উনবিংশ শতকের গোড়ার কথা। বাঙলাদেশ তখন মুঘল-মুসলমানী শাসন-মুক্ত হয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের সৌভাগ্য সুখের দিন দেখা দেয়নি। সেই আলো-আঁধারি কালে দেশে অরাজকতা বা বহুরাজকতার বাধাহীন উপদ্রব চলছে। সেই সময়ে গঙ্গাতীরে চাকদহের অদূরে জসড়া গ্রামে দুই ভাই বাস করতেন। অভিশপ্ত চম্বলের মানুষগুলি যেমন করে জীবিকা অর্জন করতেন, সে-যুগের অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ছিলেন সেই স্বভাবের মানুষ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীকুমার ভেসে যান এই বন্ধনহীন অ-সামাজিক জীবনস্রোতের টানে। জসড়ার ঘাটে

চোলাই মদের হাঁড়ি ও নীচ জাতের লেঠেল্ নিয়ে বসে থাকতেন শিকারের সন্ধানে। কালীকুমার ভাগ্যে সংসারী হননি ; তা না হলে তার বিষাক্ত রক্তে রক্তবীজের ঝাড সব কিছুকে বিপর্যস্ত করে তুলতো।

জ্যেষ্ঠ রামকুমার নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে চাকদহের কাছে এক গ্রামে এসে দুই-কুঠরির একটি ছোট বাড়ি তৈরী করেন। ইংরেজি শিক্ষার নূতন চাহিদা দেখে রামকুমার তাঁর পুত্রদের মধ্যে বড়টিকে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন লেখাপড়া শেখার জন্য। সেকালে গ্রামে কোথাও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়নি। তাই যেতে হয় কৃষ্ণনগরে। সেখানে তাঁর পরিচয় হয় রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে। এই প্রাতঃস্মরণীয় পূতঃচরিত্র মানুষটির কথায় আসবো পরে। রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার পিতার 'জ্যেঠামহাশয়'। ইনি জুনিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সিনিয়র ও জুনিয়র দুই শ্রেণীর পরীক্ষা ছিল। দেশের সেই দুই-কুঠরির ঘরের একটিতে বিরাট এক কাঠের আলমারীতে দেখতাম ইংরেজি বই ঠাসা। ছোটবেলা থেকেই বই ঘাঁটা আমার বাতিক। দেখতাম সেগুলো। বুঝতাম না এক বর্ণও, তবুও দেখতাম। সেসব বই-এর নাম-ঠিকানা কিছুই মনে নেই, কেবল মনে আছে মেকানিক্যাল ও সিভিল ইন্‌জিনীয়ারের হিজিবিজি ড্রয়িং।

রামকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র আমার পিতামহ—ব্রহ্মতেজের সাধনা না করে ক্ষাত্রতেজের সাধক হন। ঘোড়ায় চড়া, লাঠিখেলা, কুস্তি করা, বন্দুক ছোঁড়ার হলেন ওস্তাদ।

দুই ভাই-এর চেষ্টায় একদিন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর দেখা মিললো তাঁদের সংসারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরাণীর সতীন-ভগ্নী অলক্ষ্মী দেবী যে খিড়কী দিয়ে গোপনে প্রবেশ করেছিলেন, তা তাঁরা জানতে পারেননি।

উনবিংশ শতকের পাঁচ দশকের শেষদিকে ভারতে রেল লাইন পাতা শুরু হয়েছে। আমাদের অঞ্চলে রেলপথ এলো। ১৮৬২ সালের মধ্যে শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এই রেল-পথ নির্মাণের কাজে বহু ঠিকাদার কাজ করে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন। বলা বাহুল্য সৎপথে নয়। আমাদের ঠাকুরদাদারা দুই ভাই মিলে সেই কাজে লেগে গেলেন। জ্যেষ্ঠ তাঁর বিদ্যাবলে বাইরেটা সামলাতেন, অর্থাৎ ইংরেজ উপরওয়ালাদের মন যুগিয়ে কাজ আদায় করতেন।, আর কনিষ্ঠ তাঁর ক্ষাত্রবলে কাজকর্ম তদারক করে তা সফল করে তুলতেন। লক্ষ্মী এলেন। পৈতৃক দুই-কুঠরি বাড়ির সামনে নির্মিত হলো পূজার দালান, পুকুর কাটা হলো, ইট পোড়ানো হলো জঙ্গলের কাঠ

দিয়ে। কুমোর পাড়া বসলো—বোধহয় ইটের যোগান দেবার জন্য। চুন্নুরী নামে এক জাতের লোক এনে বসানো হলো। তারা চুন তৈরী করবে। গঙ্গা নদী বেয়ে শামুক ঝিনুক জসড়ার ঘাটে এসে লাগে। সেই শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরী হলো। সিলেট কাটনীর চুন অজ্ঞাত তখন। তিন মহলা বাড়ি—প্রবেশ-মুখে বিরাট সিংহদ্বার—তার দু'পাশে দুটি বৈঠকখানা ঘর। সিংহদ্বার দিয়ে হাতী যেতে পারে এমন উঁচু। সেটা বন্ধই থাকতো—মানুষ চলাচলের জন্য ছিল ছোট একটা দরজা—মাথা নীচু করে ঢুকতে হতো। তিন ফোকরের ঠাকুর-দালানের সামনে অদূরে ছিল গরুর গাড়ি, পালকি প্রভৃতি রাখবার জায়গা। ছোটবেলায় দু-একবার গিয়েছি গ্রামে। তখন—লক্ষ্মী অন্তর্হিতা। ঠিকেদারীর অর্থে ঘরের পর ঘর নির্মিত হয়েছিল। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ঠিকরে পড়ছিল সবদিকে। শুনেছি চৌষট্টি (৬৪) খানা ঘর ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে এতো সুখ সইলো না। একটা রেলসেতুর কণ্ট্রাক্টে এত বেশি খেলেন যে তা সামলাতে পারলেন না। বন্যার জল বন্যায় টেনে নিয়ে গেল—বোধহয় পাপের ধন—সইলো না। তাছাড়া ঠাকুরদার মেজাজটা ছিল সাহেবী—বেশভূষা চালচলনেও সাহেবদের মতো। একটা অবাধ্য কুলিকে এমনভাবে প্রহার করেন যে লোকটা নাকি পরে মারা যায়। তা নিয়েও অনেক হয়রানি ও অপব্যয় হয়—অর্থ জলের মতো ব্যয় করে উদ্ধার পান কোনো রকমে। শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে দুই-কুঠরি ঘরে আশ্রয় নিতে হলো। প্রাসাদোপম অট্টালিকার অনেকটা অসমাপ্ত থেকে গেল—অবশিষ্টাংশ মহাকালের স্পর্শে ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো।

এইটুকু পড়ে শোনালাম পাণ্ডুলিপি থেকে। শ্রীমতী বললেন, "কালের কী পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা চিরকাল রাজধানীতে ভাড়াবাড়িতে বাস করে-ছিলাম। নিজের বাড়ি পেলাম তোমার ঘরে এসে।" দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকি। অর্ধশতাব্দীর ছবি মনের গহনে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে শ্রীমতী বললেন, "দেশের বাড়িতে যাকে তোমরা ঠাকুমা বলতে তিনি কে?"

—"তিনি আমার বাবার জ্যেঠা-মহাশয়ের স্ত্রী বা জ্যেঠিমা—তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। দুই-দুইবার স্ত্রী মারা গেলে আত্মীয়রা ঠিক করলেন আমার ঠাকুরদার জন্য সুন্দরী বউ সংগ্রহ করবেন না। বোধহয় তাঁদের ধারণা ছিল যমের টান সুন্দরীর দিকে। তাই আমার ঠাকুরদার জন্য কালো বউ আনা হলো। গ্রামবৃদ্ধরা ঠাকুরদাকে শুধোয়, "হাঁরে মাকু, তুই নিজে এমন কাতিকপানা—তুই আনলি কালো বউ?" ঠাকুরদা উত্তরে বলেন, "সাদা ধুতিতে কালো পাড় মানায় ভালো।"

দু'জনেই হাসলাম। তারপর হাসি থামলে আমি আবার আরম্ভ করলাম—"বাবা পড়তে আসেন কলকাতায়—চোদ্দ বৎসর বয়সে চাকদহের এক মাইনর স্কুল থেকে পাস করে। রাণাঘাটে হাই স্কুল হয়েছে কয়েক বৎসর পূর্বে। তাছাড়া এ-দিগন্তে কোনো স্কুল ছিল না। সুতরাং কলকাতায় আসতে হলো। সেকালে বাঙালী ছাত্রদের জন্য হস্টেল, বোর্ডিং ছিল না; মফঃস্বলের ছাত্রদের থাকতে হতো হয় কোনো আত্মীয়ের বাড়ি, নয় বড়দের সঙ্গে 'মেসবাড়ি'তে—বামুন চাকর রেখে। গ্রামের কয়েকজন যুবকদের এক মেসে বাবা থাকলেন। কিন্তু বালককে দেখাশুনা করবে কে? জ্যেঠামশায় ভাইপোর ভার দিলেন তাঁর কৃষ্ণনগরের বন্ধু রামতনু লাহিড়ীর উপর।

রামতনুর ন্যায় মানুষ ক্বচিৎ দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজে এসে তিনিই সর্বপ্রথম উপবীত ত্যাগ করেছিলেন, বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য, যজ্ঞহীন জীবনে 'সূত্র' ধারণ নিরর্থক। তিনি এই গ্রাম্য বালকটিকে তাঁর আত্মীয় ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত পরিচিত করে দেন। রামতনুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী—একজন কুমারী খৃষ্টান হয়ে যান ও বেথুন স্কুলের শিক্ষিকার কাজ করতেন। অপরজন বিধবা—তাঁর বিবাহ হয়, কলকাতার বুনিয়াদী এক কায়স্থ বংশের যুবকের সঙ্গে হরগোপাল সরকার। বাবা এই পরিবারে পুত্রবৎ হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্ম-বাড়িতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হতে দেখে জ্যেঠামশায় বোধহয় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। যাই হোক কর্তৃপক্ষ এক শুভদিন দেখে ভাইপোকে গ্রামে ডেকে বিবাহ দিলেন—এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। শ্বশুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—সেকালের ঘটিরাম ডেপুটি নিজ বুদ্ধিবলে সামান্য কর্মচারী থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। তিনি বি. এ. পাস জামাতা পেয়ে খুশি, তাঁর আশা—আইন পাস করলেই জামাতাকে মুন্সেফি পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। জ্যেঠামশায় ভাবলেন সুন্দরী বধূ পাওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভাইপো নিবৃত্ত হবে। বাবা মুন্সেফীর কাজ নেবার জন্য কোনো আগ্রহ দেখালেন না, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্য কোনো মানসিক বা আধ্যাত্মিক আকুতি বোধ করলেন না। কালে আমি সরকারী বিত্তালাভের আশা জলাঞ্জলি দিলাম পিতার জীবনকালে; আর তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিলাম। একেই বলে জীবনের পরিহাস।

উনবিংশ শতকের শেষ পদে যার জন্ম, বিংশ শতকের সাত দশকের শেষ

ভাগে এসে, সে আজ দেখতে চাইছে তার অতীত জগৎকে, সে আজ খুঁজতে বসেছে তার হারানো দিনগুলিকে। যে শহরে সে জন্মেছিল, খেলেছিল, পড়েছিল—শত পাকে বাঁধা ছিল যার জীবনের প্রথম পনেরো বৎসর, সে শহর আজ তাকে জানে না, আজ শহরবাসীরা জানে তার খ্যাতির বুদ্‌বুদকে। সেদিনকার ছোট ছেলেটির পুরানো সঙ্গীদের খোঁজ করতে গিয়ে কাউকে পেলো না সে। যে দুই-একজনের দেখা পেলো শরীরমনে জীর্ণ তারা—তাদের কাছে হারিয়ে গেছে সে-অতীতকাল, বস্তুতান্ত্রিক জড়জগতের নিগড়ে বাঁধা তাদের দেহমন।

শহরটি এখন খণ্ডিত বঙ্গের সুপরিচিত সমস্যা-কণ্টকিত সীমান্ত জনপদ। শহরের রূপ তখন সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে ওঠেনি—গ্রাম সবে মাত্র 'সভ্য' হচ্ছে। যে সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, তা হয়ে আসছে নগরমুখী। মধ্যযুগের গ্রামীণ অর্থ-নীতি ধ্বংস পেয়েছে, তাই গ্রামে জীবিকার অভাব, চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব নিদারুণ। যার শক্তি আছে বুদ্ধি আছে বিদ্যা আছে সেই চলেছে নিকটের শহরে বা রাজধানী কলকাতায়। আমার বাবাও আইন পাস করে (১৮৯১) শহরে এলেন ওকালতী করবার জন্য। কালে টাকা হলো, মান হলো—কিন্তু শহরে বাড়ি করলেন না। জীবনভর ভাড়া বাড়িতে কাটালেন। বাড়ি করলেন গ্রামে—deserted village। যে বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, তার দশমাংশও যদি শহরে করতেন, তবে শেষ জীবনটা হয়তো অর্থদৈন্যে ভুগতে হতো না। সবাই গ্রাম ছাড়ে, বাবা গ্রামের উন্নতির জন্য সেখানে ঘর গড়লেন। কিন্তু অবশেষে সেই আদর্শবাদের বলি হলেন তিনি। সে কাহিনী বলা যাবে পরে।

সেবার এই শহরে এসেছি যে-শহরের সঙ্গে জন্মাবধি পনেরো বৎসরের স্মৃতি জড়িত, ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালাম সেই বাড়ির সামনে. যেখানে জন্মেছিলাম বলে শুনেছি। সে বাড়ির আশেপাশে কত সৌধ উঠেছে, চেনা যায় না আজ। তবুও চিনতে পারলাম।

মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি সেকালের কতো ছবি। কোথা থেকে কি ভাবে তারা দেখা দেয় জানি না। তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখছি যা চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না।

স্মৃতির আশ্রয় কোথা জানিনে। আড়াই তিন বৎসর বয়সের দুই-একটা ছবি, দুই-একটা কথা—পঁচাত্তর বৎসর পরে কেমন করে মনের মধ্যে এসে লেখনীর মুখে রূপান্তরিত হচ্ছে তার কারণ কে বলতে পারবে?

বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে ছোট একটি খড়ের ঘরে বাস করে একঘর

'বোষ্টম'। ছোট দোকান তাদের সামনে। ঝাঁপ তুলে দেয় দিনমানে, রাতে ফেলে দিলেই ঘর—আজকালকার রোলিং শাটার্সের গ্রাম্য গরীবী সংস্করণ। দোকানে সামান্য মালপত্র, নানারকম কাঠের মালা, ঘুন্‌সি, মাদুলি, তাগা, তাবিজ, লোহার বালা বা 'খাড়ু'—'নোয়া' বলে লোকে। শিশুদের জন্য কাজললতা, কাঠের ঝুমঝুমি, মেয়েদের জন্য আলতাপাতা। ছোট আয়না, কাঠের চিরুনি বা কাঁকুই। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকে জেম্ বিস্কুট আর লোজেন্স, যার বাংলা হয়েছিল 'ল্যাবেনচুস'—মটরের মতো গোল গোল, মাঝে থাকতো একটা 'ধনিয়ার চাল'। খেলনার মধ্যে ছিল মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, টিনের গাড়ি। প্ল্যাস্টিকের পুতুল, খেলনা অজ্ঞাত। সন্ধ্যার পর দোকানে 'পিদীম' (প্রদীপ) দেখিয়ে ধুনোর ধোঁয়া ঘুরিয়ে নিয়ে বোষ্টম বসে খোল নিয়ে গান করে, বোষ্টমী খঞ্জনী বাজিয়ে গানে 'দোহার' দেয়।

মা'র কাছে শুনেছি বোষ্টমীর ছেলেপুলে ছিল না। তাই আমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের দোকানের এক কোণে রঙীন 'ঘাটাটোপ' ঢেকে শুইয়ে রাখতো। আমাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বোষ্টমীর কোলে এল শিশু। হরেকেষ্ট। সে হয় আমার খেলার সাথী। নূতন বাসাবাড়িতে গেলেও হরেকেষ্ট বহুকাল ছিল বন্ধু ও খেলার সঙ্গী। আজও তাকে ভুলিনি।

নূতন বাসা-বাড়িতে এসেছি—স্কুলে যাই, পুরানো বাড়ির পাশ দিয়ে পথ। দেখতাম বাড়ির মালিক হারান সেন তাঁর বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন জলচৌকিতে; আদুল গা, নাভির নিচে বস্ত্র, দুই হাত চৌকিতে রেখে হাঁপ টানছেন—তাঁর হাঁপের ব্যারাম। গলায় হাতে তাগা তাবিজ, মাদুলি ছোট বড় অনেক রকমের। এমন বর্মাবৃত হয়েও হাঁপের টান কমছে না—ডাক্তারি ঔষধ, অবধুতের চিকিৎসা, সন্ন্যাসীর জড়ি-বড়ি সবই চলছে, তবু হাঁপানি কমে না।

নূতন বাসা-বাড়ির মালিক ত্রিলোচন উকিল। মাসিক ছয় টাকা ভাড়া। ত্রিলোচন সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন বলেই মনে হয়। বাড়ির ছাদে যাবার সিঁড়ির বাঁকে একটা ধাপে ছিল একটা টিনের বাক্স। তার মধ্যে ছিল 'বামা-বোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ। মনে আছে বিবিধার্থ সংগ্রহের কথা, বড় বড় বই—কাঠের ছাপা ছবি আছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তার মূল্য কি! না জানতেন পিতা-মাতারা, না জানতাম আমরা। আমাদের সে বয়স হয়নি। তাই অনেক সময় ঝড় উঠলে সেই বই-এর পাতা ছিঁড়ে ছাদের উপরে গিয়ে উড়িয়ে দিতাম। পাতার পর পাতা উড়তে উড়তে চলে যেতো—খুব মজা লাগতো।

গোয়ালাপাড়ার মধ্যে ছিল এই একটি মাত্র পাকাবাড়ি। আশেপাশের সব বাড়িই খড়ের অর্থাৎ মাটির দেয়াল, বাঁশের কাঠামোর উপর খড় বা ছন্ দিয়ে ছাওয়া। ধানের বিচালি দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়—তা দেখলাম বীরভূমে এসে। পূর্ববঙ্গে থেকেছি ছনের ছাওয়া ঘরে।

বাসাবাড়ির পাশেই গলির শেষে বাস করতো কান্ত গোয়ালা। তার চেহারা এখনো মনে আছে। হারকিউলিসের মডেল। বোঝাই ধানের গাড়ি কাদায় আটকে গেছে গলির মোড়ে। ঠেলছে কান্ত ও তার ছেলে—কান্তর দেহপেশী ফুলে উঠেছে। কাদা থেকে গাড়ি পেরিয়ে গেল। এ স্বাস্থ্য দেখতে পাইনি তাদের বংশধরদের মধ্যে।

এককালে রাঢ় অঞ্চলে ডোমরা ছিল সৈনিক, ঘোড়সওয়ার—

আগে ডোম, বাগে ডোম,
ঘোড়ায় ডোম সাজে—

আজ সেই ডোমের বংশধরেরা নিজের বাড়ির মাটির প্রাচীর মেরামতী করবার জন্য সাঁওতাল মাঝি মেঝেনদের ডাকে। তাদের সে স্বাস্থ্য গেল কোথায় ?

জ্বালানি কাঠের জন্য গরুরগাড়িতে বোঝাই হয়ে আমগাছের গুঁড়ি, ডাল ইত্যাদি আসে বিক্রীর জন্য। গাড়িকে গাড়ি কাঠ কিনে বাইরের উঠানে স্তূপ করে ফেলে রাখে। তাই দেখে আসে তবলদাররা। তাদের কাজ কাঠ ফেড়ে উনোনে জ্বাল দেবার মতো টুকরো করা। এরা মুসলমান—নিকটের গ্রামের বাসিন্দা। পাথরে খোদাই করা দেহ—কাঁধে কুড়ুল। দেখতে দেখতে সেই ভারী কুড়ুলের ঘায়ে ঘায়ে চেলা কাঠ তৈরী হয়ে যায়। বসে বসে দেখতে খুব ভাল লাগে। চেলাকাঠ বাড়ির ভিতর নিয়ে মাচায় তুলে রাখা হয়, বাইরে পড়ে থাকে গুঁড়ির গাঁট অংশগুলো—তাদের কাটা যায় না। সেগুলো শুকিয়ে গেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়—ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে পোড়ে, কিন্তু জ্বলে ওঠে না। বাবার মক্কেলদের সে কয়দিন তামাক খাবার খুব সুবিধা হয়।

টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতিকণা অজ্ঞাত উৎসপ্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে উঠছে লেখনীর মুখে।

বারো মাসে তের পার্বণ হতো সেকালে। উৎসব হতো বারোয়ারি। এখন বারো মাসে বত্রিশ রকমের 'ফাংশান', বারোয়ারি স্থলে হয়েছে 'সার্বজনীন'। বারোয়ারি উৎসব হতো একটা অথবা দুই পাড়ায় দুটো, এখন একই পাড়ায়—

রাস্তার এমুড়োয়, ওমুড়োয়, একই পার্কের এদিকে ওদিকে সার্বজনীন দুর্গাউৎসব, সরস্বতী পূজা কালী পূজা।

সেকালে পূজাপার্বণের কথা মনে পড়ছে। চৈত্র মাসের শেষ। পাড়ার গোয়ালাদের জোয়ানরা গাজনের 'সন্ন্যাসী' হয়েছে,—রুক্ষ মাথা, গেরুয়া রঙের ধুতি কোমরবেঁধে পরা, গলায় জবাফুলের মালা। এই গাজনের সন্ন্যাসীরা—চলেছে কলসী কাঁধে জল ভরতে। সেটা পূজার জন্য প্রয়োজন। হাঁকছে 'জয় বাবা তারকনাথ'। 'শিব ভোলানাথ'। সেক'লের রাস্তার লাল সুরকিতে তাদের অঙ্গ হয়ে গেছে লাল।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়কতলায় উৎসব শেষ হতো। চড়কতলা ছিল রেলের ওপারে—ছোটবেলায় গেছি—ঝাপসা হয়ে গেছে সে ছবি। তবুও মনে আছে পাতার ভেঁপু কিনে ফুঁ দেওয়া। আমাদের গোয়ালাপাড়ার একটি খালি জায়গাকে বলা হতো চডকডাঙা। সেখানে দেখতাম সন্ন্যাসীদের কসরৎ। একটা মোটা খোঁটার উপর লম্বা বাঁশ বাঁধা। তার দুই দিকে দুইজন লোককে কোমর থেকে ঝুলিয়ে রাখা। লম্বা বাঁশটি খোঁটার সঙ্গে এমন ভাবে লাগানো হয় সেটাকে নিচে থেকে দডি দিয়ে ঘোরানো যায়। কত কথা শুনতাম। পিঠের চামডা বিঁধে শূন্যে ঝুলছে তারা। নিচে নাকি কাঁটা, লোকদুটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঝুপ করে পড়লো বটে, তবে কাঁটার উপর পডলো কিনা জানি না। সঙ্গে ছিলেন বডকাকা। বললেন, আগে এসবে অনেক নিষ্ঠুরতা ছিল, বৃটিশ সরকার আইন করে রদ করে দিয়েছে।

বহুকাল পরে বৃদ্ধ বয়সে কলকাতার পদ্মপুকুর-পাডায় শহুরে চড়কপূজা দেখেছিলাম। বেচাকেনা রঙ তামাসার দিকেই জনতার মনোযোগটা চোখে পড়েছিল—অবশ্য বাঁশে লোক ঝুলছিল, ঘুরছিলও। আমাদের গ্রাম্য লোকে তেমন সভ্য হয়নি তখনো, তাই ভয়ে ভক্তিতে সব কিছু পালন করাকেই 'ধর্ম' বলে মনে করতো।

গাজনের সন্ন্যাসীরা যখন নাচতে নাচতে পথ দিয়ে ধুলায় ধুসর হয়ে চলতো, তখন মুগ্ধনেত্রে দেখতাম তাদের।

মুশকিল হয়েছে নববর্ষ নিয়ে। ভারত সরকার আমাদের বাংলার ফস্‌লি সন্-তারিখ বাতিল করে দিয়ে চৈত্র মাসের ২৬-এ নববর্ষের প্রথম দিন বলে ঘোষণা করেছেন। শকাব্দের গণনা বাঙালী মানছে না, তারা হিজরী থেকে পাওয়া মুসলমানী ফস্‌লি অব্দ ও হিন্দু জ্যোতিষ এবং নটিক্যাল এলমেনাকের গণনা দিয়ে

গাঁথা গোঁজামিলো পঞ্জিকাকেই মেনে চলেছে। এসব তত্ত্ব সেকালে অজ্ঞাত। তাই গুপ্ত প্রেসের সিদ্ধান্তমতে নববর্ষ মেনে চলতো।

সেদিন ছিল বিকালে গোষ্ঠবিহার ও সন্ধ্যায় হালখাতা। আজ নগরের বাসিন্দার কাছে বোধ হয় দুটো শব্দই অস্পষ্ট। আমাদের গ্রাম-জীবনের বড় অংশ অধিকার করে ছিল গরু—দুধের জন্য গাইগরু, চাষের জন্য বলদ—আর প্রজননের জন্য ছিল—ধর্মের ষাঁড়। শহরের রাস্তা দিয়ে ধর্মের ষাঁড়রা রাজকীয় চালে ঘুরে বেড়াত। লোকে একমুঠো খৈল বা খুদ মুখে ধরে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। 'ধর্মের ষাঁড়' সে-যুগে পিতা-পিতামহের শ্রাদ্ধের সময়ে উৎসর্গ করতো। সমাজ তাদের সেবার ভার নিত—সে যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াতো, আহার সংগ্রহ করতো। মাঝে মাঝে দেখেছি দুই পাড়ার দুই মাতব্বর ষাঁড়ের লড়াই—বোধহয় সীমান্ত পার হয়ে কোনো দুঃসাহসিক এসেছে—তাই লড়াই। শুনেছি বহু সুলক্ষণাক্রান্ত ষাঁড় উৎসর্গ করা হচ্ছে শাস্ত্র-নির্দেশে। অবশেষে একটি কাঠের গায়ে বৃষ এঁকে ও খোদাই করে নদীর ধারে পুঁতে এলো, পূর্ব-পুরুষরা ধন্য হয়ে গেলেন। এখন বৃষকাঠটুকুও কেউ ঠোকে না, পুরোহিতকে দক্ষিণা দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায়। ধর্মের ষাঁড়কে বেওয়ারিশ বলে আদালত ঘোষণা করলে—তাকে ধরে মুনিসিপ্যালিটি থেকে ময়লা ফেলার গাড়িতে জুতে দেওয়া হয়।

বলছিলাম গোষ্ঠবিহারের কথা। এটা গোয়ালাদের উৎসব—সেকালে খুব জাঁকিয়ে হতো আমাদের পাড়ায়। সন্ধ্যার মুখে মিছিল বের হতো। গরুর গাড়ির উপর ময়ূরের মত বিরাট দেহ—বাঁশ, বাখারি, দরমা, চাটাই দিয়ে তৈরী—তার উপর খবরের কাগজ এঁটে রঙের ছোপ দিয়ে ময়ূর আঁকা। ময়ূরের লম্বা লম্বা গলা, বাঁকা ঠোঁট সবই করা হয়েছে রঙ দিয়ে। সেই ময়ূরপঙ্খীর উপরে বসে তরজার দল। তারা গান গাইবে। সে গানের সঙ্গে বাজবে ঢোল আর কাঁসি। দুই পাড়ার দুটো দল—লালু কুমড়ো আমাদের পাড়ার মোড়ল—আজকালকার ভাষায় নেতা। লালু কুমড়োর বাড়ি আমাদের বাসা থেকে কয়েক গজ দূরে। বড় চাষী। বিরাট খড়ের ঘর পুড়ে গেল একদিন রাতে। তার পর লালু কুমড়ো চালা-ঘরটায় খোলা দিয়ে তার উপর চুন-বালির প্লাস্তারা লাগিয়ে পাকা করে ফেলে। তার সংসারে ছিল দুই ভাইপো—কালিদাস ও হরিদাস, যমদূতের মত চেহারা তাদের। তখনকার দিনে ভাল স্বাস্থ্যটা পুলিসের চোখে অপরাধ। তাই দুই ভাই জেল খাটে—কেন জানিনে। মনে পড়ছে বেঁটেখাটো কালো পাথর-কাটা দেহ কালিদাসকে কনেস্টবল নিয়ে যাচ্ছে—হাত-কড়া দিতে সাহস পাচ্ছে না—বলছে 'চলো, কোথায় নিয়ে যাবে।' সে

স্বাস্থ্যের মানুষ লোপ পেয়েছে।

লালু কুমড়োর প্রতিদ্বন্দ্বী ও পাড়ার লোকদের ময়ূরপঙ্খী চলেছে—গান ধরেছে তারা, 'লালু কুমড়ো ভাই, তোর মত বোকা দামড়া আর তো দেখি নাই।' মানুষকে বোকা দামড়া বলতে পারলে গ্রাম্য রসিকতা সার্থক হয়েছে মনে করতো। সাকরেদের দল তাই গানের কলি গাওয়ার পরেই দোয়াররা উচ্চস্বরে পদটা ধরতো, আর বায়েনরা ঢোল কাঁসি বাজিয়ে উচ্চতর আওয়াজ তুলতো। আমরা ভদ্রলোক। রাস্তায় নেমে জনতার সঙ্গে মিশে বা তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে পারি নে—আমরা বাবার কাছে দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়, মা ভিতরের ঘরের ক্ষুদ্র জানালা ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছেন, বৈঠকখানা বা বাইরের ঘরে এসে বড় জানালার কাছে এসে যে দেখবেন, তাও সম্ভব হতো না—পর্দা। আভিজাত্য।

সভ্যতার স্পর্শে গোষ্ঠলীলা আজ সে শহরে লুপ্ত। এখন গোয়ালাদের অবস্থা ভাল হয়েছে—অনেকেরই পাকাবাড়ি। অধিকাংশই গোয়ালাগিরির হীন কায ছেড়ে 'শিক্ষিত' হয়েছে। স্বাধীন ব্যবসা থেকে মাসিক বেতন এখন কাম্য তাদের কাছে। ভাগ্যে শহরের উপকণ্ঠে উদ্‌বাস্তুরা এসে ঘর-বাড়ি তৈরী করেছে, তাই এখন তারাই ভদ্রদের ঘরে দুধ যোগায়। আর আমাদের এই অঞ্চলে বাঙালীর খাদ্য দুধ-মাছের সরবরাহের ভার নিয়েছে উত্তর-ভারতের দেশওয়ালিরা, তাদের কেউ অফিসের পিওন, কেউ স্টেট বিজলী বাতির কর্মী, দুধ বিক্রী করে জমিজমা কিনে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। এখন যে শহরে বাস করি তার উপকণ্ঠে হিন্দু-মুসলমানের বাস। দুধের ব্যবসা কেউ করে না, ফালতু দুধ সময়ে সময়ে বিক্রী করে, স্থায়ী ব্যবসা কেউ চালায় না। কেন জানি না। শুনছি, বর্তমানে ভদ্রলোকের ছেলেরা সরকারী সাহায্যে গোপালন করছে।

গোষ্ঠবিহারের শোভাযাত্রা চলে গেল। এবার আমরা চললাম ছোট বাজারে—হালখাতার টাকা দিতে। সাধারণতঃ 'উঠনো' খাওয়াই রীতি ছিল। হাত-চিঠিতে প্রয়োজনীয় মালের ফর্দ করে দোকানে পাঠানো হতো, ভৃত্যে সে সব আনতো। মাসের শেষে টাকা দেওয়ার নিয়ম। দেখতাম বাকি পড়তো। তাগিদে আসে মহুরীরা, নববর্ষের দিন বা নূতন খাতা খোলার দিন কিছু টাকা দেওয়া ছিল নিয়ম। তাই দাদা ও কাকাদের সঙ্গে আমিও বের হতাম। এর গূঢ় কারণ সেদিন দোকানে গেলেই জলখাবার দিত খেতে। শহরের রাস্তায় কখনো জল পড়তো না। সেদিন দোকানীরা জল দিয়ে রাস্তা কাদা করে দিত। রহমন মোল্লার দর্জির দোকান। তার ওখানে গেলে গোলাপজল ঝারি করে ছিটিয়ে

দিতেন মাথায় গায়ে—বেশ মজা লাগতো। রহমন মোল্লা মুসলমান—তার খাতক সবই হিন্দু ভদ্রেরা। মুসলমান তো হিন্দুকে খাবার দিতে পারেন না—হিন্দুর জাত যাবে! তাই পাশেই হিন্দু বাঙালী ময়রার দোকানে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন রহমন। যে আসছে সেখানে বসে খাচ্ছে। একপেট মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরে কারা কোথায় কি খেয়েছে তাই নিয়ে চলতো আলোচনা। তখন মানুষের পয়সা ছিল কম, খাদ্য ছিল প্রচুর আর বোধহয় মনটাও ছিল উদার। আজকাল মনে হয় খাদ্যাভাবে মানুষের মনটাও হয়ে গিয়েছে আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু ধনীর মন।

শহরের বারোয়ারি উৎসবের মধ্যে সব থেকে মনে পড়ে ছোট বাজারের রাধা-বল্লভ-তলার মেলা। রাধাবল্লভ ছিলেন স্থানীয় কাঁসারীদের ঠাকুর। এককালে সমাজে কাঁসারীদের ছিল বিশিষ্ট স্থান। বাঙালীঘরের নিত্যনৈমিত্তিক বাসন-পত্র পূজার ধাতব তৈজসাদি তৈরী হতো এদের কারখানায়। কাঁসারিপাড়া কাঁসারিটোলা এবং কলকাতার 'ঠনঠনিয়া' পাড়া এই শিল্পীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সে শিল্প আজ মৃত্যুমুখী। রুচির বদল হয়েছে—চীনামাটির পেয়ালা পিরীচ এবং স্টেনলেস স্টিলের বাসনপত্র ব্যবহার করছি। খাগড়ার কাঁসার বাসনে আধুনিক অতিথিদের ভোজ্য দেওয়ার রেওয়াজ লোপ পেয়েছে। উচ্চ-বিত্তদের কথা বাদ দিলাম। পিয়ের লোটি তাঁর 'ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ' নামে ফরাসী বই-এ যে কথা লিখেছেন, তা স্মরণ হচ্ছে—পাশ্চাত্ত্য আসবাবের নিকৃষ্ট জিনিস আমদানী করে ধনীরা তাঁদের ঘরবাড়ি দোকানে পরিণত করেছেন। মধ্যবিত্তরা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। নকলের নকল আসবাবপত্র বাসনকোসন ঘরে এনে ভরছেন। মন্তব্যটি বর্ণে বর্ণে সত্য। ভাগ্যে নিম্নবিত্তেরা সংস্কারবশে বিবাহাদি সময়ে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র যৌতুক বা দানসামগ্রীতে দিচ্ছে, তাই কিছু চাহিদা এখনো আছে। নকল স্টেনলেস স্টীল কাঁসার স্থান যখন দখল করবে, তখন এই কাঁসার শিখা একেবারেই নিভে যাবে। এই বুনিয়াদী শিল্পীদের নূতন ধাতুশিল্পে শিক্ষিত করবার কোনো প্রয়াস দেখতে পাচ্ছিনে গ্রামাঞ্চলে—সর্বত্র cottage industry পরিণত হচ্ছে small industry-তে। Power loom তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রাধাবল্লভ ঠাকুরের মন্দির—তার সামনেই নাটমন্দির। স্কুলে যাবার সময় রোজ মন্দিরের বারান্দায় মাথা ঠুকতাম—যেন দিনটি ভাল যায়। তবে পরীক্ষার কয়দিন প্রণাম করার সময়টা বোধ হয় বেশি লাগতো। তখন 'ধনং দেহি যশং দেহি, রূপং দেহি' বলার বয়স হয়নি, এবং তা যে ঠাকুর-দেবতার কাছে চাইতে হয় তাও

বাপ-মার কাছে শুনিনি—তাই নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বলতাম, 'ঠাকুর, অঙ্কের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দিও।' রাধাবল্লভ অষ্টধাতুর মূর্তি, ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থাকেন। অমন কাতর প্রার্থনা শুনতে পেলে কি আর অঙ্কের পরীক্ষায় ফেল করতাম। শুনতাম 'শূন্য' সংকেতটা সংখ্যার পরে বসলে তিনি দামে-দরে ভারি হন। আর আগে বসলে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হন—আমার ভাগ্যে সংখ্যা-হীন শূন্যতাই জুটতো।

ছোটবাজারের বারোয়ারি মেলা চলতো তিনদিন। মেলা বসতে শুরু করতো কয়দিন আগে থেকে। আর ভাঙতে সময় নিতো আরও বেশিদিন। বারোয়ারি পূজা বা উৎসব খুব প্রাচীন সংস্কার নয়, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শুরু হয় গুপ্তিপাড়ায়; সেখানে তখন ব্রাহ্মণদের প্রবল প্রতাপ। তাঁরা চিরাচরিত শাস্ত্রবিধি ছাড়া নূতন ধরনের দেবীপূজা প্রবর্তন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বারো বন্ধু বা ইয়ার মিলে চাঁদা সংগ্রহ করে 'জগদ্ধাত্রী' নামে নূতন দেবীমূর্তি গড়ে পূজা শুরু করেন। বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে নানা রকমের গান যাত্রা আনিয়ে সাতদিন মহাসমারোহে বারোয়ারি পূজা সম্পন্ন হলো। একালে এই বারোয়ারি পূজা প্রবর্তিত হয় শহরে গ্রামে নানা দেবতাকে কেন্দ্র করে।

আজ বারোয়ারি স্থান নিয়েই সার্বজনীন পূজা। এটার প্রবর্তক মহারাষ্ট্র মহামান্য তিলক মারাঠীদের গণপতি পূজাকে কেন্দ্র করে নব-হিন্দু-জাতীয়তা ভাব উদ্রিক্ত করবার জন্য পুণানগরে এটি শুরু করেন গত শতাব্দীর শেষ ভাগে। আজ বাংলা দেশে সার্বজনীন দুর্গা পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে—এদের প্রবর্তক স্থানীয় 'ক্লাব'। আজ পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব—অফিসে কারখানায় ক্লাব। এই ক্লাবে সদস্যদের চেষ্টায় 'সার্বজনীন' পূজা আজ দেশময় ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লাব হয়েছে মিলনভূমি। ক্লাব হয়েছে দলাদলির কেন্দ্র। এই ক্লাব থেকে পত্রিকা বের হয়, 'ফাংশন' হয়—সখের থিয়েটারও করেন সদস্যরা মিলে। বারোয়ারি ছিল সত্যকার সার্বজনীন পূজা। এখন দলগত সার্বজনীন পূজায় 'সবজননী' পূজা পান কি?

শহরের বারোয়ারি পূজার সময়ে রাস্তার ধারে মাটির পুতুল-সঙের প্রদর্শনী। সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতির ব্যঙ্গ দেখানো হতো এই পুতুল দিয়ে। দুই-একটি রুচিবিরুদ্ধ হলেও বেশির ভাগ ছিল অন্যায় অবিচারের প্রতি কষাঘাত। স্থানীয় কুম্ভকারেরাই এসব গড়তো। তাদের আত্মীয়-কুটুম্বরাই ঘূর্ণির নামকরা মৃৎ-শিল্পী।

মেলার মধ্যে 'পুতুলনাচ' দেখতে খুব ভাল লাগতো। বাঁশের চাঁচ বা দরমা-

আঁটা অন্তরালের পেছনে দাঁড়িয়ে লোকে পুতুল নাচাচ্ছে—রাজা রাণী এলেন, হাত নাড়তে নাড়তে—নারদ আসছেন ঢেঁকিতে। ঘাড় নড়ছে দাড়ি নড়ছে—মনে হয় যেন কথা বলছে। মন্থরা কৈকেয়ীকে পরামর্শ দিচ্ছে—রত্নহার দিচ্ছেন রাণী—ভরত কুঁজিকে নিগ্রহ করছেন—এই ধরনের সব। তখন তো সিনেমা ছিল না, তাই লোকে এই পুতুলনাচ দেখেই খুশী হতো। বৃদ্ধবয়সে বিদেশে উচ্চাঙ্গের পুতুলনাচ (Puppet show) দেখেছি। কিন্তু বাল্যকালের দেখা ছবিগুলি আজও মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। আজকাল এদেশেও পুতুলনাচের অনেক উন্নতি হয়েছে। তাতে গ্রামের সুরভি পাই। বড়ই sophisticated.

বায়স্কোপ সিনেমা তখন অজ্ঞাত। মেলার মাঝে একটা তাঁবুতে ছবি দেখানো হচ্ছে শুনলাম। ভিতরে ঢুকে দেখি তাঁবুর তিনদিকে ছোট ছোট ফোকরে লোকে কি দেখছে। দেখলাম দেশবিদেশের ছবি—একটা বাগানের ছবি—বড় বড় পাতাবাহারে গাছ—তার উপর জল পড়ছে। কি ভাবে যে এই মায়া সৃষ্টি হচ্ছিল, তা আজও রহস্যময়।

অদূরে একটা ছাউনিতে খুব ভিড়। শুনলাম কলের গান। দেখি লোকে কানে ডাক্তারের স্টেথেস্কোপের মতো রবারের নল দিয়ে বসে গান শুনছে। আমার দেখেই মনে হয় কয়েক মাস পূর্বে এটা তো আমাদের বাসায় দেখেছিলাম। দুই পরদেশী হিন্দুস্থানী এসেছিল আমাদের বাড়ি এই যন্ত্র নিয়ে; আমরা তো শুনলাম, পাড়ার লোকেও শুনলে কানে নল লাগিয়ে। তখন বলতো এই যন্ত্রকে ফোনোগ্রাফ—গোল গোল রেকর্ড (Cylinder Record) ভরে দিয়ে কল চালিয়ে দিল, কানে নল লাগিয়ে শুনতে হতো। ডিস্‌ক রেকর্ড ও গ্রামোফোনের উপর বিরাট 'মেগাফোন'-এর প্রবর্তন পরে হয়, আজ সেই মেগাফোন-এর দরকার হয় না—বাক্সের ভিতর থেকেই শব্দ বেরিয়ে আসে।

বারোয়ারি মেলায় প্রথম দেখলাম 'চা' প্রচারের আয়োজন। সিংহল, আসাম, দার্জিলিঙে চায়ের বাগান খুলেছে সাহেবরা। কিন্তু চায়ের কথা জানে কে; বাজার গড়তে বা খরিদ্দার জোটাতে হবে তো। লোকে তো জানে না যে 'চা' নামে একটা পানীয় আছে। তাই সাহেব কোম্পানীর এজেণ্ট বা প্রচারকরা মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চা-এর গুণগান গেয়ে। "বিনা পয়সায় চা খেয়ে যাও—যাবার সময়ে এক পয়সা দিয়ে এক প্যাকেট শুকনো চা কিনে নাও, বাড়িতে গিয়ে গরম জলে দাও, কেবল লাগবে একটু দুধ—চিনি, দেওয়া আছে চায়ের পাতার সঙ্গে—চার বাটি চা পাবে।" ব্রিটিশ শিল্পপতিদের প্রচার-কর্ম কী ভাবে সফল হয়েছে, তা আজ সকলেরই জানা। সকালে এক পেয়ালা চা না

খেতে পেলে কাজেই মন যায় না, দেহমনের জড়তা যায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেই। বাঙালী রিকশাওয়ালা—পাড়ায় থাকে—ভোরে ডাকলাম—বললে, 'চা খাইনি বাবু এখনো।' অদূরে ছিল অ-বাঙালী রিকশা চালক—ইঙ্গিত মাত্র এসে গেল।

আমরা ছোটবেলা থেকে বাড়িতে চা খাওয়ার রেওয়াজ দেখেছি। শুনেছি আমার মা নাকি চা-এর অভ্যাস নিয়ে এসেছিলেন এ-বাড়িতে। তিনি ডেপুটির মেয়ে—তাই সেকালে তাঁদের বৃহত্তর বাঙলাদেশের যেখানে-সেখানে যখন-তখন হুকুম মতো ঘুরতে হতো। ডাক্তাররা বলতেন, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক, চা খাবেন। আফিমও নাকি জ্বরাসুর বলে প্রচার করেন পোর্তুগীজরা চীন মুলুকে। চা-এর জল সিদ্ধ হতো লোহার কাৎলিতে, চা ভিজানো হতো এনামেলের চা-পাত্রে বা টী-পটে; চা খাওয়া হতো এনামেলের কাপে। বাসনপত্রের তলায় কাগজে ছাপা থাকতো মেড্ ইন্ অষ্ট্রিয়া। জারমান হোক, সুইডিশ হোক, সবাই ব্রিটিশ, ভারতে তাদের শিল্পসামগ্রী প্রসারের জন্য ইংরেজিতে লিখতেন 'মেড্ ইন্…।' চীনামাটির বাসন আজকাল কী সুলভ হয়েছে। কলকাতার ফুটপাতেও বিক্রী হতে দেখা যায়। কিন্তু সেকালে দুর্লভ ছিল এ সামগ্রী। কারণ 'চায়না ক্লে' আসতো ব্রিটেন থেকে। এই চীনামাটি বা কেওলিন মাটির পাত্র তৈরী করার বিদ্যা ছিল চীনাদের একচেটিয়া। তারপর সেই কারুবিদ্যা য়ুরোপে আশ্রয় পায়। আমরা সেই বিদেশী চীনামাটির পাত্র দেখেছি বড়লোকের বাড়িতে, সাহেবের কুঠিতে। আজ চাকা ঘুরে গেছে। ভারতে উৎকৃষ্ট চীনামাটির পাত্র তৈরী হচ্ছে—মহীশূরের ও গোয়ালিয়রে ফ্যাক্টরির মাল দোকানে স্তরে স্তরে সাজানো দেখা যায়।

আমাদের সময়ে লিপটনের চা ছিল অভিজাত। লিপটনের চা-বাগিচা ছিল সিংহলে। লোকটি আসলে নাকি আইরিশ, জন্মস্থান স্কট দেশে, ধনার্জন করে মার্কিন মুলুকে ও এশিয়ায় এসে সিংহলে চা কফি কোকোর বাগান করে লক্ষপতি হয়। চা আসতো টিনের কৌটায়, উপরে সবুজ কাগজ মোড়া, তাতে বাগানের ছাপা ছবি। দেখতাম সেই ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে। সেকালে টিনের উপর নানা রঙের ছবি ফুটাবার বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়নি,—আজ কিন্তু মেটাল বক্স কোম্পানির প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয়ে বহুল প্রচার লাভ করেছে। সেকাল একালে অনেক পার্থক্য। চা-এর দাম ছিল দশ-বারো আনা পাউণ্ড। উৎকৃষ্ট চা—চা খেয়ে বলতাম 'আঃ কী আরাম।' রামানন্দ চাটুজ্যে তাঁর বর্ণপরিচয়ে আঃ শব্দের যে ছবি দেন সেটার কথা মনে হলে চা খেতে খেতে 'আঃ কী আরাম'

বলতে গেলেই হেসে ফেলি। পেয়ালা যাঁর হাতে ছিল, তাঁর রূপ বর্ণনা করলাম না। নামটি ছিল রামদাস।

অভিনয় করা ও অভিনয় দেখা—এ দুটো বোধহয় মানুষের জন্মগত ইচ্ছা। তাই ছোটবেলায় দেখতাম যাত্রা অভিনয়। খুব ছোট বেলায় মনে পড়ছে, আমাদের বাড়িতে বাইরের উঠোনে যাত্রা হতো। বাবার এক মক্কেলের যাত্রার দল ছিল—তিনি অভিনয় দেখাতেন। রাস্তার উপর বেঞ্চ বিছিয়ে লোকজন বসে, আমরা বারান্দায় বসি। মা ভিতরঘরেব ছোট জানালা ফাঁক করে দেখতেন। এইটুকু মনে আছে।

ছোটবাজারের রাধাবল্লভতলায় যাত্রা হতো—দেখতে যেতাম বাবার সঙ্গে। মনে আছে বিদ্যাসুন্দরের পালা হচ্ছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়ি বয়স হলে, বুদ্ধি হলে। কিন্তু যে বয়সে বিদ্যাসুন্দব যাত্রা দেখি, তার অর্থ বুঝবার বয়স হয়নি তখনও। রাজপুত্র সুন্দর যে সেজেছিল তার নাম শুনেছিলাম গগন—অতি সুপুরুষ—রাজপুত্র খাসা মানিয়েছিল। বিদ্যা যে সেজেছিল, ফুটফুটে একটি ছেলে। মালিনী সাজতো বৃদ্ধ অধিকারী—অসাধারণ শক্তিমান। গোঁফদাড়ি সদ্য কামানো, তাব উপর খানিকটা রঙ ঘষা। কিছুই এসে যেতো না—সে পরিবেশে। অসম্ভবকে সম্ভব করার ছেলেমানুষী যা আজকাল থিয়েটারে, যাত্রায় উৎকট হয়ে উঠেছে, সেরকম বৈজ্ঞানিক বর্বরতা তখনো চালু হয়নি নাট্য-জগতে। মালিনী যখন হাততালি দিয়ে নেচে নেচে অদূরে বাগানের বর্ণনা দিত, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সে গান। সুন্দর কি অপরাধ করেছে বুঝিনি ভাল করে, এইটুকু বুঝলাম রাজকন্যা বিদ্যাকে ভালবেসেছে বলে রাজার হুকুমে সুন্দরকে বধ করা হবে। বড় হয়ে যখন কারণটা পড়লাম—তখন মনে হলো বেচারা বিদ্যা আধুনিক কালে জন্মালে অত হাঙ্গামায় পড়তে হতো না। সুন্দরকে বেঁধে সৈন্যরা নিয়ে এসেছে শ্মশানে কাটবার জন্য। কী উদ্বেগে দেখছি। দিনমানে অভিনয় হচ্ছে চারদিকে লোকারণ্য, সমস্ত ছাড়িয়ে গেছে অভিনয়।

যাত্রার সব থেকে বিরক্তিকর ছিল জুড়িদের গান। সাদা পাণ্টালুন, চাপকান পরে অনেকগুলো সোনা ও রূপোর মেডেল ঝুলিয়ে আসরে আসেন। ওস্তাদ ছিলেন নিশ্চয়ই, গানও হয়তো ভালই গাইতেন, সে-গান উপভোগ করবার সমঝদারও হয়তো ছিলেন—কিন্তু আমরা ভাবতাম থামলে বাঁচি। ভাল গান শুনে বাবাকে রুমালে টাকা বেঁধে 'পেলা' দিতে দেখতাম। তখন ওস্তাদরা আরও উৎসাহিত হয়ে কানে হাত দিয়ে কত প্রকার কসরৎ করতেন। গল্প শুনতাম, এক সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বাংলা যাত্রা দেখতে এসেছেন—বাংলা বুঝতেন

বলে তাঁর ধারণা। কারণ বাংলায় সরকারী পরীক্ষা পাস করে বাংলা দেশে বাহাল রয়েছেন। যাত্রা শুনছেন, এমন সময়ে জুড়ির দল সামনে এসে গান ধরলো—সাহেব উত্ত্যক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'মোক্তার লোককো বৈঠায়ে দেও।' তাঁর ধারণা হয়েছিল স্থানীয় আদালতে মোক্তারবাবুরা তাঁর চিত্ত বিনোদন করবার জন্য গান ধরেছেন।

যাত্রার দলে থাকতো একদল ছোকরা; তারা জরির বুটি-দেওয়া পোশাক পরে গান গাইতো। সেকালে তো মাইক ছিল না—তাই তীব্রস্বরে গান গায় আসর জমাবার জন্য। পিছন থেকে বেহালাবাদক মাঝে মাঝে ছড়ের আঘাতে কী ইঙ্গিত করছে, আর বেচারারা আরও চিৎকার করছে—গলার শির ফুলে উঠছে। ছোকরাদের দেখে মনে হতো, ওদের কত মজা—কত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বড় হয়ে তাদের সম্বন্ধে গল্প পড়ে ও কাহিনী শুনে জেনেছিলাম কী দুঃসহ জীবনযাপন করতো এই হতভাগ্যরা। এদের মধ্যে দেখতে যারা সুন্দর তারা মেয়েদের ভূমিকায় নামতো। সখী সেজে নাচতো। আজকাল 'ফাংশনে' কত রকম নাচ দেখছি। সেকালে 'খেমটা' নাচ ছিল চলিত-কথায়, কেবল কোমর ধরে পাছা দুলিয়ে নাচ। বিদ্যা তার ঘরে সুন্দরের চিত্তবিনোদনের জন্য এইভাবে নৃত্য করেছিল।

বহুকাল পরে ধনী বন্ধুগৃহে বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে লখনৌ-এর বাঈজীদের নাচ দেখেছি। জয়পুরের মন্ত্রী-মহাশয়ের উদ্যান বাটিকায় উঁচুদরের নাচ দেখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে দেখেছি বালাসরস্বতীর নৃত্য, উদয়শঙ্কর শিম্‌কীর নৃত্য—বিদেশে দেখেছি ব্যালে নৃত্য।

রবিবার সকালে আসতো বোষ্টম-বোষ্টমী গ্রামের কোন আখড়া থেকে। বারান্দায় বসে তীব্র মধুর কণ্ঠে গান গাইতো বোষ্টমী, দোহার দিতো মোটা গলায় বোষ্টম। বোষ্টমীর ঠাসা শরীর, সাদা কাপড় বেশ আঁটসাঁট করে পরা, মাথার খোঁপা উপরে কুঁচি এঁটে বাঁধা। বোষ্টমের হাতে গোপীযন্ত্র, বোষ্টমীর হাতে খঞ্জনী, আঙুলে জড়িয়ে রেখেছে সুতো দিয়ে। এরা হরেকেষ্টদের মতো গৃহী বোষ্টম নয়—আসলে এরা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত। তীর্থ এদের ঘোষপাড়ায়। ঘোষপাড়ার কথা পরে বলব।

কার্তিক মাসে ভোরবেলা এক বোষ্টম করতাল বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম শুনিয়ে পথ দিয়ে চলে যেতো। প্রতিদিন শুনতে শুনতে ছড়ার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের নামে যত পদাবলী, কীর্তনাদি রচিত হয়েছে, মনে হয় না আর কোনো হিন্দু অবতারের ভাগ্যে এত স্তুতিবাদ জুটেছে।

আমাদের শহরের কাছাকাছি তিনটি তীর্থস্থান—শান্তিপুর, আড়ংঘাটা ও ঘোষপাড়া। এসব জায়গার খবর পেতাম আমাদের 'ঝি' হুটির কাছ থেকে। হুটি নিকটের এক গ্রামের মেয়ে। সদ্‌গোপের বাল-বিধবা। আমাদের ঘরে থাকতো বাড়ির লোকের মতো—আমি যখন খুব ছোট, তখন সে কাজে আসে। মনে আছে তার পিঠে চড়ে তার গলা জড়িয়ে আছি, সে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। শান্তিপুরের রাসমেলা, আড়ংঘাটার যুগল-কিশোর ও ঘোষপাড়ার সতীমার স্থান। এমন কি ত্রিবেণীতে স্নানযাত্রা প্রভৃতির কথা তার কাছ থেকেই শুনতাম। থালায় ভাত মেখে দলা পাকিয়ে খাওয়ায়, আর গল্প বলে বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য শতেক রকমের।

শান্তিপুরের রাস, ভাঙা-রাস এদিকের লোকের প্রধান আকর্ষণ। আমি তো একবার যাই ছোটবেলায়। বাবার এক মক্কেল কেষ্ট গোঁসাই ছিলেন গোঁসাই বংশের। তাঁরই নিমন্ত্রণে সকলেই যাই। তখন চূর্ণি পেরিয়ে সড়ক ধরে যেতে হতো। শান্তিপুর রেলপথ নির্মিত হয়নি। খেয়া নৌকায় নদী পেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে—যাই শান্তিপুরে। গোঁসাই ঘোর বিষয়ী; মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকতো প্রজাদের সঙ্গে অথবা সরিকদের সঙ্গে—অদ্বৈতাচার্য বংশধররা সবাই গোস্বামী। গোঁসাই-এর বাড়ির দোতলায় বসে রাসযাত্রার মিছিল দেখি। সেটা বোধহয় রাস উৎসবের শেষদিন। গোঁসাইদের নিজ নিজ ঘরের বিগ্রহগুলিকে চতুর্দোলায় তুলে শোভাযাত্রা চলেছে—সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ জনাকীর্ণ। ভাঙা-রাস দেখবার জন্য বাংলা দেশের নানা স্থান থেকে এমন কি মণিপুর থেকেও বৈষ্ণবরা আসতো সেকালে। হুটি কিনে আনলো মাটির পুতুল—যার জন্য খ্যাত ছিল এ-অঞ্চল। বড় হয়ে শান্তিপুর গেছি—সম্মানীয় অতিথি-রূপে,—পুরাতন গ্রামকে খুঁজে পেলাম না—দেখলাম আধুনিক শহর—পশ্চিম-বঙ্গের আর পাঁচটা শহরের মতই।

স্কুলে পড়ি। নদীর ধারে, খেয়াঘাটের উপরেই স্কুল। পাশ দিয়ে রাস্তা—নদী পারাপারের খেয়াঘাট। দেখছি লোক রাসলীলা দেখতে চলেছে। তীর্থ-যাত্রীরা যখন ফিরতো তখনই তাদের দেখতাম উৎসুক নয়নে। শুনতাম যাত্রী-দের মধ্যে কলেরা মহামারী দেখা দিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির আদেশে শান্তি-পুর থেকে যারা আসছে, তাদের কাউকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না; মোড়ে মোড়ে পুলিস দাঁড়িয়ে। চৌমাথায় কাঠের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে গন্ধক পোড়ানো হচ্ছে—যেন কলেরার বীজাণু আকাশে ঘুরছে। যাত্রীরা ধোঁয়ার গন্ধে শোধন হবে। সোজা রেল-স্টেশনে যাচ্ছে—সেখান থেকে নিজ নিজ গম্যস্থলে যাবে।

শুনলাম স্টেশনের কাছে হোটেলে সব আশ্রয় নিয়েছে। সেখানেও কলেরা দেখা দিয়েছে। সত্য মিথ্যা কত কথা আতঙ্কিত শহরবাসীরা রটাচ্ছে। কোথা থেকে মা এসেছে সদ্য-বিবাহিত পুত্র-পুত্রবধূকে নিয়ে। হোটেলে ছেলেকে চিরতরে রেখে কিশোরী বধূকে বিধবার সাজ পরিয়ে দেশে ফিরেছে। বাপ-মাকে নিয়ে ছেলে এসেছে। বাপ-মাকে রেখে ছেলে একলা ফিরলো দেশে। সেকালে কলেরার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। ডাক্তারদের ধারণা ছিল ওলাওঠা রোগে জল খেতে দিতে নেই; অথচ দেহের সমস্ত জল নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোগী জলের জন্য ছটফট করছে, তৃষ্ণার জলও পেলো না, বাঁচতেও পারলো না। আজকাল গবর্ণমেণ্ট কঠোরভাবে যাত্রীদের জন্য বসন্ত, কলেরার ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা আবশ্যিক করায় তীর্থস্থানে এইসব ব্যাধিতে মৃত্যুহার নেই বললেই চলে।

আড়ংঘাটায় যাইনি। মুটি যেতো যুগলকিশোরের মেলায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে মেলা। চুর্নি নদীর ধারেই যুগলকিশোর মন্দির। মুটি প্রতিবৎসরই যেতো। মা বলতেন, ওখানে গিয়ে পুজো দিলে আর-জন্মে বিধবা জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তাই সেখানে বিধবাদেরই ভিড় হয় বেশি। মুটিও সেইজন্য যায়। যুগলকিশোর সম্বন্ধে কত গল্প শুনতাম। কে একজন তীর্থ করতে যায় উত্তর-ভারতে। বৃন্দাবনে তৈরী কষ্টি-পাথরের খোদাই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এনে নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্গীরা এল বাংলা দেশ লুটতে; তারা হিন্দু হলেও লুণ্ঠনকারী। তাই ভয়ে লোকটি বিগ্রহ নিয়ে চলে আসেন চুর্নি নদীর তীরে, তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি। সেই আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যে মন্দির গড়া হয়। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুনলেন এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ আছেন একা। তাই তিনি রাধাকে এনে বসিয়ে দিলেন বামে। সেই থেকে নাম হল 'যুগলকিশোর'। শ্রীকৃষ্ণকে কিশোর বলা হয়েছে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কাব্যে।

আরও কত গল্প শুনি। তার মধ্যে একটা কাহিনী আমাদের শহরের সঙ্গে যুক্ত। একবার যুগলকিশোরের ব্রহ্মত্রের ধানের গোলায় লাগে আগুন। পুরোহিত ভাবলেন সব নষ্ট হয়েছে, তাই পোড়া গোলাটা বিক্রী করে দিলেন; কিনলেন রাণাঘাটের এক তিলি কৃষ্ণপান্তি। এই কৃষ্ণপান্তি শহরের পালচৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ। ধনে মানে গড়ে উঠলো এই শহর।

যুগল-কিশোর-কিশোরী বা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগ্মপূজার ইতিহাস আর আলোচনা করলাম না; স্মৃতিকথাই বলা যাক। মনে আছে মুটি মেলা থেকে আমার ও দাদার জন্য আনলো টিনের রেলগাড়ি, কালো রঙ-করা দড়ি বেঁধে টানলে চলে, তাই পেয়েই সেটি এঘর-ওঘর টেনে বেড়াই। ছোট বোন বীণার

জন্য আনে মাটির পুতুল। সে সব পুতুল আর দেখা যায় না,—বাতিকগ্রস্ত কয়েকজন লোক এই সব সংগ্রহ করে ঘর ভরতি করে, তা দেখতে আসে শিল্প রসিকরা। এখন প্লাস্টিকের খেলনা পুতুল হাটে-বাজারে মেলায় দোকানে রাশি রাশি দেখা যায়।

বারো মাসে তের পার্বণ কথায় বলে। বারোয়ারি ছাড়া আর সব পূজা পার্বণ ছিল নিজ নিজ পরিবারের কৃত্য দুর্গাপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা। যার যেমন বিশ্বাস সাধ্যমতো আয়োজন করতো। আমরা দেখতে যেতাম, প্রসাদ খেতাম এই পর্যন্ত। সরস্বতী পূজা হতো প্রত্যেক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুঘরে। ভক্তিভরে নিষ্পন্ন হতো সে পূজা। তবে আমাদের সময়ে শহরে সরস্বতীর মূর্তি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বাড়িতে আমরা বই গুছিয়ে সুন্দর করে স্তূপ করি। কলম দোয়াত ধুয়ে-মুছে পূজার স্থলে রাখি। তখন তো ফাউন্টেন পেন ছিল না। তাই স্টিল পেন ও নিব ধুয়ে রাখতাম। ভোরে খালি পায়ে শিশির-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে মাঠ থেকে দ্রোণ ও অন্যান্য ফুল তুলে আনতাম। পুরুতঠাকুর না আসা পর্যন্ত ঘর-বার করছি, কারণ 'অঞ্জলি' না দিয়ে তো কিছু মুখে দেবো না। পুরুতঠাকুর একের পর এক যজমানদের বাড়ি গিয়ে পূজো সেরে বেশ বেলা করে আসতেন। মা নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখতেন টুকরিতে—কুল ও নানারকম ফল। অঞ্জলি দিতাম মন্ত্র পড়ে। তারপর ফলাহার অর্থাৎ কুল ভক্ষণ করে উপবাসের 'পারণ' হতো। শ্রীপঞ্চমীর পূর্বে কুল খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু আজকাল? কুলের ফুল ছাড়তে না ছাড়তে পাড়ার ছেলেরা, আর শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও চিবিয়ে সেই কাঁচা কুল নির্মূল করে। আর দেখি সরস্বতীকে নিয়ে বড়দের দেখাদেখি ছোটরাও 'সার্বজনীন' পূজা শুরু করেছে। একটি ক্লাবের নামে রসিদ বই ছাপিয়ে চাঁদা সংগ্রহে বের হয়ে পড়ে সারা শহরময় ঘুরে বেড়ায় 'চাঁদা চাঁদা' করে। এই পূজা নিয়ে দলাদলি হয়, মারামারি এমন কি চাকু মারা, বোম ফাটানো, ক্র্যাকার ছোঁড়ার খবরও কাগজে বের হয়।

একবার দক্ষিণ কলকাতার একটি বাসায় গেছি, সেদিন সরস্বতীর ভাসান-মিছিল চলছে পথে। একটা বিরাট শোভাযাত্রা আসছে, বড় বড় দামামা জাতীয় বাদ্য বাজছে, কনসার্ট পার্টি তাদের বিচিত্র সুরের যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে, দলের সবারই পরনে ট্রাউজার, মুখে সিগারেট—মাঝে মাঝে বলে ওঠে সরস্বতী মাই কী জয়। শুনলাম এরা বাজারের আলু বিক্রেতা।

কার্তিক পূজা ভদ্রলোকের বাড়ি হতো বলে মনে হচ্ছে না তো। কার্তিক

বিয়ে করেননি, সংসার পাতেননি, অসুরদের সঙ্গে লড়াই করে অমর হয়েছেন। এই কুমারের পূজা করতেন শহরের 'মেয়েমানুষে' অর্থাৎ বারবনিতারা, সমাজের এরা বাসবদত্তা, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, কার্তিককে তাঁরা গড়তেন নিজেদের আদর্শ বাঙালী বাবু করে। গোলগাল, নাদুসনুদুস মানুষটি, গোঁপ প্যাকিয়ে তোলা। খালি গা, কোঁচানো চাদর পাকিয়ে গলায় দেওয়া, ব্রাহ্মণের উপবীত আছে। কোঁচানো ধুতি, পায়ে কালো পাম্পসু। চড়েছেন ময়ূরে, হাতে আছে ধনুকবান। এই অপরূপ বীরের পূজা করতেন বাসবদত্তারা যৌথভাবে, বিসর্জনের সময় তাঁরা যেতেন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য লাগে ভাবলে যে-কার্তিক দেব-সেনাপতি, যাঁর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় দেবতারা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, তাঁর দশা বাঙালীর হাতে পড়ে এমন হলো কেন? মনে পড়ছে মহাশিল্পী নন্দলাল বসু অঙ্কিত কার্তিকের ছবিটি। সে-কার্তিককে বাঙালী চেনে না।

'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্‌' যিনি বলেছিলেন তাঁর ওই সব বালাই-এর প্রয়োজন ছিল না, তাঁর আদর্শে কৌপীনবন্তরাই দুনিয়ায় সুখীতম। আমাদের সংসারেও তাই হলো। যতদিন বাবার জ্যেঠামশায় বেকার ছিলেন ততদিন আমার বাবার উপরই সমস্ত সংসারের ভার ছিল। কাকারা শহরে আমাদের সঙ্গেই মানুষ হয়েছিলেন। বড়কাকা বারাকপুরে সরকারী স্কুলে মাস্টারের কাজ পেলেন। বড়ঠাকুরদা মেদিনীপুরে নাড়াজোল এস্টেটের ম্যানেজারের পদ পেলেন। ফলে সবাই চলে গেলেন মেদিনীপুরে। অর্থ এলো সংসারে, অনর্থের সূত্রপাত হলো।

এমন সময়ে বড়কাকা ও মেজকাকার বিবাহের সম্বন্ধ এলো। মেজকাকা তখন বোধহয় স্কুল ছেড়ে মেদিনীপুর কলেজে ঢুকেছেন, সেকালের আদর্শে ছেলে-দের বিবাহের বয়স হয়ে গেছে। যে-ঘর থেকে বিবাহের সম্বন্ধ এলো, তাদের বংশে খুঁত ছিল বলে বোধহয় যৌতুকের অঙ্কটা ভালই পেলেন। অর্থ এলো ঘরে। খুঁতের কথাটা বলি,—বড়কাকার শ্বশুর ছিলেন কৃষ্ণনগরের উকিল ললিত চাটুজ্যে—তিনি বিবাহ করেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের এক কন্যাকে—আর যোগেন্দ্রনাথের পত্নী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যা। সেই অপরাধে এঁদের পরিবার ছিল প্রায় পতিত। কিন্তু সব দোষ হয়ে টংকা।

এই চাটুজ্যে-বাড়ির দুই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলো দুই কাকার। দুই ভাইয়ের বিবাহ হয় কুষ্টিয়ার কাছে কয়া গ্রামে। বাবা বরকর্তা হয়ে সেখানে যান। দাদা বাড়ির বড় ছেলে বলে বাবার সঙ্গ নেন। দাদার কাছে শুনি

রবি ঠাকুরের সুন্দর নৌকোয় নাকি তাঁরা গড়াই নদী পার হয়ে কয়ায় গিয়েছিলেন।

বিবাহের পর দেশে ফিরে এলে আমরা সবাই গ্রামে গেলাম বউভাতে। মনে পড়ছে বড় কাকীমাকে। রঙ ফর্সা সুন্দরী নোলকপরা মেয়ে। মেজকাকীমা শ্যামবর্ণা, সামনের দাঁত সামান্য উঁচু, কিন্তু দেখা যায় না। মনে পড়ছে কাকাদের দুখানি ঘরের একটি তক্তপোশের উপর দুই বৌ জড়সড় হয়ে বসে। আমি তাঁদের ভাসুরপো। সুন্দর মুখ ও সম্বন্ধের খাতিরে পরিচয় হতে সময় লাগেনি। মেজো কাকা ও এই কাকীমা যতদিন জীবিত ছিলেন আমরা দূরে চলে গেলেও আমাদের খোঁজখবর রাখতেন। তাঁদের কন্যা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে দেখাশোনা হয় মাঝে মাঝে।

আজ ভাবি কাকীমারা যে বয়সে বধূ হয়ে সংসার করতে এসেছিলেন আজ সে বয়সের মেয়েরা স্কুলের ছাত্রী, ফাংশানে নাচে, গায়, আবৃত্তি করে, মিনি স্কার্ট পরে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যায় আসে। কাকীমার মেয়ের মেয়েরা বি. এ. পাস করে মাস্টারি করছে দেখেছি। কালের কী পরিবর্তন হয়ে গেছে তিন পুরুষের মধ্যে।

অর্থ অনর্থের মূল বলে কাহিনীর সূত্রপাত করেছি। কালে অর্থ বা নগদ টাকার বিষক্রিয়া দেখা দিল। বরপণের টাকা ভাগ করে ভোগ করা যায় না তো। তাই স্থির হলো গ্রামের বাড়ি তাঁরা মেরামত করবেন সুতরাং ঘরবাড়ির পার্টিশন হলো। ঘরবাড়ি যা আস্ত ছিল সেসব কাকাদের থাকলো, বাবার ভাগে পড়লো 'সিংহদ্বারে'র পাশের একটি ঘর যা এককালে বৈঠকখানা রূপে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তারও দেয়াল চৌচির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাকে মেরামত করে খাড়া রাখা যাবে না, তাই সে-ঘরটা ভেঙে ফেলা হয়। ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে বাবা বাড়ির পত্তন করলেন। নূতনে-পুরাতনে মিশিয়ে কাজ শুরু হলো। এটা কাকাদের মা সহ্য করতে পারলেন না। ভেবেছিলেন আমার বাবা শহরেই বাস করবেন। গ্রামের যা কিছু আছে আমকাঁঠালের বাগান, খিড়কীর পুকুর, সব তাঁদেরই ভোগে আসবে। গ্রামে বাস করতে হবে এই আদর্শবাদ নিয়ে বাবা অনেক টাকা নষ্ট করে বেশ বড় বাড়ি পত্তন করলেন।

মনে পড়ছে পুজোর ছুটির সময়ে প্রতিদিন প্রাতে বাবা সকালের ট্রেনে গ্রামে যেতেন, সন্ধ্যায় ফিরতেন। সেখানে তাঁর জ্যেঠিমা কোনদিন দুপুরে খেতেও বলতেন না, মুখদর্শনও করতেন না। পাড়ার চুহুরী পঞ্চার মা উনোন ধরিয়ে, বক্‌নো মেজে চাল ডাল বেছে ধুয়ে ঠিক করে দিত, বাবা হাঁড়ি চড়িয়ে ডালে চালে আলু সিদ্ধ করে একটু গাওয়া ঘি ও লবণ সংযোগে আহার করতেন

মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গিয়েছি বাড়ি তৈরী করা দেখতে। মিস্ত্রীরা সবই মুসলমান—রাখাল বিশ্বাস, নিমাই মণ্ডল, করীম সেখ ; মজুর বা মজুরানী সবই বাঙালী হিন্দু ছুলেদের মেয়ে। দোতলার ছাদ পিটানো হচ্ছে। ছুটো কলসী মাথায় চাপিয়ে মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সেরকম স্বাস্থ্যের বাঙালী মেয়ে আজ চোখে পড়ে না কেন ? আবহাওয়ার দোষে না আমার চোখের দোষে কে জানে। মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা। বাবার পিসিমা বালবিধবা, ভাইয়ের সংসারে সর্বময় কর্ত্রী। মাঝে মাঝে শহরে এসে থাকতেন বিশেষ করে মা যখন আঁতুড়ে আটকা পড়তেন। আমি ঠাকমার কাছেই শুই। ভোর হলে একটি পয়সা আঁচল থেকে খুলে হাতে দেন, বলেন, 'হাজারি ময়রার দোকান থেকে যা খুসি কিনে খেগে যা।' হাজারি নূতন ময়রার দোকান করেছে। মানিক তাঁতির খুব পসার—তাই খুব সস্তায় খাবার বিক্রী করতো হাজারি ময়রা। একটা পয়সা 'বউনি' করে এক ঠোঙা খাবার কিনে আনতাম। খাওয়া প্রায় শেষ করে অবশিষ্ট কিছু কুটিকে দিয়ে বলতাম খেতে। সেই ঠাকমা গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন খবর পেয়ে সবাই আমরা ভোরের গাড়ি ধরে বাড়ি যাই। সেই পুরাতন জীর্ণ ঘরের মেঝেতে ঠাকমা পড়ে আছেন। কত ডাকলাম 'ঠাকমা ঠাকমা' বলে—কোনো সাড়া পেলাম না। আমাদের বলা হলো কানের কাছে 'তারকব্রহ্ম' নাম শোনাতে। শোনালাম নাম। মৃত্যুকে এই প্রথম দেখলাম নিকট থেকে ; কিন্তু মৃত্যু কি তা জানতাম না। আজও কি জানি—মৃত্যু কি ?

দেশের বাড়ি তৈরী হলো। পাঁজি দেখে শুভদিনে গৃহপ্রবেশ করতে চললাম। স্টেশনে নেমে মা পালকি চাপলেন, সঙ্গে বীণা ও ছোট ভাই সু। আমরা সব গরুর গাড়িতে চাপলাম। গ্রামের বাড়ির দেউড়িতে এসে দাঁড়ালাম সবাই। মঙ্গলাচরণ হলো। কুমোর পাড়ার গোপালের বউ, পাঁচির মা, চুনুরী পাড়ার সব মেয়ে-বউরা হাজির। আর এসেছিলেন ডাক্তার জ্যেঠার স্ত্রী—আমাদের জ্যেঠিমা। গৃহপ্রবেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনিই করালেন। ঘট থেকে গঙ্গাজল ছড়াতে ছড়াতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে সকলে চললেন ঘরের দিকে। সেদিন দেখতে পেলাম না কাকাদের কাউকে। তাঁরা কেউ আসতে পারেননি মাতৃশাসনে।

গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে বাবা নূতন বাড়িতে ভোজের আয়োজন করলেন। মা, বাবা-কাকাদের বাড়ি গিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এলেন। কিন্তু তাঁরা ভোজে এলেন না। এলো গ্রামের আর সবাই। আমি গেলাম মেজোকাকীমার কাছে। শুধোলাম, "কাকীমা, তুমিও আসবে না ?" ছলছল চোখে বললেন, "তুমি

বুঝতে পারবে না, মার নিষেধ, খেতে কি পারি?” সেদিন বুঝিনি, পরে বুঝলাম জ্ঞাতির মতো শত্রু নেই, প্রতিবেশীর মতো দুশমন নেই।

বড়ঠাকমা তাঁর ঈর্ষাকে চেপে রাখতে পারতেন না, তাই আমাদের বাড়ির পূবদিকে পুকুরে যাবার রাস্তাটা নোংরা করে রাখতেন লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে। বেশ বোঝা গেল গ্রামে বাস সহজ সুন্দর হবে না।

মা ভাই বোন গ্রামে থাকে—আমরা দুই ভাই আর বাবা থাকি শহরের বাসায়। সপ্তাহান্তে শনিবার বিকালে ফিরি—বাবা ফেরেন সন্ধ্যায়। শনিবার হাফ্‌ডে অর্থাৎ দুটোয় ছুটি। আড়াইটায় ট্রেন। তারপর দু’ঘণ্টা পরে গাড়ি। দাদা এসে দূরে দাঁড়ান কয়মিনিট আগে, ক্লাস থেকে বের হবার অনুমতি নিই শিক্ষকের কাছ থেকে। তারপর ছুট ছুট। এ গাড়ি যদি ‘ফেল’ করি—তবে মায়ের কাছে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মার কাছে যাবার জন্য কী ব্যগ্রতা ছিল সে বয়সে। স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে—টিকিট কেটে চলি —দেখি সবাই ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। আমরাও ভাবছি ট্রেনের সামনে দিয়ে রেল পার হবো কিনা, ওভার-ব্রিজ দিয়ে যেতে দেরী হলে, যদি ট্রেন ছেড়ে দেয়। লাইনই পার হই। কিন্তু ইঞ্জিন যদি চলতে আরম্ভ করে! অনেক লোক যাচ্ছে লাইন পেরিয়ে তাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলি।

বাবা আসবেন সন্ধ্যায়। একটা খালি ইঞ্জিন রোজ সন্ধ্যায় কাঁচড়াপাড়ার লোকো শেডে ফিরে যায়। বাবা ড্রাইভারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাতে করে আসেন। অন্ধকার হয়ে যায়—অরণ্যময় পথ—সাপ শেয়াল এমন কি বাঘও চলাফেরা করে। ‘বাবু’ আসছেন না—মা ঘর বার করছেন। বাবা এলে নিশ্চিন্ত হন। সেকালের চাকদহ স্টেশন ও তার আশেপাশের কথা আজ কেউ জানে না। আজ চাকদহ বিরাট শহর।

গ্রীষ্মকালের লম্বা ছুটিতে আমরা দেশের বাড়িতে থাকি, কাকারা আসেন মেদিনীপুর থেকে। গরমে ছুটির সময় আম কুড়ানো ও আম পাড়ার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। ঝড় উঠলেই দুই ভাই দুটি বস্তা নিয়ে গিয়ে দেখি ছোট-কাকাও হাজির পদা চুনুরীকে নিয়ে। ঝড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে আম কুড়োনোর ধুম—আস-শেওড়ার ঝোপ বা শেয়াকুলের কাঁটা গ্রাহ্য করে কে?

আম পাকলে সবাই মিলে পাড়তে চলি। পদা চুনুরী ওঠে গাছে। হাতে তার লম্বা আঁকশি, আঁকশির মাথায় জাল। জালের মধ্যে আমটাকে আটকে আঁকশি টানে, আমটা মাটিতে পড়ে না, জালের মধ্যে থাকে। নিচে আমরা ‘তোলা’ ধরি বস্তা নিয়ে। সে যে কী উত্তেজনা—তা যারা এই আনন্দ কোলা-

হলে যোগ দেয়নি জীবনে তাদের হৃদয়ঙ্গম হবে না।

পাড়া-আম জড়ো হলো। চারটে ভাগ করে পদা চুন্নুরীকে পাড়ানি ভাগ দেওয়া হলো একটা। তারপর একটা ভাগ থেকে আম দুই সরিকের ভাগে গেল। তখন আমরা যে যার ভাগ নিয়ে মহোল্লাসে ঘরে ফিরতাম। নিচের তলার একটা ঘরে, আম, কাঁঠাল, নারকেল বোঝাই থাকতো। অতো কাঁঠাল খাবে কে? কালিন্দী গাই পর্যন্ত মুখ ফেরায়। তারও অরুচি কাঁঠালে। কাঁঠালের বিচি শুকিয়ে কলসীতে বালি দিয়ে সংগ্রহ করা থাকতো।

কালিন্দী গাই যেমন 'দস্যি' তেমনি দুধলো। কথায় বলে যে গরু দুধ দেয়, তার চাট বা লাথি সহ্য হয়। কালিন্দীকে দুইতে পারতো মুটি আর পারতো পালপাড়ার সুবল গোপ। কালিন্দীর মতোই মিশকালো পাথরের মত দেহ— সে বাঁকে করে পিতলের ঘড়ায় ভরে দুধ এনে বিক্রী করে।

ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে বহুকাল। জঙ্গলে বড় বড় অট্টালিকাকে গ্রাস করেছে। বট অশ্বত্থ গাছ বাড়ির পাঁজরার মধ্যে প্রবেশ করে শিথিল করে দিচ্ছে ইঁটের গাথনি। খিড়কীর পুকুরের পূব-পাড় পেরিয়ে যে ভীষণ জঙ্গল ছিল একদিন তা সাফ করালেন বাবা। শহর থেকে উড়িয়া মালি এলো বউ সঙ্গে নিয়ে। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে তার জন্য ঘর উঠলো। মালির তত্ত্বাবধানে 'ধাঙড়' ও 'বুনোরা' জঙ্গল হটিয়ে দিলে। নূতন জমি সূর্যের মুখ দেখলো যুগান্ত পরে। অহল্যার ঘুম ভাঙলো! জঙ্গল সাফ হলে দেখা গেল ফলন্ত আম-কাঁঠালের গাছ রয়েছে। সেই জমি থেকে সেগুন শেওড়া গাছের গুঁড়ি তুলে দিয়ে তরকারীর বাগান হলো। ছয় গাড়ি কুমড়ো বিক্রী করে ৩৬ টাকা পাওয়া গেল। গ্রামে বেশ আছি, মনে হচ্ছে আরামে দিন কাটবে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এড়াতে পারা গেল না। খুদে খুদে মশা কী বিষ যে ঢেলে দিয়ে যেতো মানুষের দেহে কে জানে!

পূজার সময়ে দেশের বাড়িতে আছি, ম্যালেরিয়ার প্রথম বলি হলো ছোট বোন বীণা। বিজয়া দশমীর দিন আমরা গেছি লালপুর গ্রামে ধনী চাষীর বাড়িতে ঠাকুর দেখতে। গ্রামে টিম্ টিম্ করে পূজো হতো বসু, মিত্র, সিংহদের বাড়ি। নূতন পয়সায় ধনী চাষী খুব জাঁকিয়ে পূজো করছে। বিরাট ঠাকুর তৈরী করিয়েছে—শুনলাম। কৃষ্ণনগরের কুমোররা কারিগর। ঠাকুর দেখে ফিরে এসে আমি জ্বরে পড়লাম। বীণারও জ্বর হলো। কয়েক দিনের মধ্যে তার জ্বরবিকার। ভুগে ভুগে আমাদের সবারই সমান হাল—কত যে 'ডিগুপ্ত' ও 'গোবিন্দ সুধা' খেয়েছি তার ঠিক নেই। জ্বরটা চাপা পড়তো, ব্যাধিটা সারতো

না। কোজাগর পূর্ণিমার রাত। ঘুম ভেঙে দেখি বীণা পাশে নেই। পূবের বারান্দায় যাই—নিঝুম রাতের জ্যোৎস্না বারান্দায় এসে পড়েছে—দেখি এক কোণে বীণা শুয়ে। সারারাত ছট্‌ফট করেছিল, এখন দেখি সব শান্ত। কাছে যেতেই ঝুটি বললে, 'ছুঁয়ো না।' একটু আগে জ্বরগায়ে উঠে যে-বোনের মুখে জল ঢেলে খাইয়েছিলাম—সে এখন নিস্পন্দ, সে এখন অস্পৃশ্য। এতো কাল যাকে কত আদরে ঘরে রেখেছি আজ তাকে গৃহ থেকে চিরবিদায় করার জন্য কী ত্বরা!

আজও মনে পড়ে কত কথা তার সম্বন্ধে। প্রায় সত্তর বৎসর সে মারা গেছে—তখন তার বয়স কত? সাত-আট বৎসর, তবুও তার সেই মুখটি মনে পড়ে। আমরা দুই ভাইয়ের পর বীণা বোন এলো সংসারে, কী ঘটা করেই তার ষষ্ঠী করা হলো। ষষ্ঠীতলা ছিল বাড়ির কাছেই। সেখানে পাল্কি চড়ে মা গেলেন খুকিকে নিয়ে—আমরা দুই ভাই খই, পয়সা, দুয়ানি ছড়াতে ছড়াতে চলেছি পাল্কির পাশে পাশে।

বীণা এখন বড় হয়েছে। একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমরা দুই ভাই-বোন বাইরের ঘরে বাবার টেবিলের পাশে বসে কী একটা ছবি দেখছি। বাড়ির ভিতরে মা আছেন আর কেউ নেই, দাদা ও কাকারা স্কুলে, বাবা কাছারিতে। হঠাৎ চাকা দেওয়া টেবিলটা ঘটাৎ করে সরে গেল। চড়কতলার মেলায় কেনা মাটির তৈরী হলদে রঙ করা হরিণের মুণ্ডটা দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেট থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ঝুলন্ত ডিট্‌মারের আলোটা সবেগে দুলছে কেন? চারদিকে শাঁখের আওয়াজ। বারান্দায় এলাম—পা কাঁপছে কেন? বীণা আমার হাতটা ধরেছে চেপে। বাড়ির কাছেই থাকে ভোন্‌তো ধোপা। সে রাস্তা দিয়ে ছুটছে চিৎকার করতে করতে—গেল গেল সব গেল। তাকে ভাল করেই চিনি। কতবার গেছি তার বাড়িতে ভাঁটি দেখতে। কখনো ময়লা কাপড় দিয়ে আসতে। ভোন্‌তো সন্ধ্যার সময়ে মদ খেয়ে তার খড়ের ঘরের পিঁড়িতে বসে কানে হাত দিয়ে বেসুরে চিৎকার করে গান করতো। কিন্তু আজ তার কী হলো—পাগল হলো নাকি? ভিতরে গেলাম—দেখি মা উঠোনে বসে মাথায় হাত দিয়ে। ঝুটি পাশের বাড়ি থেকে এসে গিয়েছে—সে বলে, 'ভূমিকম্প।' পাতালে মা বাসুকি ফণা বদলালেন। সহস্র ফণা মা বাসুকির—মাঝে মাঝে এক ফণা থেকে পৃথিবীকে আর এক ফণায় নেন, তখনই ভূমিকম্প হয়। পরে বড় হয়ে জানি ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ (১৮৯৭)-এ পূর্বভারতে যে ভূমিকম্প হয়, এটা সেই দিনের ব্যাপার। সেদিন নাটোরে প্রাদেশিক সম্মেলন ভেঙে যায়, রংপুরের জমিদার দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে প্রাণ হারান। এসব কথা

কয়দিন পরে 'বেঙ্গলি' দৈনিকে প্রকাশিত হল। বাবা পড়ে গল্প করেছিলেন মার কাছে।

'তামাদি'র সময় বৈঠকখানা ঘরে, বারান্দায় কয়দিন থেকে মক্কেলদের কী ভিড় জমেছে। ঘরের মধ্যে অর্ধেক জুড়ে আছে কাঠের খাট, তার উপর সতরঞ্চ—সেটা ঢাকা চাদরে—চাদর মসিলাঞ্ছিত। একপাশে বসেন দীনু চক্কোত্তি—বাবার মুহুরী। বালক বয়সে আসে বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করবার জন্য; যশোর বাড়ি বাঙাল, প্রিয়দর্শন ছেলেটির প্রতি মায়া বসে বাবা মা'র সবারই। ভাত ফুটলে চেঁচাতো, 'মা ভাত নামাবো কেম্‌নে? আসেন আসেন।' মা গিয়ে তার সমস্যা পূরণ করে আসতেন। বুদ্ধিবলে কালে মুহুরীর কাজকর্ম শিখে নেয়। মা তার বিয়েও দিয়ে দেন। দেশ থেকে বউ এনে পাশের একটা বাড়িতে বাসা করে থাকেন তিনি। কিন্তু পয়সার মুখ যারা কখনো দেখেনি, তাদের হাতে পয়সা এলে একদল হয় কৃপণ, অর্থগৃধ্নু পিশাচ, আর একদল হয় উড়নচণ্ডী। দীনু চক্কোত্তি এই শেষ দলে। কালে মদ্যপ হয়ে পড়েন। মনে আছে এক-একদিন অর্ধমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন, আমরা মাথায় জল দিয়ে তার প্রলাপ শমিত করবার চেষ্টা করছি—তেঁতুলের জল এনে মা খাইয়ে দিচ্ছেন। সেই দীনু চক্কোত্তি রোজ সকালে এসে বসেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের অর্ধেক জোড়া তক্তপোশের উপর কাঠের একটা বাক্স সামনে করে। সেটা লেখবার ডেস্ক এবং মক্কেলের মূল্যবান কাগজপত্র রাখার আধারও বটে। তামাদির সময়ে কাজের চাপ বেশি, তখন দ্বিতীয় মুহুরী নিযুক্ত হন আশু বোস। তিনি মাদুর পেতে বসেন বারান্দায়। আশুদা বোসপাড়ার ছেলে, নামকরা জোয়ান—হাতগুলো ছিল লোহার মত কড়া—হাত ভাঁজ করলে পেশীগুলো কী ফুলেই উঠতো। বলতেন কিল ঘুষি মারো। মারতে মারতে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। সেই আশুদার ডাক পড়তো তামাদির সময়ে। তামাদি কী তা আজকালকার পাঠকদের বুঝিয়ে বলা দরকার, কারণ যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট পর্ব বা সময়কে আরবী ভাষায় বলে 'তামাদি', সেই পর্বের মধ্যে প্রজা বা রায়তকে জমিদারের বার্ষিক খাজনা দিতে হয়; তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁরা খাজনার জন্য অপেক্ষা করেন। তিন বৎসর পার হয়ে গেলে খাজনার দাবী আর জমিদার করতে পারেন না। তাই তিন বৎসর শেষ হবার পূর্বেই অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির আগেই জমিদারদের মামলা রুজু করতে হতো বকেয়া খাজনার জন্য।

সেকালে জমিদারদের প্রবল প্রতাপ। তাঁরা গভর্মেণ্টের ঘরে নির্দিষ্ট দিনে

খাজনা পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন। সরকারকে প্রজার ঘরে ঘরে ঘুরে খাজনা আদায় করতে হয় না। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সাহেবরা সফরে বা শিকারে বের হলে যানবাহন খানা-পিনাদির যাবতীয় ব্যবস্থা তাঁরা করে কৃতার্থ হন। 'স্বদেশী' ছোঁড়ারা গ্রামে আসা-যাওয়া করে কিনা তার খবর রাখে গোমস্তা নায়েবরা। জমিদার সে সব তথ্য সরবরাহ করেন পুলিস সাহেবের দরবারে। তাই প্রজাদের দিয়ে তাদের অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার পেতে দরিদ্র লোকে নাজেহাল হয়ে যেতো। ১৭৯৩ সালে তাদের রাজস্ব চিরকালের মতো ধার্য হয়ে আছে। কিন্তু প্রজার সঙ্গে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন না, শস্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, জমির উন্নতি হয়েছে ইত্যাদি অজুহাতে খাজনা বৃদ্ধি করার অধিকার আইনমতে জমিদারের আছে। জমিদার জমির মালিক, প্রজা সেখানে ভাড়াটিয়া। পাকা বাড়ি করতে পুকুর কাটতে জমিদারের হুকুম চাই এবং সেই হুকুম পেতে হলে দক্ষিণা দিতে হয় মোটা অঙ্কের। জমি হস্তান্তর হলে নূতন দখলিদারকে জমিদার স্বীকারই করবেন না—জমির মূল্যের বেশ বড় অংশ না পেলে। বসত-বাড়ির উঠোনের ফলন্ত গাছের ফল ভোগ করতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হলে গাছ কাটতে পারবে না। প্রজার কাছ থেকে কত উপায়ে যে বে-আইনী কর বা আওয়াব আদায় হতো তা আজ কল্পনাতীত। হক্ সাহেবের মন্ত্রিত্বকালে বাংলা একটা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতো, তাতে বাংলাদেশের নানাস্থানে ৬৪ প্রকারের আবয়াবের তালিকা দেখেছিলাম। জমিদারের মেয়ের বিয়ে, ছেলের অন্নপ্রাশন, বাপের শ্রাদ্ধ, এমন কি জমিদারের মোটরগাড়ি কেনার জন্য 'উপরি' কর আদায় করা হতো।

জমিদারদের অত্যাচার দেখেছি শুনেছি কত। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। ময়মনসিংহের নামকরা জমিদার—তাঁর নায়েব ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে রাজার শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস। তিনি দেখেন একদিন তাঁর কাছারিতে পাশের গ্রামের এক মুসলমান প্রজা খড়ম পায়ে কাছারিতে এসেছে। মুসলমান হয়ে জুতো বা খড়ম পরে হিন্দু জমিদার কাছারিতে আসবে—এত বড় স্পর্ধা। নায়েবের হুকুম মিঞা-সাহেবকে খড়ম মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে নায়েব ও স্থানীয় মুন্সেফবাবু বেড়াতে বেড়াতে সেই মুসলমান গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। নায়েবকে দেখেই মুসলমানরা ছুটে এসে ধরলো এবং বললে, 'জুতো মাথায় তোলো'। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নায়েব হতভম্ব। মুন্সেফবাবু গ্রামের লোকদের কত বোঝালেন, মিনতি করলেন—তারা খড়ম

মাথায় তোলার প্রতিশোধ নেবে জুতো মাথায় করিয়ে।

নায়েব শহরে ফিরে গিয়ে জমিদারের সঙ্গে দেখা করে কাজে ইস্তফ দিতে চাইলেন। জমিদারের শিক্ষাগুরু তিনি—কেন কি হয়েছে যে হঠাৎ কাজে ইস্তফা দিতে এসেছেন? ব্যাপারটি শুনে জমিদার হুকুম দিলেন তাঁর একশ হাতীর মাহুতদের- ঐ গ্রাম তছনছ করে দিয়ে এসো। পাইক, লেঠেলরা গেল পুলিস সাহেবকেও জানানো হলো দুর্দান্ত প্রজাদের শাসন করা হচ্ছে, থানায় যে কোনো এজাহার নেওয়া না হয়। এটি শোনা প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দুর মুখ থেকে সত্য মিথ্যা জানি না। তবে নানাজনের মুখ থেকে শুনেছি অকথ্য অত্যাচা করতেন তাঁরা। তাই পার্টিশনের কথা ওঠা মাত্র তাঁরাই সর্বাগ্রে ধনদৌল নিয়ে দেশত্যাগী হন। তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো সাধারণ হিন্দুরা যাক সে কথা।

জমিদারের বিশাল 'সাম্রাজ্য'- একা সামলাতে পারতেন না—তাই তি 'পত্তনী' দিতেন একশ্রেণীর লোকদের—তাঁরা আবার ভাগ করে দিতেন দর পত্তনীদার মধ্যে—অনেকটা ব্রিটেনের ফিউডাল ব্যবস্থার মতো। জমিদা পত্তনীদার দর-পত্তনীদার সে-পত্তনীদার সবাই তাঁর প্রাপ্য অনাদায়ী খাজনার জন নালিশ রুজু করতেন। বাবার কয়েকটি বাঁধা জমিদার ঘর ছিল। তাঁদে তামাদির সব মামলা তাঁর কাছেই আসে।

তামাদির সময় বাবাকে কী খাটতে দেখতাম। টেবিলের উপর রূপোর টাক স্তূপ হয়ে উঠছে। মুহুরীরা আর্জি লিখে বাবার টেবিলে পেশ করছে—বাবা চোখ বুলিয়ে সহি করছেন। মনে পড়ছে রূপোর টাকার কথা বিশেষভাবে, কারণ আজকাল সে পদার্থটা দেখা যায় না। রূপো দিয়ে টাকা গড়া উঠে গিয়েছে সেকালে রূপোর টাকা তিন রকমের মহারানী ভিক্টোরিয়ার সম্রাজ্ঞী মার্কা Empress of India মাথায় মুকুট। ১৮৭৭ সালে সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হবার পূর্বের টাকা ছিল ঝুঁটিবাঁধা ভিক্টোরিয়া মহারাণীর মূর্তি, তখন তিনি কুইন এমপ্রেস হননি। তারও পূর্বের টাকা ছিল ৪র্থ উইলিয়ামের টাক-মাথা মূর্তি। এসব টাকা সত্যই রূপোর তৈরী, তাই টাকা ভেঙে রূপোর অলঙ্কার করা হতো, বিশেষ করে মেয়েদের মল ও কোমরের গোট। রূপোর টাকা ছাড়া রূপোর আধুলি, সিকি, দুয়ানি ছিল। তখন টাকায় ছিল ৬৪ পয়সা। তাই আধুলির মূল্য ছিল ৩২, সিকির ১৬ ও দুয়ানির ৮ পয়সা, এখনকার মুদ্রার কথা তুলছি নে পয়সা ছিল তামার, ডবল পয়সা বা দুটো পয়সার মুদ্রা ছিল। দুটো আধলা পয়সায় একটা পয়সা হতো। তার নিচে ছিল 'সিকি পয়সা'—বারোটা সিকি

পয়সায় এক আনা। কিন্তু বাজারে সিকি পয়সার ব্যবহার দেখতাম না। সেটা দেখতাম দাদামশায়ের বাসায় যখন তিনি মাইনে পেতেন।—বোধহয় সূক্ষ্ম হিসাব করে কিছু 'পাই' পয়সা প্রাপ্য হতো।

এখন তো এক টাকা থেকেই কাগজের 'নোট' চালু দেখা যায়। সেকালে ১০, ৫০,১০০,১০০০ টাকার 'নোট' ছিল। আজ তো এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ একশো টাকার নোট চলছে। রূপোর টাকা দিয়ে বাজারে যে মাল পাওয়া যেতো, তা কি আর কাগজের নোট দিয়ে পাওয়া যেতে পারে? প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরাভূত জারমেনীতে এক পেয়ালা চা খেতে হলেও বহু সহস্র মার্ক নোট বের করতে হতো। তারপর একদিন বস্তা বস্তা মার্ক মূল্যের নোট কাগজের কলে গেল পাল্প্ তৈরীর জন্য।

প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বে মার্ক-এর মূল্য কমে গিয়ে কী অবস্থায় পৌঁছয়, তার দুটো গল্প মনে পড়ছে। যুদ্ধের পূর্বে এক ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হওয়ায় তাকে উন্মাদ-আশ্রমে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অপিসে গচ্ছিত সোনার মার্ক কয়েকটি ছিল, তাই নিয়ে পথে এলেন। রাস্তায় ট্যাক্সি ধরে বাড়িমুখো রওনা হলেন। বাড়ির অদূরে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একটা মার্ক দিলেন। লোকটি 'আমি মার্ক ভাঙিয়ে আনি' বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখে একটা কুলি, পিঠে বিরাট এক বস্তা নিয়ে আসছে। লোকটি শুধোয়, 'বস্তায় কি আছে?' ড্রাইভার বললে, 'আপনার সোনার মার্ক ভাঙিয়ে আনলাম। কয়েক লক্ষ মার্ক।' লোকটি ভাবলো আমার মস্তিষ্কবিকৃতি সারেনি তো নিশ্চয়ই ভুল করছি এসে। আমি ঘরে ফিরে যাব না। ড্রাইভারকে বললে, 'আমাকে আশ্রমে ফিরে নিয়ে চল।'

দুইভাই ছিল। বাপের বিপুল সম্পত্তি পায়। জ্যেষ্ঠ হুঁশিয়ার—টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। যুদ্ধশেষে ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা বহু কোটি টাকা হয়েছিল কিন্তু একদিন সেসব নাকোচ হয়ে গেল—কাগজের কলে মণ্ড তৈরীর জন্য বস্তা বস্তা নোট চলে গেল—সে নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়াল, তার কনিষ্ঠ ভাই সমস্ত টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিল, যুদ্ধশেষে মদের বোতল বিক্রী করে নূতন টাকা এতো পেলো যে, তাতে তার খাদ্যাভাব হলো না।

আমাদের সেকালে টাকা এতো ছিল না। এখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ঝাড়ুদার ১৪০ টাকা বেতন পায়, তাছাড়া ভাতা। কোনো পরিকল্পনায় কোটি টাকার নিচে ব্যয় হয় না। অথচ বঙ্গদেশে চল্লিশ বৎসর পূর্বে সরকারী আয় ছিল ১২/-

১৩ কোটি টাকা, আজ খণ্ডিত বলে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। নাসিকের ছাপাখানায় নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণ হচ্ছে ; ফলে মজুরী ও মূল্যমান দুইই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে।

মানুষ স্বল্পবিত্ত ছিল সত্য ; তবুও দুর্ভিক্ষ না হলে আজকালকার মতো লোকে অর্ধাহারে থাকতো না। খেয়ে মেখে টিকে থাকতো কোনো রকমে। তবে ম্যালেরিয়ার জ্বরে ভুগে ভুগে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকতো। আমাদের সময়কার বাজারদর বললে আজকাল লোকে বলবে 'গল্প ছাড়ছে'। শেরশাহের সময়কার বাজারদর পড়লে আমরা অবাক হই। কিন্তু আমরা ছোটবেলায় যা দেখেছি তা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন। তখন ধানকল ছিল না, হাস্কিং মিলও অজ্ঞাত। চাষীরা আপন ঘরে ধান থেকে চাল তৈরী করে শহরে এনে দোকানে দিত। কখনো গৃহস্থের বাড়িতে বিক্রী করে যেতো। মনে আছে এক বস্তা চাল (অর্থাৎ দেড় মণ) পিঠের দিকে কোমরের উপর রেখে চাষী ভিতরের রোয়াকে রেখে গেল—মা সেটা পাঁজাকোলা করে তুলে ভাঁড়ারে তুলে রাখলেন।

চালের দাম শুনে লোকে হাসবে অথবা বিদ্রূপ করবে। এক মণ চালের দাম ছিল আড়াই টাকা, ভালো চাল তিন টাকা দুই আনা—অর্থাৎ চার, পাঁচ পয়সা সের—আজকের ওজন ও আজকার পয়সায় ছয়-সাত পয়সা। আমাদের বাসার সামনে রাস্তার ওপারে হরি মুদির দোকানে দিনান্তে মজুররা আসতো সওদা করতে। চারটা পয়সায় একবেলার খাবার পেতো, চাল, ডাল, নুন, তেল, মশলা এমন কি এক আঁটি কাঠ—রান্নার জন্য জ্বালানি। 'বুনো' নামে একটা জাত তখন ছিল—তারা জঙ্গল থেকে কাঠ ভেঙে কেটে এনে দিত হরি মুদির দোকানে ; —হরি মুদি সেগুলি 'সাইজ' মতো সাজিয়ে বাণ্ডিল ঠিক করে রাখতো। এই লট্‌কানের দোকান দিয়ে হরি মুদি তার খড়ের ঘর পাকা করে। ছোট বাজারে প্রসন্ন পাকা দোকান করে একবার খড়ের ঘর পুড়ে যাবার পর। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—অবশ্য লট্‌কানের দোকানকে বাণিজ্য বলা যেতে পারে না—নাম তার যাই দিই ধন আসতো এই পথে।

আমাদের সংসারের জন্য বাবা রোজ মাকে একটি টাকা দিতেন। আমরা ছোট বাজারে যেতাম চাকরের সঙ্গে তরিতরকারী মাছ কেনবার জন্য। তখন এসব জিনিস ওজনদরে বিক্রী হতো না— ভাগা দেওয়া থাকতো এক পয়সা, দু' পয়সা, দু' আনা এমনি ভাবে। মাছ বিক্রী করতো নিকারির মেয়েরা—পেতের মধ্যে মাছ, উপরে বড় ডালি, তাতে মাছের 'ভাগা' দেওয়া! নিকারি মেয়েদের তর্জন-গর্জনে সবাই সমীহ করতো। নিধুকে দেখতাম সেখানে তার আর-এক মূর্তি।

গোয়ালন্দ-পদ্মা থেকে ট্রেনে করে ইলিশ মাছ আসতো। কী সস্তা! আজ ভাবলে অবাক হই—আর কী পর্যাপ্ত আসতো টুকরি বোঝাই হয়ে। বরফ দিয়ে আনার সুবন্দোবস্ত না থাকায় মাঝে মাঝে মাছ পচে যেতো—তখন ম্যুনিসি-প্যালিটি থেকে সেসব মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো।

গব্যঘৃত বা গাওয়া ঘি বলে একটি পদার্থ আমাদের সময়ে ছিল। এখন? জানি না কোথাও বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যায় কিনা। আর পাওয়া গেলেও তার দাম সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। আমাদের শহরের কাছে রাজাপুর নামে এক গ্রাম থেকে গোয়ালাদের মেয়ে গাওয়া ঘি আনতো, মাসে একবার কি দুবার। ঘরে সর তুলে মাখন থেকে ঘি তৈরী করতো—কালো ভাঁড়ে ভরে এনে দিত। দাম পাঁচ সিকা সের—পাকির ওজন। এখনো মাঝে মাঝে দেশওয়ালি মেয়েমানুষ মাথায় কালো কেঁড়ে—ময়লা কাপড়ে বাঁধা, হাঁকে 'দেহাদ সে খাঁটি ঘি 'মইয়া'। আমার এক বন্ধু চার টাকা সের শুনে তিন-চার সের কিনে ফেললেন। কয়দিন পরে গব্যঘৃতের আসল গন্ধ এলো রান্নাঘর থেকে। সবাই নাকে কাপড় দেয়। ডালডার সঙ্গে 'বাজারে' ঘি মিশিয়ে দই দিয়ে জ্বাল দিয়ে আনে;—সেই ঘিয়ের গন্ধ গাওয়া ঘি-এরই মতো। আমাদের কালের রাজা-পুরের ঘিয়ে ভেজাল ছিল না, ভেজাল কথাটা বোধহয় তখনও চালু হয়নি। গ্রাম অঞ্চলে অবশ্য দুধে জল দেওয়াটাকে ঠিক ভেজাল পর্যায়ে ফেলা যায় না। ওটা গোয়ালার স্বধর্মোচিত কাজ।

সরষের তেল আমাদের শহরে, আমাদের গ্রামে কলুদের ঘানিতে পেষাই হতো। কাছের এক গ্রাম হবিবপুর কি হাঁসখালি মনে নেই—কলু বৌ আসতো তেল নিয়ে। রোগা আধবয়সী বিধবা—পরনে একটা আধময়লা ঠেটি বা 'মিনি' শাড়ি—শেমিজ কামিজ তখন এ শ্রেণীর মধ্যে অজ্ঞাত। মাথায় একটি ধামা (বেতের ঝুড়ি), তার মধ্যে বিঁড়ের উপর বসানো তেলের কেঁড়ে বা মাটির ভাঁড়। ভিতর বাড়িতে আসে নির্দিষ্ট দিনে; রোয়াকে রাখে ধামা। মা বের করে দেন কাঁসার বড় বাটি—কলু বউ তেল মাপে—ধামায় আছে আধসেরী, এক পোয়ার মাপ-করা বাঁশের চোঙা। কম তেল মাপার জন্য আছে নারকেলের আধখানা মালা—তলায় ফুটো। বাঁ হাতের আঙুল দেয় ফুটোতে। তেল ভরলে আঙুল নেয় সরিয়ে। ক্রেতার পাত্রে পড়ে তেল। 'পলা' বা তেল দেবার চামচ ছিল তালের আঁটির আধখানা, হাতল কঞ্চি, আঁটিটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বসানো। তাই দিয়ে তেল তোলে ভাঁড় থেকে।...সে শিল্প বাংলা দেশে আর দেখা যায় না—চরকা যেখানে গিয়েছে, ঢেঁকি যেখানে গিয়েছে; ঘানিও সেখানে সদ্গতি লাভ করেছে—

যন্ত্রদানব সব গ্রাস করেছে—আর কী গ্রাস করবার আছে তারই অনুসন্ধান চলছে হয়তো। Industrialization হচ্ছে কার সুখের জন্য ?

মনে পড়ছে গ্রামের মাঠে সরষের হলুদ ফুল আলো করে আছে। কালে কলকাতায় তেল কল স্থাপন করলেন বাঙালী ধনিক বণিকরা। সরষে আমদানী হতে থাকলো উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, গবালিয়র হতে। সেই কলের তেল গ্রামে আমদানী করলেন 'মহাজন'রা। দেখতে দেখতে গ্রামের ঘানি একটা একটা করে উঠতে শুরু করে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মনে আছে গ্রামে একঘর কলু এসে বসত করে। ছোটবেলায় তাদের বাড়ি যেতাম। ঘানি ঘুরছে, চোখবাঁধা বলদ চলছে, কলু কোলে তুলে নিয়ে ঘানির উপর বসিয়ে দিলে আমাকে। কয়েকবার ঘুরতেই কী রকম লাগলো—নামিয়ে দিল কলু। বলদটার মুখে মাঝে মাঝে খৈল দিচ্ছে খেতে। এই সরষে একদিন গ্রামের মাঠে ফলতো প্রচুর, সেই সরষে মাড়াই হতো, ঘানিতে পেষা হতো, কলু পেতো টাকা, গ্রামের লোক উপকৃত হতো। আজ সব ধুয়ে মুছে গেছে।

আর উত্তর ভারতে সরষের চাষ হচ্ছে ব্যবসার জন্য। তেলকলের মালিকরা রেলগাড়ি করে সরষের তেল পাঠান বাংলাদেশে। বাঙালী তেল খায়, তেল পায়। সরষের ছিবড়ে বা খৈলটা তাদের দেশেই থাকে, তাদের খেতে প'ড়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়, তাদের গো-মহিষে খেয়ে দুধ বেশী করে দেয়। যে শিল্প ছিল গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে, তা আজ শহরে-নগরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে ধন ছিল সহস্র কুটিরে ছড়ানো, তা আজ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি টেনে নিয়েছেন আপনার কবলে। একে বলে Industrialiaztion, সভ্যতার পরব

নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ না হলে বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় কখনো তাঁর এককালীন পাঠ-শালার ছাত্র গোপ-নন্দনকে এ কথা বলতে পারতেন ? 'বাবাজী, বুড়ো হয়েছি, একটু খাঁটি দুধ যদি দিতে পারতে তো ভাল হতো।'

গোপ-জোয়ান উত্তরে বলে, 'পণ্ডিতমশায়, খাঁটি দুধ কোথায় পাবেন ? যদি আর-জন্মে বাছুর হয়ে জন্মাতে পারেন তবেই পালানে মুখ দিয়ে খাঁটি দুধ পাবেন।' দুধে জল দেওয়া বা জলে দুধ মেশানো এটা যেন ব্যবসায়ের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানি গোয়ালিনী তার ব্যত্যয় ছিল না, ভব গোয়ালিনীও তাই। মানি বেঁটে বা মিনি শাড়ি পরে প্রায় 'টপ্‌লেস' অবস্থায়—দুধ আনতো পিতলের চকচকে কলসী করে। থরথরে চটপটে মুখরা বিধবা গোয়ালিনী। টাকায় ষোলো সের দুধ। জল দিত—তবে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে জানতো না।

হরিণঘাটার গোগৃহ দেখতে গেছি। বিজ্ঞানীরা আমাকে বোঝালেন যে, আমাদের পাকস্থলী খাঁটি দুধের সবটা গ্রহণ করতে পারে না; তাই দুধটাকে সহজ-পাচ্য করবার জন্য তাঁরা খাঁটি দুধে জল ও তার সঙ্গে মাখনতোলা দুধের গুঁড়ো (Powder milk) মার্কিন মুলুক থেকে আমদানী করে এনে টোন্, ডবল টোন্ দুধ তৈরী করেন। বোতলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভরে কলকাতার জীর্ণোদর বাঙালীর হিতার্থে প্রেরণ করেন। মানি গোয়ালিনীরা আজও আছে—তবে আজ তারা বিহারী গোয়ালা—তাদের মধ্যে এমন সব 'জাত' আছে যাদের জল হিন্দু স্পর্শ করে না, কিন্তু দুগ্ধে মিশ্রিত হলে, তা অস্পৃশ্য বা অপেয় থাকে না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—তারা মেহন্নতকে ডরায় না, তাই মা-লক্ষ্মী সেখানে বাঁধা পড়েছেন। তারা অপিসের পিওন, কারখানার দারোয়ান,—বিজলী বিভাগের মিস্ত্রী—তারা গরু রাখে, ঘড়ির কাঁটার মত সময়ে গৃহস্থবাড়ি দিয়ে যায়, বৎসরান্তে প্রচুর গোবর সার বিক্রী করে মোটা টাকা রোজগার করে, অথবা সারের বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে খড় বিচালি নেয়। তাদের ঘরে মা-লক্ষ্মীকে দেখা যায়। আর পাড়া কাঁপিয়ে বৃহস্পতিবারে মা-লক্ষ্মীর পূজো করে, পাঁচালি পড়ে—চঞ্চলা দেবীকে ধরা তো দূরের কথা—তার দর্শনও পান না বাঙালীরা।

অন্নের পরই বস্ত্র সমস্যা—না খেয়ে সে ভিক্ষায় বের হ'তে পারে, কিন্তু বিনা বস্ত্রে সে গৃহের বাইরে আসতে পারে না। সেকালে লোকে 'বিলাতী' কাপড় পেতো—কী সস্তা! আজ ভাবতে পারা যায় না। রেলির 'উনপঞ্চাশ'-থান ধুতি পরতেন বাবুরা, লাট্টু মার্কা ধুতি পরতো সাধারণ লোকে। কলকাতায় ছুটির সময়ে বেড়াতে গেছি; আছি মানিকতলায় একটা গলির মধ্যে একটা বাড়িতে। দুপুরে শুনি একটা লোক হাঁকছে—'এক টাকায় তিনখানা ধুতি, একখানা ফাউ।' জানলা দিয়ে দেখি লোকটার কাঁধে-ফেলা ধুতির স্তূপ—হাতে একখানা ধুতি। কত বড় কাপড় তা দেখিনি, তবে আজ এক টাকায় আধখানা গামছাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

লালুপালের কাপড়ের দোকান, ছোটবাজারে চৌমাথায় স্টেশন থেকে যে রাস্তা চলে গিয়েছে নদীঘাটে—তার মোড়ে। নিচে দোকান, উপরে শহরের পাবলিক লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর কথা পরে বলবো। শ্যামবর্ণ গোলগাল মানুষটি বসে থাকেন একটা কাঠের বাক্সর পিছনে। সদাই প্রসন্ন মুখ, খদ্দের এলেই কি চাই জেনেই হাঁক দেন কর্মচারীর উদ্দেশে, বলতে থাকেন কোন্ নম্বরের কি কি কাপড় নামাবে। ব্যবসায়ে লক্ষ্মী এলো ঘরে। বিরাট বাড়ি—রাস্তা থেকে একটু ভিতরে স্কুলে যাওয়া-আসার সময় দেখতাম একটু একটু

করে তৈরী হয়ে উঠলো। আজ তাঁর কাপড়ের দোকান বংশধররা চালাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর প্রদত্ত অর্থে তাঁর নামে লালগোপাল বিদ্যালয় চলছে। শহরে তখন কয়টাই বা কাপড়ের দোকান ছিল! চারপাশের গ্রামের লোককে আসতে হয় মহকুমা শহরে নানা কাজের জন্য, ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠছে ব্যবসার কেন্দ্র। গ্রামের চাষীবাসীরা ধারে কেনে ও প্রথম ধান উঠলে পুরাতন ধার শোধ করে, পূজার কাপড় কেনে নূতন করে—হালখাতার সময় আবার টাকা দেয়।

আমাদের সংসারের কাপড়-চোপড় আসে লালুপালের দোকান থেকে, কখনো নগদে, কখনো ধারে। পূজার সময়ের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে—মুটের মাথায় কাপড়ের বস্তা আসতো—তখন তো আর রিক্শ ছিল না দেশে। দুর্গাপূজার সময়ে আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেবার রীতি ছিল। এখন পূজা না করলেও রীতিটা চলে আসছে। বাড়ির লোকের নামে নামে ধুতি শাড়ি তো এলো। তা ছাড়া দাস-দাসী, মেথর-মেথরানীকে দিতে হতো। মুটি তো পাবেই, কিন্তু তার বুড়ী মা, তার ভাই রাখাল, রাখালের নূতন বৌ সেদিন মাকে প্রণাম করে গেল, তাদের না দিলে কি চলে? মুটির বোন কুসুম কি অপরাধ করেছে। তার জন্য শাড়ি এলো। মানি দুধ দেয় বারো মাস—দুধে তো জল দেবেই, তা বলে পুজোর সময় কাপড় পাবে না? নিবু নিকারি মুসলমান—সে ঘরে না ঢুকলেও ঘরের লোকের মতো, তাকে অবশ্যি দিতে হবে। দেশের বাড়িতে যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য কাপড় শাড়ি আসে। এসব মধ্যযুগীয় আভিজাত্য বলবেন আজকালকার নবীন গৃহস্থরা।

ধন-অর্জন করে লোকে ধনী হয়; কিন্তু ধনীর সন্তানেরা যখন জ্ঞানার্জন করে সংস্কৃতবান হন, তখনই তাদের 'অভিজাত' সংজ্ঞা আমরা দিই। কৃষ্ণপান্তির বংশধরেরা কয়েক পুরুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে শহরে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। ঐ বংশের নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে অবসর নিয়ে শহরে এসে বাস করছেন। রোজ প্রাতে বেড়ান সদর রাস্তায়, সঙ্গে দুজন পাইক আগে পিছে যায়। একদিন আমাদের বাড়ি এলেন—মাতৃবিয়োগ হয়েছে, অশৌচ পালন করছেন মাসাবধি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে নিজে বের হয়েছেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন—বাবা তিলিদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের ভোজে যাবেন না, তবুও সামাজিক নিয়মানুসারে শহরের ভদ্রদেরও—বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের নিজে এসে নিমন্ত্রণ করতে হয়। সেকালে লোকে মাতৃদায় পিতৃদায় হতে উদ্ধারের জন্য অনেক কিছু করতেন।

আজকাল নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে ডাকযোগে অথবা লোক-মারফত পাঠিয়ে গৃহস্থরা নিশ্চিন্ত হন। 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন' লিখে মনে করেন সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা হয়েছে। অবশ্য এ শ্রেণীর নিমন্ত্রণে হাজিরা দেবার লোকও সমাজে প্রচুর। আমরা আজ পর্যন্ত এ শ্রেণীর নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে কোনো ভোজপুরে যাইনি। এটা অনেকে মনে করতে পারেন মধ্যযুগীয় "গুবারি'। মেনে নিয়েছি অপবাদ।

হিন্দুসমাজে এর বিপরীতটাও দেখেছি। নিমন্ত্রণ তো হয়েছে ঘরে ঘরে গিয়ে - কিন্তু নিমন্ত্রণের সময়ে ব্রাহ্মণরা কি একটা ঘোঁট বাধিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছেন না। গৃহস্থের তখন কী দশা হয়। বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে পায়ে হাতে ধরে আনেন—তাঁরা ভোজন না করলে স্বর্গীয় পিতৃপুরুষরা অনাহারে থাকবেন।

শহরে ব্রাহ্মণেতরদের বাড়ি বাবা বা কাকা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন না—শূদ্রের বাড়ি ভোজন করলে জাত যায়। বিশিষ্ট ঘর হলে দাদা ও আমি যেতাম—তখন 'পৈতা' হয়নি সুতরাং ব্রাহ্মণ নই—শূদ্রের সামিল। তাই লুচি ভাত মেখে খাইয়ে দিত—সদগোপের মেয়ের হাতে খেলেও জাত যেতো না। আমাদের সঙ্গে যেতো কোনো এক ভৃত্য। আমাদের খাওয়া হয়ে গেল—দেখি সঙ্গের সেবকটি গামছা ভরে 'ছাঁদা' বেঁধেছে—অর্থাৎ লুচি, মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি সব সংগ্রহ করেছে। বহু বৎসর পরে তখন গিরিধিতে থাকি। বীরেন চাটুজ্যের মা কি ব্রত পালন করছেন—বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়, তাই আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। তখন কোনো প্রকার যজ্ঞ না করেও যজ্ঞোপবীত ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণত্ব জাহির করতাম। ভোজন শেষে দেখি, পাতের পাশে ষোলোটি পয়সা! ব্যাপার কি? বীরেন বললেন, ওটা ভোজন-দক্ষিণা, নিতে হয়। না নিলে আমরা অপরাধী হব।

শহরের একটা রীতির কথা মনে পড়ছে। আমরা ছোট ছেলে, তাই অনেক সময়ে মার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি করে নিমন্ত্রণ খেতে যেতাম। দেখতাম, নিমন্ত্রণ-কর্তার কোনো আত্মীয় অভ্যর্থনা করছেন ও গাড়োয়ানকে গাড়িভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। সেকালে উপহার দেবার ভয়াবহ কুৎসিত রীতি প্রবর্তিত হয়নি। তবে কাজে-কর্মে আত্মীয়-স্বজনরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন গোপনে। আজ-কাল বিবাহ-সভায় লেখক বা লেখিকা ফর্দ তৈরী করছেন—কে কি আনলেন। 'উপহার' দেখবার জন্য মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি—দুই একটি মেয়ে চোর, ছোটখাটো দামী জিনিস যেমন ঘড়ি, সোনার বোতামাদি নিয়ে সরে পড়ে।

লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ ভিক্ষার উল্লেখ পত্রমধ্যে থাকলেও সবাই জানে ওটা ভদ্রতার মুখোস, 'প্রেজেন্ট' নিয়ে যেতে হবেই। অনেকে 'উপহার' দেবার ভয়ে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হন না, বিয়েবাড়ি যেতে-আসতে ট্যাক্সি বা গাড়ি ভাড়াতেও বেশ টাকা বের হয়ে যায়।

বিবাহের পর দেখা গেল 'প্রেজেন্ট' বা উপহার এসেছে ছখানা 'মহুয়া'। এমন সব গল্প উপন্যাস যা বাড়ির অনেকেরই পড়া। বিজলি-বাতিদান গোটা চার-পাঁচ। শাড়ি শতেকখানা। ট্রাঙ্কের মধ্যে বছরখানেক পরে দেখা গেল —অনেক শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে কেটেছে। কে সে শাড়ি দিয়েছিল সেদিন কারও মনে পড়ে না।

হিন্দুসমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে একটা উন্নাসিকতা ছিল আমাদের পরিবারে। তাছাড়া সেকালে উকিলদের পদমর্যাদা ছিল সমাজে—তাঁদের স্বাধীনচিত্ততার জন্য। নানা কারণে একটা হাস্যকর গর্ব অনুভব করতাম। আমাদের পাশের বাড়িতে যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো সামাজিক সম্বন্ধ ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে মাসি বা পিসী এলে পাঁচিলের এপার থেকে ইট বা কাঠের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। যাওয়া-আসা চলতো না—পাশাপাশি বাড়ি হলেও। সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব—সম্ভ্রমতায় বাধবে। এর নাম আভিজাত্য বা বর্ণ-কৌলীন্য। এর সঙ্গে ছিল ধন্য-কৌলীন্য ও সমাজে মর্যাদার কৌলীন্য। তাদের বাড়ি না-যাওয়ার কারণ বুঝলাম একদিন মা, মাসি, ফুটি গল্প করছে—আমরা উকিল-বাড়ির লোক, পড়শিরা মোক্তার—মামলার জগতে আমরা ব্রাহ্মণ—ওরা ব্রাহ্মণেতর। আসল কথা—'ওরা বাঙাল।' কী কথার ছিরি শোন না? ওদের শাড়ি পরার ঢংটা দেখেছো? কি রকম দোপাট্টা করে পরে। শাড়ি পরে তাদের উলঙ্গতা ঢাকে সেটা অপরাধ বৈকি। ফুটি বলে, 'সেদিন বাজারে গিয়েছি, দেখি ওদের বাবু শুঁটকি মাছ কিনছে।' মাসি বলে, তাই বল্। সেদিন দুপুরে মড়া-পোড়া গন্ধে ঘরে টেঁকতে পারছিলাম না। মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ফুটি বললে, 'জানো মাসি, ওরা বোয়াল মাছ খায়।' শুনেই মাসি বলে উঠলেন, রামো, রামো, ঐ মাছগুলো তো বাছুরের মতো ডাকে। ছিঃ ছিঃ!' এতগুলি অপরাধ যাদের, সে বাঙালদের বাড়ি যাওয়া যায় কি? সেই সংস্কার থেকে আমি আজ পর্যন্ত বোয়াল মাছ খেতে পারিনে, কিন্তু সর্বপ্রকার সিদ্ধ নিষিদ্ধ পশুপক্ষী ভক্ষণ করেছি—কিন্তু বোয়াল শুনলেই সেদিন মুখে মাছ

রোচে না। আর যে ব্রাহ্মণ্যগর্বে বাঙালদের নিয়ে অত ঠাট্ট-তামাসা চলতো, আজ আমার সংসারের সবাই পূর্ববঙ্গের।

হিন্দুর ধর্ম ও 'জাত' হাতের এপিঠ-ওপিঠের মতো অচ্ছেদ্য। জাত গেলেই ধর্ম যায়। আর অন্তজাতের হাতে ভাত খেলেই। ঘৃতপক্ক লুচি, মণ্ডামিঠাই খেলে কিছু হয় না--যত অপরাধ অন্নের। অন্নও খাওয়া যায় বিপাকে পড়লে। এক ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষের সময়ে শূদ্রের ঘরে ক্ষুধার্ত হয়ে অন্নগ্রহণ করেন—কিন্তু জল পান করেননি। বাংলাদেশে দুটো মাত্র জাত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—চলতি ভাষায় বামুন ও শুদ্দুর। মানুষের 'জাত তুলে' গাল দিতে ব্রাহ্মণদের মুখে বাধতো না। 'হবে না। বেটা শুঁড়ি।' আরে জানো না, ও তেলি—তিলি নয়। আরে রাখো, সোনার বেনের বামুন আবার বামুন। ডোম হাড়িরও তো বামুন আছে।' রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমরা, তাতে নাকি কুলীন ছিলাম,—সুতরাং বারিন্দির (বারেন্দ্র), বৈদিকদের ঘরে মেয়ে দেওয়া যেতো না। জাত, জাত, জাত। জাত তুলে গালাগালের ইতর অভ্যাসের পাশাপাশি ছিল প্রাদেশিকতার ইতরতা। পূর্ববঙ্গে লোকদের সম্বন্ধে যত কুৎসা ছড়াকাটা শুনতাম। বাঙাল পুঁটিমাছের কাঙাল, বাঙাল গঙ্গাজলের কাঙাল, বাঙাল ভাঙা পথের কাঙাল ইত্যাদি। কেউ বোকামি করলে বলতাম, 'বাঙাল নাকি?' গরীব লোক ও ছোটলোক প্রতিশব্দের মত ব্যবহার করতাম। মুসলমানরা ছিল 'নেড়ে'—তারা অস্পৃশ্য। তাদের একাসনে বসে খানাপিনার কথা কল্পনা করা যেত না খোলা বাজারে। নানা কারণে এখন আর জাত তুলে গালিগালাজ করতে বর্ণহিন্দুর সাহস হয় না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতীতদিনের লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবার আশায় দাঁত কড়মড় করে বলি, 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।' দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর লোক ভাগ্যের লেখা পড়তে পারেন না। আজও ভাবছেন দুনিয়ার দুধের সরটুকু তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের ভাগ্যে চিরন্তন হবে। তা যদি হতো, তবে অশোক, আকবরের বংশধরগণও রাজত্ব করতেন।

সবাই স্কুলে যায়। দাদা, মেজোকাকা, সেজোকাকা ছোটকাকা। আমি যাই পাঠশালায়। পাড়ার এক ভদ্রলোক সকালে সন্ধ্যায় কয়েকটি ছেলেদের নিয়ে বসতেন। রোজ প্রাতে দুটি আমায় পৌঁছিয়ে দেয়, ফিরিয়ে আনে বাড়ির ভৃত্য। সেখানেই পড়াশুনার হাতেখড়ি। হাতেখড়ি বলে যে একটা উৎসব হয়—তা আমার বেলায় হয়েছিল কিনা মনে নেই, শুনিওনি কোনোদিন হয়েছিল বলে। লেখাপড়ায় 'হাতেখড়ি' হয়নি, পরীক্ষাতেও পাস করেনি। তাই আজ পর্যন্ত নিজের লেখা মক্স করেই চলেছি। কেবলই মনে হয় কী একটা শেষ কথা আছে,

সে কথা বললে—সব বলা হয়। কিন্তু প্রশ্ন শেষ কথা কে বলবে ?

পাঠশালায় বর্ণমালা শিখলাম—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ' প'ড়ে। শব্দকে রেখায় রূপ দেবার বিদ্যা। আজ আশ্চর্য হয়ে ভাবি আমার মনের কথা মনের ভাবনা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করি। শব্দ-তরঙ্গে ভেসে শ্রোতার কানে প্রবেশ করছে, শ্রোতা যদি সে ভাষা জানে, তবে তা বোধগম্য হবে তার কাছে। এইভাবে কথার বিনিময় চলে। কিন্তু সেই মনের কথা মনের ভাবনা রেখা টেনে টেনে লিখি তা দেখে ও পড়ে লোকের ভাবোদয় হয়। শব্দ ও রূপের এই রহস্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই। সচেতন হতে হল যখন আঁকা-বাঁকা রেখাগুলোকে আয়ত্ত করে 'অজ, আম, ইট, উট, পড়তে শিখলাম। এই প্রথম ভাগের পাঠ থেকে বালক রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'র মধ্যে আদি কবির প্রথম কবিতারূপে প্রতিভাত হয়েছিল। আমার জীবনে প্রথম ভাগ পড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই এই ভাবোদয় হয়নি,—তাই কবি না হয়ে, কবির জীবনীকার হলাম।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের এক রচনা পড়ছিলাম 'মনোগণিত'—বিবিধ প্রসঙ্গের একটি প্রবন্ধ-কণা। তাতে Mathew Arnold-এর Revolutions নামে কবিতার মর্মার্থে লেখেন—"মানুষ যখন মর্তলোকে আসিবার উদ্যোগ করিল তখন ঈশ্বর তাহাদের হাতে রাশীকৃত অক্ষর দিলেন ও কহিলেন, এই অক্ষরগুলি যথারীতি সাজাইয়া এক-একটা কথা বাহির কর। মানুষেরা অক্ষর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল; গ্রীস লিখিল, রোম লিখিল, ফ্রান্স লিখিল, ইংলণ্ড লিখিল। কিন্তু কে ভিতরে ভিতরে বলিতেছে যে, ঈশ্বর যে কথাটি লিখাইতে চান সেটি এখনও বাহির হইল না।" (দ্রঃ Arnold Poem Revolution p 146) ছাব্বিশটি হরপ নিয়ে এই শব্দসৃষ্টির খেলা চলছে সহস্রাধিক ভাষায়! কোটি কণ্ঠের বাণী অগণিত শব্দের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। ছাব্বিশটি হরপে সবই রূপপরিগ্রহ করছে। নূতন নূতন শব্দ ভাষায় ভাষায় সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এ ছাব্বিশটি অক্ষরের যোগাযোগে তাদের রূপান্তর।

পাঠশালার বিদ্যা শেষ হলো। ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই সেখানেই ফার্স্ট বুক পড়া শুরু হয়। ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে পাল চৌধুরী স্কুলের নিচের ক্লাসে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। মেজোকাকা স্কুলে নিয়ে গেলেন। তিনি ও সেজোকাকা একই ক্লাসে পড়তেন—বোধহয় থার্ড ক্লাসে। দাদা ও ছোটকাকা একই সঙ্গে পড়তেন। দাদা আমার থেকে দুই বৎসরের বড়। দুটো ক্লাস উঁচুতে পড়তেন অর্থাৎ সিক্সথ ক্লাসে।

স্কুল কাকে বলে জানি নে—বয়স পাঁচ বৎসর হলেও, শহরের কোথাও বের হতাম না। হবার রীতিই ছিল না। আজকাল দেখি পাড়ায় আমার বয়সের ছেলেরা সারাদিন টো-টো করছে, ঘরের টানও নেই, শাসনও নেই যেন তাদের। ঘরের মধ্যে পরিবেশেরও অভাব—তাতেই মন টানে বাইরের দিকে।

স্কুলে যাবার আগে দাদা ও কাকাদের কাছে শুনতাম পড়া না পারলে 'নামিয়ে' ও পড়া পারলে 'উঠিয়ে' দেওয়া হয়। ঘরের মধ্যে দেয়ালে তাক্ আছে নাকি? সেখানে উঠিয়ে দেয় পড়া পারলে? আর না পারলে নিচের তাকে বসিয়ে রাখে? তাকে উঠিয়ে দেবে—নামতে যদি না পারি! এ রহস্যের কিনারা হলো স্কুলে গিয়ে। অপিসে রতন মাস্টার ভর্তির খাতায় নামধাম লিখে নিলেন। বেতন মাসিক চার আনা। কাকা বয়স লিখালেন তিন বৎসর। আমি তো তখন পাঁচ বৎসরের—কাকা তিন বৎসর লেখালেন কেন? বয়স হলে বুঝলাম বয়স কমাবার রহস্য! সরকারী চাকুরিতে ৫৫ বৎসরে অবসর গ্রহণ করতে হতো; চার-পাঁচ বৎসর কমিয়ে লেখাতে পারলে ষাট বৎসর পর্যন্ত তো পঞ্চান্নই থাকা যাবে। পাঁচটা বৎসর গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দেওয়া গেল তো। গভর্ণমেণ্ট দপ্তরে ফাঁকি চলে কিন্তু চিত্রগুপ্তের দপ্তরে ঠিক ধরা পড়ে। সেখানে বয়স উড়ানো যায় না।

সেকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সর্বনিম্ন বয়স বলে কিছু ছিল না—তাই খুব ভাল ছেলেরা ১২।১৩ বৎসরেও পাস করতে পারত। অল্প বয়সে পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হয় ভেবে হিতচিকির্ষু গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা দেবার বয়স ষোলো করে দিলেন—ষোলো পূর্ণ না হলে কেউ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারবে না। তখন বয়স বাড়াবার দরকার হলো। অভিভাবকরা কালীঘাটে গিয়ে আচার্য ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিয়ে কোষ্ঠী বা হরস্কোপ করিয়ে নিলেন—তাতে দেখা গেল পরীক্ষার সময়ে ছাত্রের বয়স ষোলো পূর্ণ হয়ে কয়দিন হয়েছে। কোষ্ঠী-ঠিকুজির বিকল্প ছিল অভিভাবকের পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হলপ করে বয়স ঘোষণা করা। বহুকাল পরে আমার একটা জীবনবীমার টাকা পাবার সময় হলো। বয়স যা সত্যি তা লেখা ছিল পলেসি করার সময়। তাতে হবে না জানালেন বোম্বাই-এর অপিস—হয় হরোস্কোপ, নয় এফিডেভিট। আমাদের পরিবারে বাবা কারও কুষ্টি-ঠিকুজি করাননি—বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং বিকল্প প্রমাণ এফিডেভিট। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে মেজোকাকা আমার তিন বৎসর বয়স লিখিয়ে স্কুলে ভর্তি করেছিলেন তিনিই এফিডেভিট করে আমার সত্যকার বয়স হলপ করে ঘোষণা করে এলেন। কয় বৎসর পূর্বে এই বয়স নিয়ে

কলকাতা হাইকোর্টের এককালীন বিচারকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কী কাদাই ঘাঁটলেন। যাক স্কুলের বয়স অপিসের বয়স ভাঁড়ানো সে-কালের রেওয়াজ ছিল—এটা দুর্নীতি বলে কেউ মনেই করতেন না।

স্কুলের নবম শ্রেণী আজকালকার সংজ্ঞায় দ্বিতীয় শ্রেণী। অক্ষর-পরিচয়াদি পূর্বেই সাঙ্গ করে এখানে এসে 'দ্বিতীয় ভাগ' পড়তে হয়। পড়ছি ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য। আমাদের নবম শ্রেণীতে পড়ান যোগেন পণ্ডিত। ইনি বাবার মামার বাড়িতে বাবার শিক্ষক ছিলেন—তাই আমার উপর নজরটা বেশি করে রাখতেন। পণ্ডিতমশায় গ্রাম থেকে রোজ আসেন—ঘোড়ায় চড়ে। শীর্ণ খর্বাকার দেহ; মুড়ো সম্মার্জনীর মত গোঁপ। দাড়ি রাখেন না, তবে সাতদিনে যা গজায় তা আদৌ শোভন নয়। সেকালে কোনো ভদ্রলোক নিজে ক্ষৌরকর্ম করতেন না—পণ্ডিতমশায় বোধহয় পাঁজি দেখে নাপিত ডাকতেন—ঠিক সময়ে নরসুন্দরের দেখা না পাওয়ার জন্য এবং সময়মতো স্কুলে হাজিরা দিতে হবে বলে সব শুভদিনে দাড়ি কামানো হতো না। ঘর্মাক্ত নিরীহ অশ্বটিকে বেঁধে রাখতেন একটা গাছের তলায়। পণ্ডিতমশায় বকুলতলায় ঘোড়া বেঁধে চাবুকটা হাতে নিয়েই ক্লাসে ঢুকতেন। প্রায় এক ঘণ্টা অশ্বপৃষ্ঠে যেটার ব্যবহার করে এসেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি চলে ক্লাসে এসে ছাত্রদের পৃষ্ঠে ও মস্তকে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার প্রবাদবাক্য আছে। কিন্তু ঘোড়া পিটিয়ে যে গাধা হয় সে কথা সে-কালের শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ বারো-আনি শিক্ষকই জানতেন না—তাঁরা মনে করতেন spare the rod and spoil the child। চাণক্যের উপদেশ মত কাজ করেন না কেউ—'তাড়য়েৎ পঞ্চ বর্ষানি' চলে বরাবর। লালন করা বন্ধুবৎ ব্যবহারের কথা কারও মনে পড়ে না। তাড়নায় ভয়ে বড় হলেই বাড়ি থেকে সরে থাকে, ক্লাস থেকে পালায়। স্কুলে তো 'পড়া নেওয়া' হতো। মাস্টার মশায় পড়া দিতেন—ঘরে পড়ে এসে ক্লাসে তার পরীক্ষা দিতে হতো। উত্তর দিতে না পারলেই শাস্তি। প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকা; তাতেও যদি শিক্ষকের ক্রোধ শমিত না হতো, বেন্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন—অথবা নীল-ডাউন বা হাঁটু গেড়ে খাড়া হয়ে থাকা—পায়ের উপর পিছনটা দিলেই কান ধরে সোজা করে দেওয়া হতো। দিনের পর দিন শাস্তির মাত্রা বেড়ে চলে—চড়, চাপড়, কান মোলার পালা, শেষে বেত মারার পর্ব। কান ধ'রে 'উঠ-বোস' করাতে শিক্ষকদের ভালো লাগতো। কিন্তু সব থেকে অপমানকর ছিল,—পড়া না পারলে, যে পেরেছে তাকে দিয়ে কান-মলানো! বন্ধুবর্গের মধ্যে হলে হাতটা সে ঘুরিয়ে দেখাতো যেন খুব কষে কান মলছে; কিন্তু অ-বন্ধুরা সুযোগ পেলে কান মলামোটা

মনের মতো করে নিষ্পন্ন করতেন। মোট কথা শিশু ও বালকদের অপমান করে বা দৈহিক শাস্তি দিয়ে শিক্ষকরা মনে করতেন ছাত্রদের অধ্যয়নশীলতা, পাঠে মনোযোগ প্রভৃতির উন্নতি হবে।

ইংরেজি পাঠ শুরু হলো প্যারিচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক' দিয়ে—ম্যাকমিলন কোম্পানী প্রকাশক। ছাপাও হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনে—হয় লণ্ডনে নয় এডিন-বরাতে। পড়তাম বি-এল-এ 'ব্লে', সি-এল-এ 'ক্লে' ইত্যাদি। কয়েকটা পাঠ ছিল, তার মধ্যে এখনো মনে পড়ে খোঁড়া লোকটার ছবি—I met a lame man in a lane, ইংরেজি বই তো এই। তার আবার আশুতোষ দেব প্রণীত অর্থপুস্তক। প্রত্যেকটি ইংরেজি শব্দের বাংলায় উচ্চারণ ও অর্থ দেওয়া। যাদের বাড়িতে পড়া বলে দেবার কেউ নেই, তাদের পক্ষে এই অর্থপুস্তকই গৃহশিক্ষকের কাজ করতো। বসুমতী প্রকাশনীর 'রাজভাষা' পড়ে কত শত লোক ইংরেজি শিখে অপিসে আদালতে পিওনের কাজে উন্নতি করেছে।

এক এক ক্লাসে উঠি আর নূতন নূতন বই কিনি—Royal Readers, Chambers Reader। সবই বিলাতী বই। নূতন বই এলে মেজোকাকা সযত্নে মলাট দিয়ে দিতেন। নূতন বইয়ের সোঁদা গন্ধ বেশ লাগতো—আজও নূতন বই-এর জন্য মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বোধহয় রয়েল রীডার্স-এ পড়ি—একটা গল্প এখনো মনে আছে। এক রাজা খুব দাতা। তাঁর নগরে কোনো অভুক্ত থাকতে পারতো না—খাদ্যাভাব হলেই রাজবাড়ির তোরণের নিচে একটা দড়ি ছিল—সেটা টানলেই তোরণের ঘণ্টা বেজে উঠতো। রাজা বুঝতেন কোনো অভুক্ত লোক এসেছে। একদিন শব্দ শুনে গিয়ে দেখেন একটা ঘোড়া দড়ি টানছে—সে বেচারা সেদিন দানাপানি বোধহয় পায়নি।

একটু বড় হতেই, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠতেই Childs Easy Grammar হলো পাঠ্য—আর একটু পরে Rowe and Webb-এর ইংরেজি ব্যাকরণ—আরও বড় হলে Hints to English Grammar and Composition—আরও পরে Nesfield-এর মোটা বইটা কিনতে হয়েছিল। Idiom, Preposition-এর প্রয়োগ কত মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু ইংরেজি শিখেছি এমন কথা তো বলতে পারিনে। কেউ কখনো ব্যাকরণের মূল কথা বুঝিয়ে দেননি—আজ পাঠ্য-সাহিত্য থেকে ব্যাকরণের সূত্র না ধরিয়ে 'গ্রামার'টাকে একটা পৃথক শিক্ষণীয় বিষয় করাতে তা মনে গেঁথে বসতো না—খাদ্যের মধ্য দিয়া পুষ্টি ও ভাইটামিন না দিয়া, পৃথক ট্যাবলয়েড মাধ্যমে কি শরীরকে স্বাস্থ্যবান করা যায়?

বড় ক্লাসে Scott-এর Talisman-এর লম্বা লম্বা বাক্য Analysis করেছি।

কিন্তু কোনো দিন শিক্ষক তো বলে দেননি যে প্রথমে বাক্যটায় বক্তাকে (Subject) বের কর এবং বক্তা কি বলতে চান (Predicate) সেটা খুঁজে দেখো। কেউ বলেননি মানুষের ভাষায় দুটি মাত্র 'ক্রিয়া' আছে, মানুষ কিছু 'করে' (do) বা সে একটা কিছু 'হয়' (be)। পূর্বে (pre) বসলে (position) সেটা হয় বাক্যের একটা অংশ (part of speech)। তা না বুঝে শুধু বলতাম, 'স্যার এটা কোন্ 'পার্টস অব স্পীচ্' অর্থাৎ নাউন, এড্জেকটিভ, এড্ভারব কী হবে। মোট কথা শিক্ষাপদ্ধতিতে গলদ—গৃহ-শিক্ষকরা পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, অভিভাবকরা উদাসীন—ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

আজ জানি বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের মূলে রয়েছে গণিত,—গণিত নির্ভুল বলেই আজ মহাকাশ ঘুরে চন্দ্রদানব যথাসময়ে, যথানির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসছে অক্ষত দেহে। মঙ্গলগ্রহে হানা দিচ্ছে। সেই গণিতের গোড়ায় পড়তে হয় পাটীগণিত। একটু উঁচুতে উঠেই পড়ি বীজগণিত, জ্যামিতি। আজ দেখছি ত্রিকোণমিতি, সংখ্যাতত্ত্বও ছেলেরা পড়ছে ঐ বয়সে—সর্ববিদ্যার বুনিয়াদ পত্তন করেছেন সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়গুলি। আমাদের সময়ে স্কুলে নামতা মুখস্থ করতাম। সর্দার পোড়ো, অর্থাৎ ক্লাসের মধ্যে ভালো ছেলেরাই নামতা হাঁকতো। 'পাঁচেককে পাঁচ'—আমরা বলতাম তারস্বরে 'পাঁচেককে পাঁচ'। এইভাবে দশের ঘর পর্যন্ত মুখস্থ করতে হয়। আজও শুনি সেই রব পাঠশালা থেকে ভেসে আসছে। নামতা ছাড়া কড়া, গণ্ডা, বুড়ি—কত কি মুখস্থ করতাম—আজকালকার ছাত্রদের সে সব জঞ্জাল ঘাঁটতে হয় না—দশমিক সব জটিলতাকে সরল করে দিয়েছে।

নীচের ক্লাসে ছিল যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাংলা পাটিগণিত, একটু উপরে উঠতেই বাংলা বই তো আর পড়া যায় না। তাই ইংরেজি 'এরিথমেটিক' কিনতে হলো—গৌরীশঙ্কর দে গ্রন্থকর্তা। গৌরীশঙ্কর দে ছিলেন সেকালে 'জেনারেল এসেমব্লি' কলেজের গণিত অধ্যাপক। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের বালকমহলে কত আজগুবী কথা চলিত ছিল! তাঁর মাথা গবর্ণমেণ্ট কিনে রেখেছেন, মরে গেলে মাথার খুলি ভেঙে দেখবেন এমন গাণিতিক শক্তির উৎস কোথায়। এই কিম্বদন্তী ছাত্রমহলে বাংলাদেশের সর্বত্র চালু ছিল। বড় বড় সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ স্বল্প সময়ের মধ্যে করতে পারেন এমন অসামান্য শক্তিধরদের কথা পড়েছিও, শুনেছিও। এমন কি দেখেওছি। একদিন বাড়িতে বসে আছি—অত্যন্ত এক সাধারণ লোক মলিন পায়জামা ও বুশশার্ট পরা—এসে বললেন, 'ম্যাজিক দেখবেন ?' হাতে অবসর ছিল, বললাম, দেখান আপনার ঘটে যা আছে।' লোকটি বললেন, 'আমায় চোখ বেঁধে দিয়ে ঐ দরজার উপর খড়ি দিয়ে যে কোনো

সংখ্যার দুই ছত্র অঙ্ক লিখে দিন—আমি যোগ করে দেবো। চোখ আপনারা বাঁধবেন।'

অবাক হয়ে দেখলাম ঠিক যোগফল লিখে গেলেন। কেমন করে হয় জানিনে। কিন্তু যখন Para-psychology সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিবন্ধ পড়ি তখন বিহ্বল হয়ে ভাবি কত রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। Telescope, Radio-Telescope, Microscope, Electronic microscope প্রতিদিন অসীম ব্যোম ও অনু, পরমাণু, পরমাণু পারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্রের সন্ধান পাচ্ছেন। কিন্তু দেহের মধ্যে তার অতলে অবগাহনের পথ এখনো বাকি। আমাদের দেশের জ্ঞানীদের যোগশাস্ত্র ও বৈষ্ণবদের রসশাস্ত্র এই রহস্য আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু তা সাধারণের কাছে তেমনি দুর্বোধ্য যেমন দুর্বোধ্য পাশ্চাত্ত্য গণিত-বিজ্ঞানের তত্ত্বরাজি।

পাটিগণিতে বুদ্ধির অঙ্ক বলে যা থাকতো তা আমার বুদ্ধির অগম্য। একটা চৌবাচ্চায় একটা নল দিয়ে জল ঢুকছে এবং আর দুটো নল দিয়ে জল বের হচ্ছে। সেকেণ্ডে যদি এতখানি জল ঢোকে, তবে চৌবাচ্চা খালি হবে কখন—এই ধরনের বুদ্ধির পরীক্ষা। জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধহীন পুঞ্জীভূত তথ্য শেখানো হতো; অথচ মাসান্তে বাজারের হিসাব, ধোপার হিসাব প্রস্তুত করতে কালঘাম ছুটে যেতো। চতুর্থ শ্রেণীতে জ্যামিতি শুরু হলো—ইংরেজি Definition মুখস্থ A point is that which has magnitude but no space, বেশ বয়স হলে বিন্দুর রহস্য বুঝি, যেমন বুঝি 'শূন্য'র মূল্য। কোন্ আদিকালে নীলনদের বার্ষিক প্লাবনে ডোবা জমি দিয়ে জল চলে গেলে যে সমস্যা চাষীদের মধ্যে সৃষ্টি হতো তা নিরাকৃত করার জন্য গ্রীক গাণিতিক ইউক্লিড, এই জ্যামিতির মাপ-জোক দিয়ে বিবাদের মীমাংসা করে দেন—এ সব কথা শুনতাম গৃহশিক্ষক যুগলদার কাছে। তিনি বলতেন, 'জ্যামিতির বইয়ের দেখানো 'বুক ওয়ান', 'বুক টু' ইত্যাদির মানে জানো? সেকালে পাপাইরাস কাগজে ঠিকুজির মতো গোল-গোল বইয়ের নম্বর এগুলো। তোমরা শুনে অবাক হবে পৃথিবীতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের পাঠ্য বিষয় ও বইয়ের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু ইউক্লিডের Stoichia আজও Geometry নামে পৃথিবীর সমস্ত স্কুলে পড়ানো হচ্ছে। এককালে Todhunter-এর জ্যামিতির বই ছিল পাঠ্য: আমাদের সময় Hall and Stevens নামে দুই অধ্যাপক সম্পাদিত বই পাঠ্য ছিল। Todhunter সত্যিকারের পণ্ডিত ছিলেন। যুগলদার কাছে এই ধরনের অনেক তথ্য মাঝে মাঝে শুনতাম।

চতুর্থ শ্রেণীতে Algebra আরম্ভ হয় কে. পি. বসু বা ঢাকা কলেজের

অধ্যাপক কালীপদ বসুর বই পাঠ্য—প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বই।

ভারত ইতিহাস পড়তাম—তাও ইংরেজিতে লেখা। আবদুল করীম বোধহয় স্কুল-ইন্সপেক্টর ছিলেন—তাঁর ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস ছিল পাঠ্য। বাংলা লেখা তাঁর একটা ইতিহাস ছিল তা আমরা পড়িনি, চোখেও দেখিনি। তাছাড়া বাংলা পড়া সম্বন্ধে একটা উন্নাসিকতা ছিল সেকালে ছেলেদের মধ্যে। এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষনীয় বিষয়ই ছিল না। চতুর্থ কি তৃতীয় শ্রেণীতে বোধ হয় স্কুলে বাংলা পাঠে যবনিকা পড়ে। বাংলা সাহিত্য পড়া বা বাংলা ভাষা চর্চা করা ও বাংলায় প্রবন্ধাদি রচনা করার কথা মনে কখনো হতো না। তবে দাদার বাংলার প্রতি টান ছিল। কবিতা লিখতেন—একটা ইংরেজি গল্প পড়ে তার ছায়াবলম্বনে উপন্যাসও লিখে ফেলেন। আমরা পরস্পরকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতাম—এখনো মেজাজ খারাপ হলে যেমন মুখ থেকে হিন্দী ও ইংরেজী গালাগালি বের হয়—তেমনি রাগের মাথায় ইংরেজিতে চিঠিও লিখে ফেলি। সে রচনায় ঐ ভাষার ব্যাকরণ, ইডিয়ম্-এর মান রক্ষা হলো কিনা—সে ভাবনা আসে না। ইংরেজিয়ানা যে কী হাড়ে-হাড়ে বিঁধে গেছে তার প্রমাণ নগরে ও শহরে অলিতে-গলিতে English medium-এর K. G. School!

ইংরেজি শিখতে হবে বলে ডিবেটিং ক্লাব স্থাপিত হয়—বড়রা নাম দেন 'ব্যানড্ অব্ হোপ'। এর পাণ্ডা ছিলেন সন্তোষকুমার বসু। তর্কের বিষয় দেওয়া হলো। Idle brain is the devils workshop। আমি লিখলাম দাদা শুদ্ধ করে দিলেন। মুখস্থ করে সভায় উগ্‌রে দিলাম। দাদা বাংলা ইংরেজি দুই-ই বলতে পারতেন ভালো। আমি বক্তৃতাবাগীশ হয়েছি প্রৌঢ় বয়সে।

পরীক্ষা বিভীষিকা ছিল। বৎসরের মধ্যে ত্রৈমাসিক বা কোয়ার্টারলি ষান্মাসিক বা হাফইয়ার্লি ও শেষ পরীক্ষা বৎসর শেষে অ্যান্যুয়েল। অল্পস্বল্প জিজ্ঞাসাবাদ চলতো, কিন্তু আজকালকার মতো পুকুরচুরির পরিবেশ গড়ে ওঠেনি তখনো। পরীক্ষা তো জীবনে বেশি দিতে হয়নি, তাই পাড়ার ছাত্র-ছাত্রী নাতি নাতনীদের উদ্বেগপূর্ণ জীবন দেখলে দুঃখ হয়—কোথাও একটা গলদ করছি আমরা যার জন্য আজ পৃথিবীব্যাপী এই ছাত্রবিক্ষোভ। পণ্ডিতরা এই সমস্যা পূরণের জন্য যেসব ভাষণ দান করেন, প্রবন্ধ লেখেন, তা হিংটিংছটের অর্থ ব্যাখ্যানেরই তুল্য।

পরীক্ষা ছাড়া আর দুটো স্মৃতি জাগছে। স্কুল-ইন্সপেক্টরের বিদ্যালয় পরিদর্শন বিভীষিকা। সেকালে বাংলাদেশের বিভাগে বিভাগে ইন্সপেক্টর থাকতেন—

আজকাল তো জেলায় জেলায় তাঁরা আছেন। ইন্সপেক্টর আসছেন এই সংবাদ আসামাত্র চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। সাফাই, ঝাড়াই কাজে লেগে যায় ফালতু মজুর। স্কুলের একমাত্র বেয়ারা, দপ্তরী তথা পানিপাঁড়ে, মাস্টার মশায়দের হুঁকা-বরদার তথা ঝাড়ুদার—সবেধন নীলমনি 'ছিরু'। তার ভালো নাম কথনো শুনিনি, থাকলেও কেউ জানতো না। লম্বা কুঁজো মানুষটি রেজিস্টার বা হাজিরা-বহি বগলে করে ক্লাসে ক্লাসে ঘোরে। এটা তার নিত্য কাজ। কিন্তু যেদিন জীর্ণ ছিন্নমলাট নোটিশবুক নিয়ে ক্লাসে আসতো বুঝতাম একটা ছুটির ঘোষণা অথবা কোনো বিশেষ সংবাদ আসছে। এরকম একটি ঘটনার কথা মনে আছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার (১৯০১, জানুয়ারি ২২) মৃত্যুসংবাদ এসেছে, সেজন্য ছুটি। অর্থাৎ স্কুল থেকে বের হয়েই ছুটোছুটি শুরু।

ইন্সপেক্টর আসছেন—ছিরুর গায়ে একটি কোট উঠেছে। সে খুব চটপটে আজ,—এখানে ওখানে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে তুলছে। হেডমাস্টার নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সকাল সকাল এসেছেন, সাদা পেন্টালুন পরেছেন, কালো চোগা চাপকান গায়ে উঠেছে। সারা স্কুল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে ফোর্থ টিচার প্রিয়বাবু। সেদিন মনে হচ্ছে স্কুলে একটি ছাত্র নেই—এমন নীরবতা। ইন্সপেক্টর এলেন—বাঙালি সাহেব পি. মুখার্জি, বিলাত-ফেরত। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, খর্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ সাহেব, চোখে চশমা। আমাদের ক্লাসে এলেন, দাঁড়িয়ে নমস্কার করে অভ্যর্থনা করতে হয় সে শিষ্টতার শিক্ষা কেউ দেয়নি। তাই দাঁড়ালাম মাত্র। চেয়ার গ্রহণ করে ইংরেজিতে বললেন, 'বসো।' পড়ছিলাম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর 'লুসি গ্রে' কবিতা। প্রথমে তিনি কবিতাটি পড়লেন ছন্দ রেখে অতি সুন্দর ভাবে। তাঁর মুখেই শুনলাম অফনের (Often) উচ্চারণ 'আফটেন'—তিনি পড়লেন 'অফটেন আই হার্ড অব লুসি গ্রে'। এবার প্রশ্নের পালা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন you little boy in the corner। কি প্রশ্ন করেছিলেন মনে নেই তবে উত্তর দিতে পেরেছিলাম—পা কাঁপছে, অতিকষ্টে শব্দ বের হয়েছিল। এই আতঙ্কের মধ্যে পড়াশুনা হতো সেকালে। হেডমাস্টার ও শিক্ষকরাও কাঁপতেন ইন্সপেক্টর এলে। আজ স্বাধীন ভারতে স্কুল-ইন্সপেক্টরের কী মান তার আলোচনা করলাম না—তবে ভয় তাঁদেরও করতে হয়—কখন কোন্ গ্রাণ্ট সামান্য কেরানীর ভুলের জন্য আটকে দেবেন! যাক সে কথা।

ছিরু একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। এতো কাল পরেও তার কথা স্পষ্ট করে মনে আছে। স্কুলের এক পাশে খড়ের একটা ঘর—সেটার একটা কামরায়

শিক্ষকদের তামাক খাবার আড্ডা। এই কাজে ছিরু ছিল পটু। পাশের ঘরে জল খেতে যাবার সময় দেখতাম প্রিয়বাবু ডাবা হুঁকো নিয়ে ফরাত ফরাত করছেন—কখনো দেখি সদ্ ব্রাহ্মণ আশু চাটুজ্যে কলার পাতার নল বানিয়ে হুঁকো টানছেন—মনমোহনবাবু তামাক টানতে টানতে কাশছেন—ছিরু সকলের সেবায় আছে। জলের ঘরে যখন জল থাকতো না, তখন যেতাম পাশের হোটেলে। একটা চারচালা ঘর—হুমড়ে পড়ছে সামনেটা। জল চাই বলে দাঁড়ালেই একজন ঝি কাঁসার ঘটি করে পিঁড়ে থেকে অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিত—জালার ভিতর পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল।

গরমকালে কয়টা মাস মর্ণিং স্কুল বা সকালে স্কুল বসতো। তাড়াতাড়িতে ভাল খাওয়া হতো না তাই আটটার সময়ে দুটি ঝি বা কোনো ভৃত্য দুধ ও সন্দেশ নিয়ে টিফিন দিতে যেতো। টিফিনের ঘণ্টা সেকালে ছিল না—ক্লাসে বসে আছি, কোন ছাত্রবন্ধু ইঙ্গিতে জানালো বাড়ি থেকে লোক এসেছে খাবার নিয়ে। অনুমতি নিয়ে বাইরে যেতে খুবই লজ্জা করতো—টিফিন খেতেই হবে। গিয়ে চোঁ চোঁ করে দুধ খেয়ে সন্দেশটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করে ক্লাসে ফিরে আসতাম। ক্লাস শেষ হয়ে গেলেই বাড়ি ফিরে অন্য ছেলেরা নদীতে স্নান করতে যায়—কেউ কেউ 'ডবল' ধুতি পরে আসে। তাদের দেখাদেখি আমিও কাউকে না বলে দু'খানা ধুতি পরে ক্লাসে আসি ও ক্লাস থেকে বের হয়ে একখানা কাপড় ডাঙায় রেখে, আর একটা কাপড় পরে স্নান করলাম। বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম—সেদিন থেকে আর নদীতে নামা হয়নি—পনেরো বৎসর নদীতীরে বাস করে না শিখলাম সাঁতার, না করলাম নদীস্নান। এটা হচ্ছে সেকালের মেকি আভিজাত্য।

নদীতে যাওয়া বন্ধ হবার কারণও ঘটলো। আমাদের সহপাঠী অবনী চাটুজ্যের ভাই নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। আরও খবর এলো বড় মামার বড় ছেলে গঙ্গায় ডুবে গেছে। এইসব ঘটনার ফলে চিরদিন ভদ্রলোক হয়ে থাকলাম—সাঁতার দেওয়া, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, কুস্তি করা, এমন কি ফুটবল খেলাও শিখলাম না। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাস করা। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস তাও অদৃষ্টে জুটলো না—মধ্যবিত্ত জীবনের পরম কাম্য বি. এ. পাস করে হয় ওকালতি পড়া, নয় স্কুলমাস্টারি করা।

একটা দিনের কথা বলি—কী অবাস্তবতার উপর শিক্ষাবিধির ভিত্তি উঠতো। কলকাতা থেকে এক বক্তা এসেছেন—ভাষণ দেবেন ছাত্রমহলে। স্কুলের মাঝে একটা হল ছিল, সেখানে সভা। বক্তার নাম ললিতবাবু—আজ মনে হয় তিনি

ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা বাগ্মী, পণ্ডিত ললিতমোহন দাস। ভাষণ ইংরেজিতে প্রদত্ত হবে তবু গেলাম। স্কুলের পুরাতন কয়জন ছাত্র এখন কলকাতায় পড়েন, তাঁরা এসেছেন—তাঁরা গান করবেন। বক্তৃতার আরম্ভে গান হলো—

'জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে'

শুনলাম রবি ঠাকুরের গান। এই পর্যন্ত। কে রবি ঠাকুর, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। সে সব জানতে আরম্ভ করি স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হলে ১৯০৫ সালে—সে সব কথা যথাস্থানে আসবে। বক্তৃতা শুনলাম, একটা কথাও বুঝিনি, কেবল একটা শব্দ কানে মিষ্টি লেগেছিল Jejune। বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, স্বল্প মনকে যা তৃপ্তি দেয় না। তবে একটা শব্দের নানা অর্থ হয়—বক্তা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা যদি বলতে পারতে, তবে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

স্কুলজীবনের মনে রাখার মতো দিন 'প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন' বা পারিতোষিক বিতরণ উৎসব—বৎসরে একটি দিন ফিরে ফিরে আসতো। কোনোদিন কোনো 'প্রাইজ' পাইনি বলেই দিনটার কথা মনে আছে।

পালচৌধুরীদের বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা—আজ তাকে দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। সেই চকমিলানো বাড়ির মাঝে পূজার দালান আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। পাল চৌধুরী স্কুলের সেক্রেটারি হতেন পালচৌধুরী বংশের কোনো ব্যক্তি—আমাদের সময়ে যোগেশ পালচৌধুরী ছিলেন সেক্রেটারি। বার্ষিক সভা বসে পূজার দালানের সম্মুখে; মঞ্চে বসেন সভাপতি; সেক্রেটারি, হেড-মাস্টার, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা;—ছাত্র ও অভিভাবকরা বেঞ্চে বসেন উঠোনে। সেক্রেটারি ইংরেজিতে বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লেন; তারপর শুরু হলো 'রেসিটেশন' বা আবৃত্তি আদি ব্যাপার—যার সঠিক নাম হয়েছে 'ফাংশন'। কাঁসারিপাড়ার বটকৃষ্ণ দত্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে শক্তিমান যুবক—পড়াশুনায় মাঝারি রকমের ছাত্র—তবে সংস্কৃত আবৃত্তি করতেন আশ্চর্যভাবে সুন্দর করে। আবৃত্তি করলেন 'শিবাষ্টকম'—প্রভুমীশ মনীশ অশেষ গুণং ইত্যাদি। আবৃত্তি শেষে হাততালি দেওয়া রীতি ভাল লেগেছে তার প্রমাণ। হাততালি দেওয়াটা পাশ্চাত্য রীতি—যেমন জয়ধ্বনি দিতাম 'হিপ্ হিপ্ হুররে' আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য। ভগবানের স্তোত্রের পর হাততালি।

এর পর হলো ক্যানুট (Canute) ও তার সভাসদদের সংলাপ। আমরা ক্যানুটকে বলতাম ক্যান্যুট—ভুল উচ্চারণ কেউ শুধরে দিতেন না। ক্যানুটের ভূমিকা

গ্রহণ করেন দাদা। পারিষদগণ রাজাকে বলছে জলস্থলে তিনি একচ্ছত্র, তুলনাহীন তাঁর শক্তি। ক্যানুট সিংহাসন নিয়ে সমুদ্রতীরে বসে আছেন—সভাসদদের প্রশ্ন করলেন, 'সাগরও কি আমার আদেশ মানবে?' 'নিশ্চয়ই' বললেন তোষামোদীদের দল। সমুদ্রের তরঙ্গ আগিয়ে আসছে—রাজা সাগরকে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন। সাগরতরঙ্গ আগিয়ে আসতে থাকলো। ক্যানুট তখন পারিষদদের বৃথা তোষামোদ করার জন্য তিরস্কার করে উপদেশ দিলেন।

'প্রাইজ' দেবার পালা শুরু হলো। ভালো ছেলেরা ভালো ভালো ইংরেজি বই পেল পারিতোষিক। দাদা একবার পেয়েছিলেন টমাস ডে (Day) নামে এক লেখকের Sandford and Merton নামে বই, আর পান Good for Nothing নামে গল্প। বাবা সন্ধ্যার পর তাকিয়ায় মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে বইটা পড়ে শোনাতেন, বাংলায় অর্থ করে দিতেন। একবার দাদা স্কটের 'আইভ্যান হো' নভেল প্রাইজ পান—সে বই পড়বার বয়স ও বিদ্যা তখন তাঁর হয়নি। বাংলা বই দেওয়া হতো না। ইংরেজি শিখতে হবে যে। তা ছাড়া বাংলা বই তখন ছিলই বা কি? আর বাংলা প্রকাশকরা কোথায় তখন? একমাত্র গুরুদাসই নামকরা।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আমি জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। জীবনে প্রাইজ পাইনি পড়াশুনায় ভালো বলে। Good conduct, Regularity প্রভৃতির জন্য প্রাইজ ছিল; শান্তশিষ্ট ছিলাম না, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম বলে কামাইও করতাম, তাই সে সব প্রাইজই পাইনি। ভাল ছেলে বলে প্রাইজ পেতো প্রবোধ। অতি নিরীহ, ক্লাসে ঠিক সময়ে আসে, একটি কোণে চুপ করে বসে, পড়াশোনায় আমাদেরই মতো। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। সেই প্রবোধ পেতো গুড্ কন্‌ডাক্‌টের প্রাইজ। বহু বৎসর পরে দার্জিলিং যাচ্ছি—নেমেছি স্টেশনে—দেখি রেলওয়ে উর্দি পরে প্রবোধ। আমায় দেখে কাছে এল, কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারলো না—অদূর থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তুড়ি দিয়ে ডাকলেন—হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল—আর তাকে দেখিনি।

সুবোধ গাঙ্গুলি নামে একটি চশমা-পরা বছর বারো বয়সের ছেলে এসে ভর্তি হলো স্কুলে। চশমা-পরা ছেলে তখন একজনও ছিল না স্কুলে—তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য ছোট বড় সবাই সুযোগ খোঁজে। বেচারা অতি ভালমানুষ, ভদ্র। কারও সঙ্গে সে কথা বললে সবাই মনে করে কী ভাগ্য ছেলেটার। সেই চশমা-পরা ছেলেকে দেখলাম বহু দশক পরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে। দিকেন্দ্র

ফ্রেমের চশমা, তিন-চারদিনের ক্ষৌরি না-করা মুখ, বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ, কেট্‌সের জুতোয় আঙুলের কাছটায় ফুটো, হাতে ব্যাগ। দেখা হওয়াতে প্রথম উচ্ছ্বাস, তারপর মধ্যবিত্ত সংসারের সংগ্রামময় জীবনের কাহিনী শ্রবণ। চলে গেলে ভাবলাম কে হরণ করে নিল তার কৈশোরের সেই মুখ, সেই সরল হাস্য! মানুষ সংসার পাতে সুখের জন্য। সে কি সত্য সুখ পায়? দুঃখের, দারিদ্র্যের অনেক কথা শুনি লোকমুখে—কিন্তু তার থেকে মুক্তি কি চায় মানুষ?

স্কুলজীবনে কত বন্ধুই জোটে। কী নিবিড় ভালবাসা। মনে পড়ছে সুধীর ও অমূল্যকে—ভালো ছেলে সত্যি তারা। সে যুগে সব বিষয় ইংরেজির মাধ্যমে পড়তেও প্রকাশ করতে হতো। এমন কি সংস্কৃত পড়ে ইংরেজিতে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হতো। থার্ড ক্লাসে পড়ি। ইংরেজি পড়াতেন আশু চাটুজ্যে—স্কুলের বিভীষিকা তিনি। আমাদের পাড়ার কাছেই বাড়ি—তাঁর দুর্দান্ত ছেলে দাদাদের সহপাঠী। বাপ অটলকে যত মারে, অটল তত বাপকে ফাঁকি দিয়ে দুষ্কর্ম করে বেড়ায়। মনে পড়ছে একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে—স্কুলের ক্লাসের ছাদের একটা কোণ ভেজা ভেজা। ক্লাসে কেউ নেই তখন—অটল ঢুকে লোহার বাঁটওয়ালা ছাতা কোথা থেকে এনে, টেবিলের উপর টুল তুলে তার উপর দাঁড়িয়ে ঠুকে ঠুকে ছাদের সেই জায়গা এমন জখম ক'রে দিল, ঘরের মধ্যে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগল। এ অবস্থায় ক্লাস করা সম্ভব নয়—'রেনি ডে' বা বৃষ্টির জন্য ছুটি হয়ে গেল।

আশু চাটুজ্জে টেবিলের উপর পা দুটি তুলে ইংরেজি পাঠের ইংরেজিতে Explanation বলে যাচ্ছেন আর আমরা তাই লিখে নিচ্ছি। ছাইভস্ম কি লিখলাম জানিনে। পরে সুধীর ও অমূল্যর খাতা দেখে নিজের লেখা শুদ্ধ করে নিতাম। তবে আসল নির্ভর অর্থপুস্তকের উপর।

স্কুলের হেড্‌মাস্টার নারায়ণবাবুকে সমীহ করতাম; দ্বিতীয় শিক্ষক গোষ্ঠবাবু একটু পাগলাটে ছিলেন বলে তাঁকে ছেলেরা বিরক্ত করতো—কিন্তু পড়াতেন ভালো। তিনি উঁচু ক্লাসে অঙ্ক কষাতেন—ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হাঁকতেন take down, take down অর্থাৎ 'অঙ্ক লেখ'। এসেই ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে গিয়ে অঙ্ক লিখতে শুরু করে দিতেন। ছেলেরা জুতো ঘষে শব্দ করে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলতো। নূতন একটা ছেলে এলো উত্তর প্রদেশ থেকে। বয়সে আমাদের থেকে বড়, মিচ্‌কে শয়তান; তার প্রেরণায় অন্যেরা এই শব্দ সৃষ্টি করতো। বেশী গোলমাল হলে হেডমাস্টার এসে দরজার কাছে দাঁড়ালেই সব শান্ত, ভিজে বেড়ালটি হয়ে যেতো।

থার্ড মাস্টার আশুবাবুকে দেখতাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কপালে রক্তচন্দনের তিলক—শুনতাম তিনি তান্ত্রিক সাধনা করেন, অর্থ কী বুঝতাম না। শিকারী বলেও নামডাক ছিল। সেকালে নেকড়ে বাঘ বা গোবাঘা শহরের আনাচে-কানাচে দেখা যেতো। আশুবাবুর গাদা বন্দুকের আওয়াজে তারা দূরেই থাকতো। একদিন শুনি তিনি এক বাঘ মেরেছেন। ব্যাপার কি? নাসড়াপাড়ায় অনেক পুরাতন বাড়ি, ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে। একটা ঘরে এক বুড়ী ও তার নাতনী থাকে। বুড়ী গিয়েছে ডোবায় জল আনতে। নাতনী ঘরের কাছে এসে দেখে ঘরের ভিতর বিছানার উপর একটা বাঘ শুয়ে। মেয়েটা চেঁচামেচি না করে, দরজার শিকলি উঠিয়ে দিয়ে লোকদের জানালো ঘরে বাঘ ঢুকেছে। আশুবাবু সেই খবর পেয়ে তাঁর গাদা-বন্দুক ভরে এলেন বাঘ মারতে। জানলা দিয়ে তাক করে বধ করলেন সেই অবাঞ্ছিত অতিথিকে। তারপর লোকে বাঘটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে শহর ঘোরালো। সে কী উৎসাহ আমাদের—আশুবাবু 'হিরো' হয়ে উঠলেন।

চতুর্থ শিক্ষক মনমোহনবাবু, তাঁর পুত্র মুরারী বা মন্‌তো-আমাদের সহপাঠী। মনমোহনবাবুকে সত্যই শ্রদ্ধা করতাম কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতেন, হেসে কথাও বলতেন। এই যে শিক্ষকদের কথা বললাম, এঁদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা ছিল, এঁদের স্ত্রীরা ছাত্রদের নিজ পুত্রের মতই দেখতেন, গেলেই ঘরে যা থাকতো তাই বলতেন খেয়ে যেতে। তাঁদের ছেলেদেরও আমাদের ঘরে অবাধ গতি ছিল—এমন কি দুর্দান্ত অটল আমাদের বাড়ি এসে অন্যরকম হয়ে থাকতো—কেন জানিনে।

বোধহয় ১৯০২ সাল। ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে উঠলাম—বয়স দশ-এগারোর মধ্যে। স্কুলের নূতন রুটিনে ড্রয়িং ও ড্রিল বলে দুটো বিষয় শিক্ষণীয় হয়েছে। বলরাম দে নামে শিক্ষক এসেছেন—তিনি ড্রয়িং বা ছবি আঁকতে শেখাবেন ও ড্রিল বা শারীরিক ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ করাবেন। আজ মনে হয় অদ্ভুত সংমিশ্রণ: 'এক হাতে তার কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার'। ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতে ভালো লাগতো। ম্যালেরিয়ায় ভুগি, ক্লাসে যেতে পারিনে—ঘরে বসে ছবি আঁকি। সেকালে আজকার মতো রঙের তুলি বাক্স মফস্বলের দোকানে সুলভ হয়নি। তাই শিউলিফুলের ডাঁটি টিপে রঙ বের করে কাগজে লাগাই; চুন ও হলুদ মিশিয়ে একটা রঙ সৃষ্টি করে কাগজে লেপি। সবুজ পাতা ঘষে সবুজ রঙ সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হলো। স্কুলে ড্রয়িং-এর বই ছিল হোইটহল্‌ নামে কোন কোম্পানি বা সাহেবের; বইতে বিলাতী চেয়ার টেবিল আসবাবপত্রের ছবি—

তাই আঁকা ছিল রীতি। এলো হ্যাভেল সাহেবের 'ড্রয়িং বুক'—লম্বা লম্বা খাতার মতো বই—ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা স্তম্ভ, খিলান ইত্যাদি আঁকার রীতি। একদিন করে 'মডেল' দেখে আঁকতে হতো। একদিন ড্রয়িং ক্লাসে দেখি বলরাম-বাবু টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছেন কাঠের কোণ চতুষ্কোণ কুঁজো প্রভৃতি। সে সবের ছবি আঁকতে হবে। মাস্টার মশায় এসে পেনসিল নিয়ে হাতখানা সোজা করে এক চোখ বুজে মডেলের মাপ নিলেন। দুটি বিন্দু দিলেন কাগজে। তারপর মডেলের নানা অংশের মাপ তেমনি করেই এক চোখ বুঁজে। পেনসিল দূরে ধরে মাপজোপ করে মডেলের একটা রূপ গড়ে তোলা হলো। আমার হাত ভালোই ছিল আঁকাজোকায়, তাই ছোটবেলায় ভাবতাম বড় হয়ে ছবি আঁকা শিখবো। দত্ত-বাড়ির তোতলা বলাইদা কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়তেন, মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়িতে, নানারকম ছবি এঁকে আমাদের আমোদ দিতেন। আমার ছেলেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ মানুষ দেখে ছবি আঁকার ক্ষমতা পেয়েছিল—পেশারূপে নেয়নি, নিজের আনন্দে আঁকে, দিয়ে দেয় যার ছবি তাকে।

ক্লাসে যিনি ড্রয়িং মাস্টার, ক্লাসের বাইরে মাঠে তিনিই বেত হাতে ড্রিল মাস্টার। যমের মতো ডরায় ছেলেরা বলরাম দে ড্রিল মাস্টারকে। ক্লাসের শেষ পবে ড্রিল—ক্ষিধেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছে, মালকোঁচা মেরে—তখন শর্টস বা ভারতীয় ইংরেজিতে যাকে আমরা বলে থাকি হাফ-প্যাণ্ট সে সব পরার রেওয়াজ হয়নি। তাই লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে ক্লাসে আসা ছিল নিয়ম—মালকোঁচা মেরে বা কোমরে ধরা বেঁধে কেউ আসতো না। যাই হোক মালকোঁচা মেরে 'লাইন' করে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াই। বলরামবাবু বজ্রকণ্ঠে হাঁকতেন, 'কাউণ্ট' অর্থাৎ গুণ্‌তি করো। আমরা ইংরেজিতে বলে যাই ওয়ান, টু থ্রী, ইত্যাদি। হুকুম হলো অড্‌ নাম্বার অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি ওয়ান স্টেপ ফর-ওয়ার্ড; ইভন নাম্বার অর্থাৎ জোড়সংখ্যা ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড। তারপর হাঁকতেন 'মার্চ' অর্থাৎ এইবার চলো। মোট কথা সমস্ত আদেশ ইংরেজিতেই বলা ছিল রীতি—এখন নাকি সব হুকুম হিন্দীতে পেশ হয়। ড্রিলের সময় কত কী শিখলাম—'অ্যাটেনশন', 'স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ'—আরাম করে দাঁড়াও কথাটা বুঝতে অনেক সময় লাগে। 'রাইট্ টার্ণ', 'লেফট টার্ণ', বললে পা কি ভাবে আগে পিছে করে পাশ ফিরতে হবে তা শেখানো হতো। 'রাইট অ্যাবাউট্ টার্ণ' বলতে বুঝতাম একেবারে বিপরীত দিক ঘুরে দাঁড়াতে হবে। পরে জানি এই কথা কয়টির একটি গূঢ় অর্থ আছে অর্থাৎ পিছু ফিরে

পলায়ন। ড্রিলের সঙ্গে ব্যায়ামও ছিল সংঘবদ্ধ হয়ে, 'মার্চ' বা চলবার রীতি শিখি আমরা। এতকাল পরেও তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আজও যে ঋজু হয়ে হাঁটি বোধহয় সেদিনেরই শিক্ষারই ফল।

নাতি-নাতনীদের দেখি স্কুলে ঢুকেই একরাশ বই তো কিনলোই—তার সঙ্গে কেনে দিস্তা কয় খাতা—'একসারসাইজ বুক', বাঁধানো খাতাও চাই কয়েকখানা। আমাদের পাঠশালায় ও স্কুলের নিচের ক্লাসে বহু বছর ধরে আমরা স্লেট-পেনসিলে অঙ্ক কসতাম। স্লেট ও পেনসিল দুটো শব্দই ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজদের এদেশে আসার পর লেখার এই দুটো সরঞ্জাম আসে। পেন্, নিব্, ফাউনটেন পেন্, স্টাইলো, টেবিল, বেন্চ্ চেয়ার সবই বিদেশ থেকে পেয়েছি। মুসলমানদের আগমনের পর পাই বই, কাগজ, কলম, সিয়াহী, সেজ, কুরশি প্রভৃতি। কেউই কলমের স্থলে সংস্কৃত 'লেখনী' শব্দ কালির বদলে মসী ব্যবহার করিনে।

স্লেট পাতলা পাথরের তৈরী—অবশ্য এই ধরনের পাতলা পাথর প্রকৃতিই তৈরী করেন—যেমন করেন চুনাপাথর, লোহাপাথর, মার্বেলপাথর। গিরিডিতে একটা নদীর নাম ছিল 'স্লেট রিভার'। অবশ্য সেখানে লেখবার স্লেট পাওয়া যেতো না। ঘরের টালির জন্য হয়তো বা ব্যবহৃত হতো। চৌকোনা স্লেট, কাঠ দিয়ে বাঁধা—তৈরী হতো জারমেনীতে, পেনসিলও স্লেট চিরে চিরে তৈরী। পরে বাজারে এলো নরম স্লেট-পেনসিল—স্পষ্ট লেখা ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর নূতন ধরনের স্লেট এলো শুনলাম ভাঙে না। আমাদের স্লেট হাতে থেকে পড়ে গেলেই ফেটে ফেতো। দোকানে কিনতে গেছি—দোকানী স্লেটখানা দেখাতে দেখাতে বললে, 'ফেলে দিলেও ভাঙবে না।' বলেই মেঝের উপর ঝনাত করে দিল ছুঁড়ে। ভাবলাম বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে স্লেটটা ভাঙলো! তুলে দেখি পাথরের স্লেট নয়—এ স্লেট লোহার পাতলা চাদরের উপর রঙ করা! আমাদের সত্যিকারের স্লেট সপ্তাহান্তে কাঠকয়লা দিয়ে সাফ করা ছিল এক আমোদের ব্যাপার। কাঠকয়লা জল দিয়ে ঘষে ঘষে তেল ময়লা উঠাতাম। তারপর লিখলে জলজল করতো লেখাগুলো।

কাগজ মুসলমানীযুগের আমদানী। শব্দটাও আরবী। তার আগে লিখতাম তালপাতা বা তালপত্রে, এখনো বলি 'কাগজ-পত্তর'। বই-এর 'পাতা' যাকে বলে তা তো সত্যিকার 'পাতা' নয়—তালপাতার পুঁথির পাতা। আমাদের সময়ে মেটে-রঙের 'বালির' কাগজ ব্যবহার করতাম। 'বালির কাগজ' বলা হতো তার কারণ বাংলাদেশে বালি গ্রামে সর্বপ্রথম কাগজ তৈরীর কল বসে। পরে সে কল উঠে যায়। কাগজের কল বসে টিটাগড়ে। কিন্তু কাগজের নাম থেকে

গেল 'বালির কাগজ'—যেমন বাড়ির উঠানেও 'বিলাতী বেগুন' আজ্জাই। সাদা ডিমাই ও ফুলস্ক্যাপ কাগজ ব্যবহার ছিল বিলাস।

লেখনী ছিল 'খাগের কলম'। খাগ যে কি তা একালের ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্লেট পেনসিলের মতোই অজ্ঞাত। 'খাগ' শরজাতীয় ঘাস, লালচে রঙের —না-দেখলে বা না-দেখালে বুঝানো কঠিন। এই 'খাগ' কেটে লেখনী বানিয়ে লিখতাম বাংলা'হাতের লেখা'। মধ্যযুগে তালপাতার উপর এই খাগের কলম দিয়ে লেখা হতো। 'খাগের' পর কুইল (Quill) পেন-এ লেখা হয় শুরু। হাঁস ও ময়ূরের পালকের যে শক্ত অংশ পাখীর চামড়ায় আটকে থাকে—সেটাই কুইল। কত যত্ন করে বড়রা কুইল পেন্ কেটে দিতেন বাংলা লেখার জন্য লাল কুইল,— ইংরেজি লেখার জন্য সাদা কুইল। সেজোকাকার টুকিটাকি সংগ্রহের মধ্যে ছিল রজার্সের একটা চাকু বা ছুরি—সেটা দিয়ে অতি যত্নে পেনসিল, কলম কেটে দিতেন।

কুইল পেন্ থেকে স্টীল পেনে একদিন উন্নীত হলাম। স্টীল পেনের মাথায় 'নিব্' লাগিয়ে লিখতে হয়। সেই নিব্ই কত রকমের—সবই বিলাতী। নিবের মধ্যে 'জি' (G) মার্কা ছিল সব থেকে সস্তা—পয়সায় ছটা! 'জে' (J) মার্কা নিব্ কালো কালো—ভোঁতা দেখতে—বাংলা লেখার সময়ে তার ব্যবহার হতো। পরে এলো ওয়েভালির নিব্, বল্ পয়েন্টেড্ নিব্। আরও পরে 'রেড্ ইঙ্ক নিব্'।

পেনসিলকে বলতাম উড্ পেনসিল লেড্ পেন্সিল। মাঝে কোথা থেকে এলো কাগজ জড়ানো পেনসিল। কাগজ ঘুরিয়ে ছিঁড়লেই শিশ বের হয়ে পড়তো। সবই বিদেশী। পেনসিল, কলম, ইরেজার বা 'রবার' তৈরী হতো জারমেনী রাষ্ট্রের ব্যাভেরিয়া রাজ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের যে-নগরে বিচার হয়েছিল, সেই ন্যুরেনবার্গে পেনসিল প্রভৃতির কারখানা ছিল। মোট কথা, ইংরেজি শিক্ষা থেকে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য ভাবনা যেমন পেলাম, তেমনি পেলাম বৃটিশ প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ।

বিদেশী বা বিলাতী জিনিসের প্রতি কী আকর্ষণ ছিল, তার কাহিনী বলি। আমার ছোট বোন বীণার জন্য দিদিমা পাঠিয়ে দিলেন একটা 'ফ্রক'—খুব কারু-কার্য করা, অর্থাৎ সেযুগের রুচিমতো লেস, ফ্রিল দেওয়া অত্যন্ত জবড়-জং। মেয়ের পোশাক যখন শাশুড়ী দিলেন, তখন ছেলেদের পোশাক কিনে দিতে হয় বাবাকে। পত্র লিখলেন, 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল' নামে সাহেবের দোকানে। সে দোকান উঠে গেছে স্বাধীনতা লাভের পরই। সে বাড়িতে অনেক অফিস—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইনফরমেশন' কেন্দ্র, লাইব্রেরী প্রভৃতি। কয়েকদিন পরে এলো বিলপু

ক্যাটালগ—মোটা বই একখানা। অসংখ্য রকম পোশাক, টুপি, ফ্রক, নেকটাই-এর ছবি। ছিটের কাপড়ের নমুনা আঁটা—বেছে নাও পছন্দমত। বাবা পছন্দ করে দুই ভাইয়ের জন্য অর্ডার দিলেন 'সেলর স্যুট' বা নাবিকের পোশাক। কয়েকদিন পরে রেল পার্সেলে এলো একটা টিনের বাক্স। বাক্স কেটে বের হলো নাবিকের পোশাক—প্যাণ্টালুন, গ্যালিস, কোট, মোজা, টুপি। টুপিতে লেখা H.M.S. অর্থাৎ হিজ ম্যাজিস্টেস শিপ্-এর আমরা নাবিক। দুই ভাই হাত ধরাধরি করে বের হই পথে—আমরা স্বতন্ত্র এই বোধ হয়েছিল সেদিন। কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের কালবদলের হাওয়ায় এসব উড়ে গেল—হলাম খালি পা, ধুতি পরলাম মালকোঁচা মেরে—জনতার সঙ্গে বেশভূষায় তফাৎ গেল ঘুচে। স্বাধীনতা লাভের পর আজ দেখছি ইংরেজিয়ানা বিদেশীয়ানা সহস্রগুণে ফিরে এসেছে দেশে। কর্তা মরেছে, কিন্তু কর্তার ভূত সে যে ঘাড়ে চেপে বসেছে। ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ছেলেদের ভর্তি করবার জন্য অভিভাবকদের কী প্রয়াস!

গ্রামের বাড়িতে আছি, আমাদের 'পৈতা' হবে—মনে আছে চৈত্র মাসের ১৯ তারিখ। হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে কাকা এলেন অসুস্থ হয়ে। মাকে বললেন, 'বৌদি, তোমার কাছে মরতে এলাম, আমায় কে দেখবে এ অবস্থায়!' মা বললেন, 'ঠাকুরপো, কি অলুক্ষণে কথা এই বারবেলায় বলছো? কতবার তো অসুখ করেছে, সারিয়ে তুলিনি? চলো উপরে।' আমরা কাকাকে ধরে উপরে নিয়ে যাই। সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটার মেঝেতে বিছানা করে দেওয়া হলো।

কাকা বাবার সহোদর ভাই। বাল্যকাল থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন, তাই স্কুল-কলেজে পড়বার সুযোগসুবিধা পাননি। তবে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। কাকা 'প্রদীপ' নামে মাসিকের গ্রাহক ছিলেন—বাংলাভাষায় সচিত্র ও বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্র এই পত্রিকায় প্রথম বের হয়। তখন আমার বয়স কত হবে, ছয় কি সাত বৎসর—তবুও মনে আছে কাদম্বরীর রাজসভা—শুক-সারীর ছবি, মনে পড়ছে মন্দিরপথে এক নারীমূর্তি।

বাবার মাতুল-বাড়ির কিছু সম্পত্তি ছিল, সেটা তিনি কাকাকে দান করেন। সেইখানে বসে তিনি চাষবাস দেখতেন, মাঝে মাঝে শহরে আসতেন তাঁর এক সাদা-পাটকিলে রঙের ঘোড়ায় চড়ে। কাকা আদর করে আমাদের ঘোড়ায় বসাতেন কিন্তু ঘোড়ার ঘাম।চামড়ার জিনের সঙ্গে মিশে যে উৎকট গন্ধ সৃষ্টি করতো তা সহ্য করতে পারতাম না—একটু বসেই কাকাকে বলতাম নামিয়ে দাও।

গ্রামের খামারবাড়িতে অসুস্থ হলেই কাকা শহরে আসতেন—সেবা করবে

কে মা ছাড়া? একবার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। মহেন্দ্র ডাক্তার দেখছেন। শহরের একমাত্র এম. বি. ডাক্তার। মদ্যপ, খিটখিটে হ্যাংলাপান। চেহারা—তবুও হাতযশ ছিল। কত রকম চিকিৎসা চলছে—আমাদেরই তাঁর মলমূত্র সাফ করতে হয় মাঝে মাঝে। কে পরামর্শ দিল দেহে দোষ ঢুকেছে, শনির কোপ—স্বস্ত্যয়ন করালে ভাল হয়। বাবা এসব বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না, তবে না বিশ্বাস করবার মতো মনোবল ছিল না। কাকার ঘরে শুরু হলো হোম, যাগ-যজ্ঞের তাণ্ডব। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এলেন, সঙ্গে তাঁর চেলারা। পূজা শেষ হলেই শনির দোষ কেটে যাবে। ঘরে যজ্ঞের ধোঁয়ায় সবার দম বন্ধ হয়ে আসছে, এমন সময়ে পুরোহিত নাভি থেকে কি একটা বের করে ঘোষণা করলেন, সব ঠিক হয়ে গেছে, বিষ বের করে দিলাম। বুজরুকি ধরার বুদ্ধির অভাব ছিল আমাদের।

আদিমকালের বিশ্বাস বহন করে চলেছি আমরা কিন্তু পাশ্চাত্ত্য অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা চালাই। প্রাচ্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় শ্রদ্ধা হারিয়েছি। আমরা একুল-ওকুল দুকুল রক্ষা করতে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ডুবে মরছি। না আছে ঈশ্বরে বিশ্বাস—সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা, না আছে বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা। তাই আজও দেখছি ডোম্বিনী তারা-মার কালিতলায় অজাশিশু বলি দিয়ে রুগ্ন সন্তানের কপালে রক্ততিলক দিচ্ছে ভক্তেরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সিংহ, ডাক্তার চৌধুরীর দাওয়াখানায় গিয়ে শিশুর দেহে ইনজেকশন দেওয়াচ্ছে। যদি শিশু সেরে ওঠে মার কৃপায়, যদি মরে যায় পূর্বজন্মের পাপের ফল। এ ধরনের ভাবনা থেকে সে-কালের শিক্ষিতেরা মুক্ত ছিলেন না। প্রশ্ন: একালের শিক্ষিতরাই কি মুক্ত হয়েছেন?

এই রুগ্ন, ব্যাধিজর্জর দেহেও কাকার বিবাহ হলো। হবেই বা না কেন? গুড়ি-পিসিমার বিবাহ হয়নি? বিকলাঙ্গ, বিরল-কেশী অস্পষ্ট-ভাষী, তাঁরও স্বামী জোটে—কালা, স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পবিত্ত এক বংশজ ব্রাহ্মণ। ভঙ্গকুলীন ঘরের বিকলাঙ্গীকে বিবাহ করে সমাজে এক ধাপ উঠলেন তিনি। মনে পড়ছে পিসেমশায় রাইচরণ ভট্টাচার্য আসবেন—গুড়ি-পিসিমার সেই বিকলাঙ্গ দেহেমনে কী উল্লাস। মা তার বিরলকেশ সযত্নে বেঁধে দিতেন, ভালো একটা শাড়ি পরিয়ে দিতেন। আমাদের এখানকার গ্রামে এক বুঙ্গি বা বোবা কালা মেয়ে ছিল, গ্রামের লোকে কোথা থেকে বোবা-কালা এক ছেলে এনে বিবাহ দিয়ে দিল। শুনেছি তাদের ছেলেপুলেরা সবল সুস্থ হয়েছে, বোবা-কালা কেউই হয়নি।

কাকার বিবাহের সম্বন্ধ এলো উলো গ্রাম থেকে। তখন উলো বীরনগর

যাবার রেলপথ নির্মিত হয়নি, নদীপথেই যেতে হয়। আমি কাকার সঙ্গে যাই 'মিত-বর' বা 'কোল-বর' হয়ে। বরের সঙ্গে ছোট কেউ যাওয়া ছিল রীতি। নৌকা করে সবাই চলি। বাবা বরকর্তা। নদীর ঘাট থেকে পালকি চড়ে যাই কাকার সঙ্গে 'সর্বজ্ঞী' পাড়ায়। কনের বাপ নেই। মা ও এক বিধবা দিদি। কাকীমার নাম গোপালদাসী, দিদির নাম রামদাসী। যে বাড়িতে পৌছলাম, তা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। মনে হলো ঘরটা বহুকাল বন্ধ ছিল—কি রকম একটা মিশ্রগন্ধ আরশুলা ও ইঁদুরের। কাকা দোতলায় গেলেন। আমি সঙ্গে যাই। অভ্যর্থনার বিপুল ব্যবস্থা—প্রথমেই চোখে পড়লো রূপোর আলবোলায় তামাক দেওয়া রয়েছে। রাতে কখন বিবাহ হয় মনে নেই। পরদিন নূতন খুড়িমাকে দেখলাম —ছোট মেয়ে, খাড়া নাক, প্রশস্ত একজোড়া চোখ।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিচের তলার সেই দালানঘরের লম্বা চৌকিতে শুলাম, আরও অনেকের সঙ্গে। মনে আছে ছোট একটি মেয়ে, পরনে রঙীন ডুরে, নাকে নোলক, কানে মাকড়ি, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় একটি বেণী, আমার পাশে শুয়ে কত গল্পই করলো। নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে শুয়ে এই প্রথম গল্প করার আবেশ। সে মেয়ে হয়তো কবে মারা গিয়েছে, হয়তো-বা অতি বৃদ্ধা হয়ে কোথাও বেঁচে আছে, কিন্তু আমার মনে সেই সাত বছরের মেয়েটির অস্পষ্ট ছবিটি রয়ে গেছে।

বিবাহের পরদিন সবাই ফিরে এলাম। খুড়িমার সঙ্গে এলেন তাঁর দিদি রামদাসী। রামদাসী যেন গ্রামের সমস্ত যুবতী বিধবার প্রতিবাদ স্বরূপ অগ্নিশিখা। উত্তরভারতে তাঁরা থাকতেন সেইজন্য একবস্ত্রী হয়ে ঘুরে বেড়াতেন না, সেমিজ পরতেন। সরু কালোপাড়ের শাড়ি পরতেন, হাতে ছিল সরু দু'গাছি সোনার রুলি। বাড়িতে কানাঘুষো যা শুনতাম, তার অর্থ তখন বুঝতাম না—এইটুকু শুনতাম বিধবা তার আবার অত সাজ কেন—সেমিজ কামিজ কি ভদ্রঘরের মেয়েরা পরে? ছ্যাঃ!

লিখতে লিখতে ১৯১৭ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা থাকি তখন গিরিডির ফ্যাশানেব্‌ল্ কোয়ার্টার বারগণ্ডায়। ছুটিতে বাড়ি এসেছি, দাদা বিয়ে করে এই বাড়িতে আছেন। বাইরের বারান্দায় আমাদের আড্ডা জমে। দেখা গেল সামনের বাড়িতে কলকাতা থেকে কারা 'চেঞ্জে' এসেছেন। সে বাড়ির বাইরে ইঁদারা—এটাই ও-অঞ্চলের রীতি, বাগানে জল দেবার সুবিধা হয়। প্রায়ই দেখি বাড়ির অর্ধবয়স্কা গৃহিণী একখানি বড়গোছের গামছা পরে এবং উপরাঙ্গে আর একটি গামছা জড়িয়ে কুয়োতলায় স্নান করেন। আমরা লজ্জায়

ঘরে ঢুকি—বাংলায় প্রবাদ আছে 'হেগস্তির লাজ নেই, দেখস্তির লাজ' কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। একদিন দাদা মাকে বললেন, 'মা, তুমি ওদের বাড়ি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলে এসো, এটা ভালো দেখায় না।' মা গেলেন তাঁদের বাড়ি, বললেন সব কথা বুঝিয়ে। কলকাতার গৃহিণী বললেন, 'মা, সেমিজ কামিজ পরতে আমাদের লজ্জা করে। তবে আজকাল মেয়ে-বউরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরে দেখি।' এই ঘটনার পর অর্ধশতাব্দী অন্তে দেখছি লজ্জা সরম প্রভৃতি শব্দ আর সমাজে চলিত নেই।

বিবাহের পর 'অষ্টমঙ্গলা' করতে কাকা গেলেন শ্বশুরবাড়ি—কাকীমা ও রামদাসীও ফিরলেন। সেই গেলেন তো গেলেন, এর পর খুব কম দেখাশোনা হয়। কাকার সঙ্গে কোথায় কাকীমার একটা চাপা বিরোধ ছিল। আজ মনে হয় কাকার স্বাস্থ্য ভাল না থাকাই হয়তো কাকীমার ঔদাসীন্যের কারণ, নারী যা চায়, তা সে পুরোমাত্রায় পেতে চায়, না পেলে তার দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই দেখতাম কাকা ক্বচিৎ শ্বশুরবাড়ি যেতেন, বা কাকীমা তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আমাদের বাড়ি আসতেন। মেজো কাকীমার সঙ্গে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, নিজের কাকীমাকে সেভাবে কোনোদিন পাইনি।

কাকা এবার দেশের বাড়িতে এলেন সত্যই বৌদির কাছে মরবার জন্য। বাড়িতে আমরা দুই ভাই, বড়দের মধ্যে মা ও দুটি। পাশের বাড়িতে কাকাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই, তাই কেউ এ বাড়ি মাড়াননি। মৃত্যু যে কী ভীষণ, তা এই প্রথম দেখতে হলো কাকার কাছে বসে বসে। কী সংগ্রাম! জড়দেহের সঙ্গে জড়দেহ উদ্ভূত শক্তির সংগ্রাম। কী প্রলাপ! কী উন্মত্ততা! ওঠবার কী ব্যর্থ প্রয়াস! নিত্য সেবক দাদা ও আমি—মলমূত্রাদি পরিষ্কারে আছেন মা ও দুটি। শ্বাস উঠলো, দেহের উন্মত্ত আস্ফালন স্তিমিত হয়ে এলো, সংগ্রাম চললো প্রাণ ও অপান বায়ুর। শেষ মুহূর্তে গঙ্গাজল দিলাম। গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। লোকবিশ্বাসমতে ঘরের থেকে বাইরের বারান্দায় এনে শোয়ালাম আমরা চারজনে ধরাধরি করে। সন্ধ্যার মুখে মৃত্যু হলো, সব সংগ্রাম হলো স্তব্ধ। সারারাত দুটি মড়া আগলে বারান্দায় বসে থাকে—মৃতের বিছানা জীবিতকে ছুঁয়ে থাকতে হয়। কী সব দোষ হয় আলগা পড়ে থাকলে। মৃতের সৎকারের প্রশ্ন এখন। জনশূন্য গ্রাম স্বজাতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শব ব্রাহ্মণ দিয়ে দাহ করাই রীতি। কিন্তু গ্রামে ব্রাহ্মণ কোথায়? পাঁচটা গ্রামে কে খবর পাঠাবে? বাবাকে পর্যন্ত খবর পাঠানো হয়নি। সৎকারের জন্য এলো চুন্নুরীপাড়ার লোকেরা—পদা, পঞ্চা, অটল প্রভৃতি অজাত,

অস্পৃশ্যের দল। খিড়কির পুকুরে দক্ষিণে কাঁঠাল গাছতলায় কাকার মুখাগ্নি হলো। দাদা জ্যেষ্ঠ ছেলে বাড়ির, তাঁরই অগ্রাধিকার শাস্ত্রমতে। বারান্দা থেকে দেখলাম দাদা শবাধার ঘুরে পিছন ফিরে খড়ের নুড়িতে আগুন ধরিয়ে মৃতকে সেই জ্বলন্ত আগুন ছোঁয়াল। তারপর হরিধ্বনি করে চুনারীরা বামুনের শব নিয়ে চলে গেল গঙ্গার ঘাটে।

বাবা আদালতের বার লাইব্রেরীতে কাকার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চলে আসেন গ্রামের বাড়িতে। মনে পড়ছে—বাবা নিচের বারান্দায় একটা চৌকিতে বসে কাঁদছেন, মা তাঁর হাঁটু ধরে ফুপিয়ে কাঁদছেন, বলছেন—'কতবার অসুখ নিয়ে এসেছিল, সারিয়ে তুলেছিলাম, এবার পারলাম না।'

দশদিনে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ। উলায় খবর গেল, কাকীমা ও রামদাদী এলেন। খুব যে কান্নাকাটি হলো তা তো মনে পড়ছে না। গ্রামের মেয়েরা আসা-যাওয়া করে, কী নিয়ে কানাকানি করে, কাকীমার ছেলেপুলে হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয়, শুনলাম 'ফল হয়েছে'—ভাবলাম ছেলেপুলে হবে বুঝি। পরে তার মানে জানি—রজঃস্বলা হলে আর সন্তান-সম্ভাবনা হয় না।

শ্রাদ্ধে গ্রামে চুনুরী কুমোরদের খাওয়ানো হয়—আর খাওয়ানো হয় এক অগ্রদানী ব্রাহ্মণকে। শ্রাদ্ধে দানের নিয়ম আছে সব ধর্মেই। হিন্দুসমাজে উচ্চ-বর্ণের ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধে প্রেতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দ্রব্য, প্রায়শ্চিত্তের দান, তিলদান, স্বর্ণদান, গোদান প্রভৃতি গ্রহণ করেন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হয়ে দান গ্রহণের অপরাধে তাঁরা সমাজে পতিত, আবার তাঁদের না হলেও শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এলেন। দেখলাম তিনি প্রায় অস্পৃশ্য—বারান্দাতেও নয়, বারান্দার নিচে উঠোনের একপাশে তাঁকে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ানো হলো। শ্রাদ্ধের ষোড়শ দেখেছি ধনীগৃহে পালঙ্ক দামী বিছানা বালিশ পিতলের তৈজসপত্র কত কী! কিন্তু দান ব্রাহ্মণের ঘরে রাখবার স্থান কোথায়? তাই তিনি সেগুলি বাজারে বিক্রী করে দেন এবং হয়তো সেগুলি আবার নূতন সাজে অন্য শ্রাদ্ধোৎসবে দানসামগ্রীভুক্ত হয়।

সত্যমিথ্যা জানি নে, নেপালের রাজার পিতার মৃত্যু হলে যে-ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে দেশাচার অনুসারে রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়। কারণ সে ব্রাহ্মণ হয়ে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেছে। তবে রাজকোষ থেকে যে ধনদৌলত, তৈজসপত্র সে পায় তাতে তার কেন, তার তিন পুরুষের বংশ-ধরদের পায়ের উপর পা তুলে চলে যাবে।

দেশের বাড়িতে বীণা মারা গেছে, তারপর গেলেন কাকা। ম্যালেরিয়ায়

ভুগে ভুগে সবাই আধমরা। একাদশীতে শরীর ম্যাজম্যাজ্, অমাবস্যা পূর্ণিমায় কম্প দিয়ে জ্বর। দু-তিনখানা লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে থাকা। জ্বর কমলেই যথারীতি পথ্য, অপথ্য, কুপথ্য ভোজন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জীবনীশক্তি হ্রাস পাচ্ছে তা বুঝতে পারছি সবাই।

একদিন সকালে উঠে দেখি গোয়ালঘরের ছ্যাঁচা-বেড়া ভেঙে বাঘে আমাদের গরুর বড় বাছুটাকে নিয়ে গেছে, তার আধ-খাওয়া দেহটা পড়ে আছে পুকুর-পাড়ে। বাঘের ডাক প্রায়ই শুনি। 'ফেউ'-এর ডাক শুনলেই কান পেতে থামতাম দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে জাঁতা-পেষার শব্দ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্। দোতলায় সবাই শুই দরজা-জানালা বন্ধ করে। গ্রামের এক চৌকিদার কবে কোন্ কালে কনৌজ কিংবা বালিয়াবাসী ছিল। এখন সে ঘোর বাঙালী—বঙ্গালিনী নিয়ে সংসার পেতেছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার উদরটি স্ফীত তরমুজের মতো। একদিন মার কাছে এসে বলে, 'মা, রাতের বেলায় আমি বাড়ি পাহারা দেবো, বাবু বলেছেন।' মা বললেন, 'বেশ, তুমি পাহারা দেবে তো খুব ভাল কথা।' চৌকিদার বললে, 'মাইজী, তবে ছাদের উপরে উঠে হাঁক দেবো।' তাই ঠিক হলো। বীরপুরুষ তেতলার ছাদে উঠে তার চৌকিদারি আওয়াজ দিত। জনমানববিরল পল্লীর কারো নিদ্রাভঙ্গ হতো না, কেবল তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বন থেকে বনান্তরে বিলীন হয়ে যেতো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে তাঁর দিদিমার 'গঙ্গাযাত্রা'র বর্ণনা পড়েছি। একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে নদীতীরে গেছি, দেখি একটি নৌকা তীর-বেগে চলেছে, হরিসংকীর্তন হচ্ছে নৌকার উপর। ছেলেরা বললে, ওই কার গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে। ভাঁটার টানে নৌকা তীরবেগে চলেছে। কীর্তনের গান ও বাজনা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এলো। আর একদিন দেখি থার্ড টিচার আশু চাটুজ্জের পিতার গঙ্গাযাত্রা। তাঁদের বাড়িতে দেখতাম বৃদ্ধকে, দশাশই চেহারা। তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসাতে গঙ্গাযাত্রা করা হয়েছে। খাটের উপর শুইয়ে হরিসংকীর্তন করতে করতে লোকে চলেছে, খই ছড়ানো হচ্ছে পথে পথে, বারন্দা থেকে দেখছি। মনে হলো বৃদ্ধের ঠোঁট নড়ছে, চোখ খোলা, দেহার্ধ খোলা, চন্দনচর্চিত, শুভ্র উপবীত যথাযথভাবে অঙ্গে রয়েছে। জানি না মৃত্যুপথযাত্রীর বাক্‌শক্তিরোধ হয়ে গেছে, তবুও কি কিছু বলবার ছিল? চোখ খোলা—পৃথিবীকে কি শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল? কে জানে!

নদীর ঘাটে কয়েকটা খোলা (ছইহীন) পান্‌সি থাকতো, সেগুলো 'মড়ার

নৌকা' অর্থাৎ এই নৌকায় করে মৃতদেহ সোমড়ার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হতো। চূর্ণী পড়েছে গঙ্গায়, এখানে পবিত্র মহাশ্মশান, উদ্ধারণপুর ঘাটের মতো। ঘাটে প্রায়ই দেখতাম লোকে 'হরি, হরি' বলে কাকে তুলছে। সেদিন ঘাটে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের ছাত্র অশ্বিনী একটা নৌকোয় শুয়ে। ক্লাসের মধ্যে শান্ত ভদ্র ফুটফুটে ছেলে। হাসির ফোয়ারা ছুটতো যখন সবার মুখে—অশ্বিনীর মুখে স্মিতহাস্য দেখা দিত। শুনেছিলাম তার অসুখ, তাই ক্লাসে আসছে না। তারপর শুনি সে মারা গেছে; তাই ছুটেছিলাম নদীঘাটে তাকে শেষবারের মতো দেখতে। কতকালের কথা। তবু আজও অশ্বিনীর সেই ফুটফুটে সুন্দর মুখটি চোখে ভাসছে।

প্রায়ই দেখতাম 'মড়া' নিয়ে যেতে। বাঁশের সঙ্গে মড়া ও তার পরে মাদুর জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুজন লোক নিয়ে যেতো, অবশ্য সঙ্গে আরও লোক থাকতো—কারও হাতে খড়ের নুড়ো মুখাগ্নি করার জন্য, কারও হাতে কলসী চিতায় জল ঢেলে অন্তর্জলী করবার জন্য। বাংলায় সেইজন্যে প্রবাদ বাক্যে হয়েছে 'বুকে বাঁশ দেবো', 'মুখে আগুন আর কি'। কাটোয়ার পথে মোটর করে যেতে যেতে উদ্ধারণপুরের শ্মশানযাত্রীদের দেখেছি আমবাগানের মধ্যে অপেক্ষা করতে, সারি সারি মাদুর-জড়ানো মড়া—স্বর্গে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

নদী বাংলাদেশের মহাপথ ছিল একদিন। এই পথ দিয়ে মামাবাড়ি গেছি নৌকাযোগে—সে কথা পরে বলবো। আমাদের ঘাটে কয়েকটা নৌকায় দেখতাম বড় বড় মাটির জালা দড়ি দিয়ে বাঁধা, ভরা থাকে গঙ্গাজলে। সোমড়ার ঘাট থেকে গঙ্গার পবিত্র জল আনা আছে। পশ্চিমা ভারীরা বাঁকে করে কলসী ভরে গঙ্গাজল বাড়ি বাড়ি বিক্রী করে আসে। আমাদের বাড়িতে একটা কলসীতে গঙ্গাজল রাখা থাকতো, ছোট একটা তামার ঘটিতে নিত্য ব্যবহারের জন্য গঙ্গাজল থাকতো কুলুঙ্গীতে। সেই তামার ঘটি থেকে একটু জল কোষায় ঢেলে বাবা দেখতাম কুষি করে সামান্য জল তুলে হাতের অঞ্জলিতে রেখে একবার মাদুলি ও তাগাতে ছোঁয়াচ্ছেন, একবার মাথায় ছিটুচ্ছেন ও যুগপৎ কী সব মন্ত্র বিড় বিড় করে করে বলছেন। দেখতাম মাত্র। ওসবের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করতাম না।

আমাদের ধারণা ছিল গঙ্গাজল সব পাপনাশক। পাঁজিতে মকরবাহিনী গঙ্গার ছবি দেখে ভাবতাম সত্যই কি জলে ওরকম হাঙরের পিঠে দেবী বসে থাকেন? ঝুটি মাঝে মাঝে বিশেষ তিথি-পার্বণের দিন গঙ্গাস্নানে যেতো। আমাদের বাড়ির বা কাকাদের বাড়ির কাউকে কখনো যেতে দেখিনি। একবার জলড়ার ঘাটে

স্নানে যাই। গঙ্গার জলের রঙ, ঘাটের হাঁটু-ভর কাদা, লোকের ভিড় দেখে জলে নামবার ইচ্ছাটা উবে গেল।

গঙ্গাজলে সব পাপ দূর হয়—সব চেয়ে বড় পাপ অজাত অস্পৃশ্যকে ছোঁয়া। নিধু নিকীরি রোজই আসে, দরজায় দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করে। ঘরে ঢুকবার সময়ে যদি তাকে ছুঁয়ে ফেলি, তবেই তো সর্বনাশ। মা তখনি কুলুঙ্গি থেকে তামার ঘটি থেকে খড়কে করে গঙ্গাজল তুলে গায়ে ছিটিয়ে তিনবার 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলতেন। সব শুদ্ধ হয়ে গেল। একটা রক্তমাংসের মানুষের সামনে সে অস্পৃশ্য, তাকে ছুঁলে অপবিত্র হতে হয়—এটা স্পষ্ট করে জানান দিতে আমাদের মত হিন্দুদের মনে ভদ্রতার রুচিতে বাধতো না। এই সব যে নিষ্ঠার সঙ্গে মানে, সেই আদর্শ হিন্দু।

একদিনের ঘটনা। রবিবার। ছুটি। দাদা ও আমি একটা কদ্‌বেল পেয়ে 'ফুটবল' খেলছি বাইরের উঠোনে। বাড়ির পাশে অগভীর একটা বাঁধানো ড্রেন। সেই অপবিত্র নর্দমায় আমাদের কদ্‌বেল গেল পড়ে। নর্দমায় পড়েছে; কী করে ছুঁই! ড্রেনে হাত দিলেই তো মা বলবেন—'স্নান কর'। নয় বলবেন মাথায় গঙ্গাজল ছিটাও। বারান্দায় বসেছিলেন বাড়ির পাচকঠাকুর, বাঁকুড়ার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁকেই শুধোই, বলটা ড্রেন থেকে তুললে কি পাপ হবে? ঠাকুর-মশায় তাঁর ব্রাহ্মণ্যগর্বে বললেন—'মা ফলেষু কদাচন'। ওটা তো কদ্‌বেল—ফল তো। শাস্ত্রে বলে, 'ফলে দোষ নেই'। এমন শাস্ত্রবাক্য শুনে দ্বিধাহীনচিত্তে ড্রেন থেকে কদ্‌বেল তুলে ফুটবল খেলা আরম্ভ করলাম। পরে মা যখন সব শুনলেন, বললেন, 'যাও, কাপড় ছাড়—আর গঙ্গাজল মাথায় ছিটাও—নইলে ঘরে ঢুকতে পাবে না।'

১৯০১ সালে ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড রাজা হন; কিন্তু রাজ-অভিষেক হয় ১৯০২ সালের আগস্ট মাসে। তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়নি—তাই দেশমধ্যে রাজভক্তি যথেষ্ট ছিল। আমরাও কলকাতায় গেলাম সেখানকার সমারোহ দেখবার জন্য।

আমার বয়স তখন বছর দশ, দাদার সাড়ে বারো। কলকাতায় উঠেছি হরগোপাল সরকারের বাসায়। এঁদের কথা পূর্বে বলেছি। বাবা বাল্যকাল থেকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু যৌবনে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হননি। তবে এই পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধটা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল। বাড়িটা ছিল হরিতকী বাগান লেনে—বলা বাহুল্য হরিতকী বাগান কেন, একটা সবুজ ঘাসের ডগাও দেখা যেতো না। একটা সর্ষের তেলের কল ছিল। এ বাড়ির

কনিষ্ঠ ছেলে দুটি দাদা ও আমার সমবয়সী। তারা দশটি ভাইবোন, আজ কেউ নেই তাদের, আমরাও পাঁচ ভাইবোন আজ আমি ছাড়া সবাই চলে গেছে পরপারে। এ বাড়িতে প্রথম ব্রহ্মোপাসনা দেখি। ঈশ্বরের নাম-গান শান্তভাবে বসে করতে হয় ও শুনতে হয়—এ বোধ ছিল না। বাড়িতে দেখেছি সত্য-নারায়ণের পূজা, লক্ষ্মী পূজা। কীর্তনের আসর দেখেছি খোল-করতালের শব্দ-মুখর সংগীত। কিন্তু শান্ত হয়ে বসে ভগবানের নাম করতে ও শুনতে হয় এই প্রথম দেখলাম এই বাড়িতে। বোধ হয় ছেলেমেয়েদের বা কারও জন্মদিন হবে; হরগোপালবাবুর স্ত্রী, যাঁকে আমরা 'ঠাকমা' বলতাম—তিনি একটা বই থেকে কিছু কিছু পড়লেন। আজ মনে হয় বোধ হয় কেশবচন্দ্র সেনের 'সেবকের নিবেদন' থেকে পড়েছিলেন। এই পরিবার নববিধান সমাজভুক্ত ছিলেন। উপাসনা এই প্রথম দেখলেও ব্রহ্মসঙ্গীত ইতিপূর্বে শুনি আমাদের শহরের বাসায়। আমাদের গ্রামের মিত্র পরিবারের একটি শাখা শুনতাম 'ব্রাহ্ম', চলতি ভাষায় 'বেম্মো' হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্ম কী জীব জানতাম না। তাঁরা একবার আসেন দেশে। আমাদের শহরের বাসায় আসেন দেখা করতে। বয়স্কা অবিবাহিতা শেমিজ-কামিজ পরা, পায়ে জুতো দুই বোন, সঙ্গে তাদের মা। মায়ের অনুরোধে মেয়ে দুইটি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েছিল। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে এই বোধ হয় প্রথম পরিচয়। বাবা রোজ ভোরে উঠে তাঁর মোটা গলায় গাইতেন ভজন—

জয় ভব-কারণ, জগত জীবন, জগদীশ জগতারণ হে।
অরুণ উদিল ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।

গানটি কার লেখা জানতাম না—বয়স হলে ব্রহ্মসঙ্গীত দেখে সমস্ত গানটা পেলাম।

কলকাতার হরিতকী বাগানের বাসায় একটা নিয়মশৃঙ্খলা দেখতাম: বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মধ্যম চাকুরি করতেন, দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে—আর সবাই বাসায় থাকেন। সবাই ছাত্র-ছাত্রী। সেজো ছেলে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়েন; তাঁর সঙ্গে যাই একদিন তাঁর সহপাঠী ডাক্তারের বাড়ি। সুশীল নাগ জ্যেষ্ঠপুত্রের শ্যালক। তাদের বাসা তখন ছিল সার্কুলার রোডে, যার নাম আজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে ছিল ময়লা ফেলার ট্রেনের লাইন। সেখানে একটা স্টেশন, অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মে কলকাতার এক অংশের আবর্জনা এসে পৌঁছত। এক-ঘোড়ায় টানা আবর্জনা বোঝাই গাড়ি উঠতো প্ল্যাটফর্মের একদিকে ঢালু পথ দিয়ে। খোলা আবর্জনা নেবার 'মাল-গাড়ি'—মেথরে-ধাঙড়ে কোদাল ও রেক দিয়ে টেনে টেনে ফেলছে মালগাড়ির ভিতর। প্ল্যাটফর্মেও আবর্জনা কিছু কম পড়ছে না। একটু পরে হুইসিল দিচ্ছে

দিতে একটা ইঞ্জিন এসে মালগাড়িগুলোকে বেঁধে নিয়ে চললো। শুনলাম ধাপার মাঠে যাচ্ছে। প্ল্যাটফর্মের উপর কাক-চিল উড়ছে, পরিত্যক্ত আবর্জনা থেকে নিজ নিজ সুখাদ্যের সন্ধানে ব্যস্ত। মরা ইঁদুর, পচা ব্যাঙ যার কপালে যা জোটে। রাস্তার কুকুরের মধ্যে মারামারি কামড়া-কামড়ি চলছে এক এক টুকরো হাড় নিয়ে। বারান্দা থেকে দেখছি মহানগরীর আবর্জনা নিকাশের ব্যবস্থা—ভেসে আসছে একটা পচা দুর্গন্ধ। বোধ হয় স্থানীয় লোকদের সয়ে গেছে—নইলে কেমন করে থাকে তারা।

ঘরের মধ্যে ধোতা কাকা গল্প করছেন সহপাঠী সুশীল নাগের সঙ্গে; সেখানে দেখি টাঙানো আছে একটা নরকঙ্কাল। আজ ভাবি কার সে কঙ্কাল! কোন হতভাগ্য জীবনভর কষ্ট পেয়ে মরেও কোনো ধর্মের সদ্‌গতি পেলো না। শুনেছি হাসপাতালে কেউ মরলে, তার দাবীদার না থাকলে, মুরদোফরাসরা সেই শবের সদ্‌গতি করতো কঙ্কাল বের করে নিয়ে। আজকাল সে-রকম মুর্দা পাওয়া কঠিন। মুসলমানের শব তো বেওয়ারিশ হতেই পারে না। নগরে নগরে মুসলমানদের সমিতি হয়েছে, তারা খবর পেলেই কবর দেবার ব্যবস্থা করে।

১৯৩১ সালে শীতকালে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পক্ষকাল থাকি; তখন অনেক গল্প শুনি। একবার ভুল করে এক মুসলমানকে হিন্দু ভেবে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সংবাদটা কলকাতায় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজ খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিকিৎসক কেদার দাস তৎকালীন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে ভালো করে জানতেন বলে কোনো রকমে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

তবে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে খুব দোষ দিতে পারেনি। একবার কলকাতা মেডিকেল কলেজে রোগী হয়ে আছি সাধারণ ওয়ার্ডে। যশোহর থেকে আগত রাখাল মণ্ডল নামে এক রোগী মারা পড়লে তাকে হিন্দু ভেবে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছি সব। ডাক্তারকে ডেকে বললাম, লোকটি মুসলমান। তিনি বললেন, সে কী করে হবে! টিকিটে নাম রয়েছে রাখাল মণ্ডল। আমি বললাম, আপনার অপিসে খোঁজ করুন। আমি শুনেছি লোকটি 'আল্লা আল্লা' করছিল মরবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। যশোর নদীয়া প্রভৃতি জেলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা কবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পুরাতন নাম ও পদবী ব্যবহার করতো। আমাদের দেশের বাড়ি যে নির্মাণ করেছিল, তার নাম ছিল রাখাল বিশ্বাস!

কঙ্কাল দেখা থেকে কত কথাই মনের উপর দিয়ে চলে গেল। আজও মনে

হয় হিন্দুর মড়া কি কেউ উপযাচক হয়ে সৎকার করে? মুসলমানের দেশে মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদের জন্ম ছাত্ররা মুসলমানের মুর্দা কি পায়?

কলকাতায় এসেছি, সেকথা বলেই তো প্রসঙ্গ শুরু করছিলাম। সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে গড়ের মাঠে বাজি পোড়ানো হবে। কালীপুজোর সময়ে রঙীন দেশলাই জ্বালানো, মশাল, ছুঁচোবাজি, পটকা—প্রভৃতি নিয়ে খেলা করেছি। কিন্তু এবার নাকি বিরাট আয়োজন হয়েছে। ঠিক হলো সন্ধ্যার মুখে সবাই যাবেন। ভাড়া-খাটা ছ্যাকরা গাড়ি চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকতে দেবে না—তাই ধোতা কাকা কোথা থেকে 'প্রাইভেট' ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করলেন—গোপনে ভাড়া দিতে হবে ছেচল্লিশ টাকা। আজও গোপনে ভাড়া খাটে বড়লোকের মোটর গাড়ি। স্টেশনে নেমে দেখেছি দামী দামী গাড়ি—ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি স্টাণ্ডের বাইরে। পাশ দিয়ে যেতেই শুনি—'প্রাইভেট ট্যাক্সি চাই!' পাঞ্জাবী ড্রাইভাররা জানতে বা বুঝতে পারলে অনর্থ সৃষ্টি করবে, তাই ফিসফিসিয়ে শুধোয়, 'প্রাইভেট ট্যাক্সি চাই!' বাজি পোড়ানো দেখবার যাত্রীরা প্রাইভেট ঘোড়ারগাড়ি করে তো গেলেন। আমার শরীরটা সকাল থেকে খারাপ, যেতে পেলাম না—কিন্তু অত বড় বাড়িতে একা থাকবো কি করে। দাদা বললেন তিনি থাকবেন। সেটা যে কত বড় ত্যাগ তা আজ বুঝতে পারি।

ফিরে আসবার পর শুনি আরোহীদের দুর্গতি। পথে সৌধে হোটেলে আলোকসজ্জা তো দেখলেন। কিন্তু বাজি পোড়ানো শুরু হলে আগুনের ঝলকানি দেখে ও বোমা ফাটার শব্দ শুনে একটা গাড়ির ঘোড়া গেল ক্ষেপে। ভাবলে বোধ হয় আগুনে পোড়াবে। তাই গাড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্ম চেষ্টা শুরু, চিঁহি চিঁহি শব্দ ও লাথি মারা ছাড়া—আর কী ভাবে মনের ভয় প্রকাশ করবে বেচারা! গাড়ি জখম হলো। তখন একটা গাড়ির মধ্যে মেয়েরা কোনো রকমে উঠলেন, পুরুষরা হাঁটলেন। এই কাহিনী রসিয়ে গল্প করেন ধোতা কাকা—তাঁর অসামান্য ক্ষমতা ছিল হাসাবার।

আমাদের এ অঞ্চলে হিন্দুরা মুসলমানদের কাছে 'বাঙালী' বলে পরিচিত, আর হিন্দুরা মুসলমানদের বলে 'ভাইসাহেব'। অর্থাৎ দ্বিজাতিক তত্ত্ব—বাঙালীরা হিন্দু, মুসলমানরা মুসলমান—জাতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব পৃথক করে রেখেছে একই দেশের অধিবাসীদের।

আমার ছোটবেলা যে-অঞ্চলে কাটে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে 'নিকারি' নামে একটি জাত ছিল। এরা এককালে 'মাল'দের মতই মুসলমানদের কাছেও

'অজাত' ছিল। মুসলমানের মেয়েরা পর্দানশীন আর নিকীরিদের মেয়েরা হাট-বাজার করে। এক নিকীরি বুড়ী, আমাদের হাটবাজার এনে দিত। আজিজ মিঞা আমায় বললে, মাস্টারমশায়, নিকীরিরা ছোট জাত, দেখেন না হাট-বাজার যায়। বুঝলাম সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের ইসলাম সম্বন্ধে যেরূপ গভীর জ্ঞান—সাধারণ হিন্দুদেরও শাস্ত্র সম্বন্ধেও জ্ঞান তদ্রূপ।

আমাদের গোয়ালাপাড়ার পিছনে নিকীরিপাড়া। নিধু নিকীরির বাড়ি সেখানে; ছোট বাজারে মাছ বিক্রী করে সংসার চালাতো। বাড়িতে ছিল এক ভাইপো। নিধু বিধবা—নিকে করেনি আর। বাঙালী মেয়েদের মতই এক-বস্ত্রে ঘুরে বেড়ায়, নদীতে জেলেরা মাছ ধরে আনলে কিনে নেয়—নিত্য বাজারে গিয়ে বসে মাছের চুপড়ি নিয়ে। বিকালে বা সন্ধ্যার মুখে আমাদের বাড়ি আসে রোজই। আমি তখন বাড়িতে খোকা; তাই আমার মা হলেন 'খোকার মা'। এই মিষ্টি নাম ধরে ডাকা আজ শুনতে পাইনে। নিধু নিকীরি মুসলমান—ঘরে ঢুকতে পায় না। আমরা হিন্দু, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—আমাদের ঘরে সে কি ঢুকতে পারে? কিন্তু এই মুসলমান নিকীরির মেয়ে ও সদগোপের মেয়ে দুটি ছিল সংসারের সব রকম সুখদুঃখের সহায়। নিকীরি, মাল, জোলা এরা এককালে ছিল হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য। কবে কোথা থেকে কোন্ সুফী সন্ত এসে এদের কানে হজরত মহম্মদের সাম্যের বাণী শোনালো—যারা ছিল অচ্ছুৎ, তারা আশ্রয় পেলো ইসলামের কোলে। আমাদের গ্রামের কাছে যোগীন্দর মাল বলেছিল, "বাবু, আমরা ছোটলোক; কেউ আমাদের দেখে না। ঐ মৌলবী সাহেবই সুখেদুঃখে বুকে টেনে নেন।" মৌলবী জমিরুল হক গরীব, সামান্য তামাকের দোকান তার। সে দোকানও উঠে যায় বিড়ি সিগারেটের চল্ বাড়লে। মুষ্টিমেয় মুসলমানের খয়রাতিতে মসজিদের কাজ চলে। কায়ক্লেশে দিন গুজরান করেও তিনি ভোলেন নি যে তিনি খোদাতলার খিদমদগার। প্রতিদিন প্রাতে লম্বা আচকান গায়ে দিয়ে, মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে কাঁধে চাদর ফেলে লাঠি হাতে ঘুরতে বের হতেন —এই মালপাড়ায় এসে প্রত্যেকের খোঁজখবর নিতেন—পয়সাকড়ি দিয়ে সাহায্য করবার শক্তি তাঁর ছিল না—তবু যেতেন সবার ঘরে। এতেই লোকে কৃতজ্ঞ হয়। অথচ মালদের সুন্নত্ হয় না বলে তাদের মুর্দা মুসলমানী কবর-খানায় স্থান পায় না। তবুও বলতেই হবে ইসলাম অজাতকে জাতে তুলে নিয়েছে, জাত মেরে স্বজাতি করেছে। আজ মালরা নিজেদের মুসলমান বলে গর্ব করছে —হীনমন্যতা তাদের আর নেই।

নিধু নিকীরি মুসলমান তাই ঘরে ঢুকতো না; মার সঙ্গে গল্প করতো দরজার

ফাঁকে দাঁড়িয়ে, ঘরে ঢোকবার সময়ে আমরাও না ছুঁয়ে আসতাম—সেও সসংকোচে পথ করে দিত। দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেললে—ঘরে ঢোকামাত্র মা গঙ্গাজল থড়কে করে ছিটিয়ে দিতেন—মুসলমানীর স্পর্শদোষ দূর হয়ে যেতো, নিধুও এসব মেনে নিতো খুব স্বাভাবিক ভাবেই—কারণ তখনও তাদের মন জাগেনি।

এক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। বাবার জ্বর—ভয়ানক বমি করছেন—মা বোধ হয় স্নানের ঘরে—কাছে কেউ নেই—আমরা সামলাতে পারছিনে। নিধু দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ভুলে গেল সে অস্পৃশ্য,—বিছানায় উঠে এসে বাবার মাথা চেপে ধরে বমির বেগ শমিত করলে। মা ফিরে এসে দৃশ্য দেখে সাময়িক ভাবে ভুলে গেলেন নিধু নিকীরি মুসলমান।

নিধুর দূরসম্পর্কীয় দুই ভাইপো ছিল; যমজ তারা—নাম লব ও কুশ। তারা বাসন-ব্যবসায়ী। একটা বেতো ঘোড়ার পিঠে দুদিকে দুটো বস্তা ভরা কাঁসা-পিতলের বাসন চাপিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতো তারা। পুরনো কাঁসা পিতল তামার ফুটো ভাঙা বাসনপত্রের বিনিময়ে নতুন মাল দিত। আমাদের চোখ পড়ে থাকতো লবকুশের বেতো ঘোড়াটার দিকে। বেচারা কত মোটই বইতো—নড়েচড়ে ঘাস খেতে গেলেই পিঠের বোঝায় বাজনা বেজে উঠতো।

আমাদের ছোটবেলায় মুসলমান সমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠেনি,—হিন্দুদের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য ছিল সামান্যই। তখন মুসলমানরা লুঙ্গি পরতো না। মাথায় 'ফেজ' টুপি তখনও ওঠেনি—উৎসবাদির দিন মাথায় সাদা গোল টুপি পরতো। আমাদের গ্রামের কাছে কাজিপাড়ার কাজি-সাহেবরা টুপি পরেই আসতেন শহরে আসবার সময়ে। বোধ হয় মোসলেম লীগ গঠিত হবার পর থেকে শহরে-গ্রামে মুসলমানত্বের প্রতীক 'ফেজ' টুপির চল দেখা দেয়। গত শতাব্দীর মাঝে থেকে এই টিকিওয়ালা টুপির চল হয় ভূমধ্যসাগরের তীরে, আফ্রিকায় ও য়ুরোপের কয়েকটা রাজ্যে—যেমন তুর্কী গ্রীস ইতালিতে—এই বেগুনী রঙের ফেজ টুপির চল হয় এক বিজ্ঞানীর ফতোয়া থেকে। কে নাকি আবিষ্কার করে ঘোষণা করেন, টুপির রঙ যদি 'বেগুনী' হয় তবে সূর্যের তাপ কম লাগে; সেই থেকে নাকি এই টুপির ঐ রঙ হয়। এ সবই শোনা কথা।

মহরম ছিল মুসলমানদের জাতীয় উৎসব। মজার কথা সুন্নী মুসলমানদের পক্ষে এভাবে মহরম পালন করা 'গোনা' বা পাপ। এটা শিয়াদের দুঃখের উৎসব। কিন্তু কালে ধর্মে বিকৃতি এসে যায়। মহরমের তাজিয়া বা গোঁয়ারা নিয়ে মিছিলে সবাই যোগ দেয়—কেবল দেয় না যোগ নামাজী সুন্নীরা। আমাদের বাড়ির সামনে প্রতি বৎসর তাজিয়া নিয়ে মুসলমানরা আসতো।

জোয়ানরা লাঠি, তরবারি নিয়ে খেলা দেখায়—লাঠির দুই মাথায় মশালের মতো আগুন জ্বালিয়ে ঘোরায়। সে খেলায় হিন্দুরাও যোগ দেয়। খেলাশেষে বাজনদাররা বকশিশ পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ঢোল কাঁসি বাজাতে বাজাতে যায়। জোয়ানের দল 'গোঁয়ারা' কাঁধে তুলে চলে যায়—কল্পিত কারবালার দিকে।

হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ, দুর্গা, কালী—এদের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো নদীতে। সেকালে ট্রাক ছিল না, লোকেই কাঁধে করে নদীতে নিয়ে যেতো। সন্ধ্যার পর গেছি নদীতীরে 'ভাসান' দেখবার জন্য। দুখানা নৌকো জোড়া দিয়ে বাঁধা হয়েছে—তার উপর প্রতিমা তোলা হচ্ছে—লোকে হাঁটুভর কাদায় নেমে ঠেলেঠুলে প্রতিমা তুলছে। নৌকোর উপর লণ্ঠন টাঙানো। দেখতে দেখতে জোড়া নৌকো মাঝদরিয়ায় নিয়ে যায় মাঝিরা লম্বা লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে। সেখানে জোড়া নৌকোর বাঁধন খুলে প্রতিমা নামিয়ে দেয় জলের মধ্যে—খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয় মাঝিদের এই সময়ে। বিসর্জনের সময়ে পাড়ের লোকেরা নানারকমের ধ্বনি করে—শাঁখ বাজায় মেয়েরা।

প্রতিমা ভাসান দিতে নিয়ে যায় অন্ত্যজ পল্লীর লোকে—দুলে বাগ্দী কেওটরা। যাঁরা পূজা করেন, তাঁরা পয়সাওয়ালা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত লোক—তাঁদের সাধ্য নেই ঠাকুর কাঁধে তুলে নিয়ে যাবেন।

তাই ডাক পড়ে হিন্দুসমাজের অন্ত্যজদের। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিমাতে হাত দেবার অধিকার থাকতো না অজাতদের। পূজাশেষে বেদী থেকে ধরাধরি করে নামিয়ে দিলে প্রতিমার প্রাণ আর থাকতো না দেহে—তখন সেই মরা ঠাকুর ছোঁবার অধিকার পেতো অন্ত্যজরা। তখন তাদের শক্ত কাঁধে চড়ে মরা ঠাকুর যেতেন নদীতে ডুবতে। কয়েক বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের এক ব্রাহ্মণ জমিদার-বাড়িতে দুর্গাপূজার পর স্থানীয় 'অচ্ছুতে'র দল জানিয়ে দিল যে 'জ্যান্ত ঠাকুরের ঘরে তাদের ঢোকার অধিকার নেই, মরা ঠাকুর ফেলবার জন্ম তাদের ডাক। তারা মুরদাফরাস নয়।' অবস্থা এমন হলো যে, শহর থেকে ট্রাক এনে ঠাকুর বিসর্জনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অচল হয়ে থাকে। আজকাল রাজধানীর কথা বাদ দিলাম—মফঃস্বল শহরে সার্বজনীন ঠাকুরদের সদ্গতি হয় না মোটর ট্রাক না আসা পর্যন্ত। মোটরচালক মুসলমান হলেও সবাই ও-কথাটা চেপে যান; তবে এমনও জানি, মুসলমান মালিক বিসর্জনের জন্ম ট্রাক দেয় না।

দোল-উৎসবের কথা মনে আছে। তখন 'হোলি' কথাটা চালু হয়নি এবং হোলির সঙ্গে যে সব unholy বিভীষিকা আজ সকলকে আতঙ্কিত করে তুলেছে সেকালে তা আমাদের শহরে দেখেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না। হরি মুদির

দোকান থেকে আবীর কিনতাম। ভৃত্যদের সাহায্যে বাঁশের পিচকিরী তৈরী হতো। টিনের পিচকিরী এলো পরবর্তীকালে দোকানে। আবীর জলে গুলে পিচকিরী করে দিতাম জানাশোনাদের মধ্যে—শুকনো আবীরই বেশী চলতো। রাধাবল্লভতলায় বা ছোট বাজার অঞ্চলে উৎসব জাঁকিয়ে জমে উঠতো তবে খোল-করতাল নিয়ে বৈষ্ণবী কীর্তনও বের হতো।

ঝুলন ছিল আমাদের পাড়ার ছোট ছেলেদের উৎসব। উঠোনের একধারে কাট-বাখারি-কঞ্চি-কাপড় দিয়ে ছোট ঘর বানিয়ে, তার মধ্যে দোলা বানিয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখতাম—বাজারে রঙচঙ করা যুগলমূর্তি বিক্রী হতো। সেটাতে পাড়ার ছেলের সঙ্গে খুব মাতামাতি হতো। আনন্দ পেতাম এর কারণ একটা কিছু গড়ে তুলছি, সৃষ্টির আনন্দ। যুগলমূর্তির অর্থ কিছুই বুঝতাম না, আজ বুঝি, কিন্তু রস পাই না এই সব কোলাহলমুখরিত প্রতীক-প্রতিমা পূজার বাহ্য আড়ম্বরে।

আজ বুঝি এসব উৎসবের মূলে ছিল ঋতু উৎসব—বর্ষাকালে ঝুলন, বসন্ত-কালে দোল, হেমন্তকালে দীপান্বিতা বা আলোর উৎসব ও শরৎকালে দুর্গোৎসব আজ সব যেন অর্থহীন, কোলাহলমুখর, বৈভব প্রদর্শনের ঔদ্ধত্য মনে হয়, ধর্মে নিষ্ঠা নেই। তখনই প্রশ্ন জাগে, ধর্ম কি!

বাবা আইন পড়ছেন কলকাতায়—বেনিয়াটোলা লেনে বাসা, মা আছেন দাদাকে নিয়ে। আমি জন্মাইনি। মা'র কাছে শোনা: হ্যারিসন রোড তখন তৈরী হচ্ছে, ঘরবাড়ি ভেঙে রাস্তা চওড়া করা চলেছে। ১৮৯১ জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর যে মিছিল বের হয়, তার কথা মা'র মনে ছিল। মা ছোটবেলায় এক সময়ে কলকাতায় বর্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রীট অঞ্চলে কোথায় থাকতেন; তখন দাদামশায় বোধ হয় সেক্রেটারিয়েটে কোনো কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি ছিল কাছেই; মাকে জানতেন পাড়ার এক ডিপুটির মেয়ে বলে। অপরূপ সুন্দরী ফুটফুটে ছোট মেয়েটিকে মাঝে মাঝে ডেকে কটা টাকা হাতে দিয়ে বলতেন, পাড়ায় কোথায় কাকে দিয়ে আসতে হবে। এসব কথা মায়ের মুখে শোনা।

বাবা আইন পড়তেন—তখন ইউনিভার্সিটি 'ল কলেজ' ছিল না—রিপন কলেজেই পড়ানো হতো। আইন পড়েন ও বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা করেন যুগপৎ। সেকালে শিক্ষিত শিক্ষিকা এত সুলভ হয়নি। ছাত্রীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যেতো। শিক্ষিকার সংখ্যাও তদ্রূপ। বহুকাল পরে বাবার এক ছাত্রীর

সঙ্গে আমাদের শহরে দেখা। তিনি তখন সদ্য বিলাত ফেরত সিবিলিয়ান দে-সাহেবের পত্নী। এই সূত্রে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাবা ফৌজদারী আদালতে মামলা কখনও নিতেন না, মোক্তারদের সঙ্গে একাসনে বসে কাজ করতে একদল উকিলের আভিজাত্যে বাধতো। মহকুমা হাকিমের বাড়ি দাদা ও আমি যেতাম মাঝে মাঝে। একবার কালীপূজার সময়ে সাহেবের বাড়ি বাজি পোড়ানো হচ্ছে। বেয়ারারা আমাদের হাতে নানারকম আতস বাজি দেয়, ভারি মজা লাগে। মনে আছে, হাকিমের বাড়ি এ-ঘর ও-ঘর করছি অস্পষ্ট আলোকে। পরে সে বাড়ি গেছি—আরও পরে গেছি সম্মানার্হ অতিথিরূপে আর সেদিন আর্দালিদের কাছে বাজি পেয়ে কী খুশিই হয়েছিলাম।

ছিপছিপে সাহেব ডগ্-কার্ট বা দু'চাকার হাল্কা ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে পথ দিয়ে যেতেন—সেকালে মোটরগাড়ি অজ্ঞাত—অশ্বযানই একমাত্র যান—গ্রামাঞ্চলে গো-যান। বারান্দায় রেলিং-এর বাইরে একটা উঁচু জায়গায় বসে আছি—যেখান থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল—এমন সময় দেখি সাহেব যাচ্ছেন সে পথে। ঐভাবে বসে থাকতে দেখে ঘোড়ার চাবুকটা তুলে হুঁশিয়ার করে গেলেন। বহু বৎসর পরে বোলপুর স্টেশনে সাহেবকে দেখলাম। যৌবনে ছিলেন ছিপছিপে সুপুরুষ। ট্রেনের কামরার মধ্যে দেখলাম বৃহৎ বপু খাঁটি বাঙালীর রূপ। প্রণাম করে পরিচয় দিলাম—চিনতে পারলেন না অথবা কমিশনর সাহেবকে ঘিরে যে-সব রায়সাহেব, খানসাহেব ও অফিসাররা আছেন, তাঁদের সম্মুখে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিন্দিত, পুলিসের দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল শান্তিনিকেতনের বিশ টাকা বেতনের 'জনৈক শিক্ষককে' চিনতে পারা আত্ম-মর্যাদা হানিকর বলে চিনতে পারলেন না। বহুকাল পরে এঁদের এক কন্যার কাছ থেকে যে অযাচিত সহায়তা পেয়েছিলাম তার কথা ভুলতে পারিনি। যথাস্থানে বলবো সে কাহিনী।

আইন পাস করে বাবা ১৮৯১ সালের শেষদিকে শহরে এসে ওকালতী শুরু করেন। তখন সেখানে কজন উকিল আর কতই বা মামলা—একজন মুন্সেফই সব কাজ সামলাতেন। সেকালের উকিলরা ঘোড়ার গাড়ি করে আদালতে যেতেন। হেঁটে যাওয়া! অসম্ভব। বাঁধা ঘোড়ার গাড়ি তিনজন উকিলবাবুকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির সম্মুখে। বাবা চতুর্থ সোয়ারী, বাবা ঠিকভাবে গাড়িতে উঠলেন কিনা মা প্রতিদিন জানালা ফাঁক করে দেখতেন—বাবুর গাড়ি ছেড়ে দিলে জানালা থেকে সরে আসতেন। তখন বুঝতাম না এ উৎকণ্ঠার অর্থ কি।

সে-কালের উকিলবাবুরা চোগা-চাপকান চাদর, শামলা পরে আদালতে যেতেন। শোবার ঘরের মেঝেতেই খাওয়ার জায়গা হতো। 'ডাইনিং রুম' তখনো হয়নি। বাবা যথাসময়ে খেয়ে ধড়াচুড়া পরতেন—পরতেন বললে ভুল হবে, পরানো হতো। ভৃত্য পায়ে মোজা পরায়, পেন্টালুন ঠিক করে ধরে, বাবা পা দুটো গলিয়ে দিয়ে দাঁড়ান—ভৃত্য বেল্ট বা গালিস প্রভৃতি ঠিক করে দেয়। গায়ে চোগা, তার উপর চাপকান। একটা চাদর পাকিয়ে ক্রস করে পরেন। মাথায় দেন শামলা। বলা বাহুল্য, মোজা চোগা চাপকান চাদর শামলা—সবই মুসলমানী যুগের পোশাক—ব্রিটিশ যুগের উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত সেই বেশভূষা ছিল ভদ্র সমাজের সরকারী পোশাক। কাল পরিবর্তনে আমরাই দেখলাম, নরেন সরকার নবীন উকীল—প্যাণ্ট, কোট, নেকটাই পরে গাউন হাতে সাইকেলে চড়ে আদালতে এলেন। বুনিয়াদী আমলের উকীলরা সেদিন বুঝলেন নূতন শতাব্দীর সূচনা হলো। আজ আদালতপ্রাঙ্গণে কে উকীল, কে কেরানী কে মক্কেল তা সনাক্ত করা যায় না পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে।

হিন্দু তার 'জাত' ও মুসলমান তার 'ধর্ম' বিশুদ্ধ রাখবার জন্য মহাব্যস্ত। জাত-ধর্ম নিয়ে বাছাবাছি বা বাড়াবাড়ি ছিল সমাজজীবনে বৈশিষ্ট্য। বাবার কাছে মুসলমান মক্কেলও আসে। মুসলমানদের জন্য সব পৃথক ব্যবস্থা। বসবার স্থান আলাদা, হুঁকো-কলকে আলাদা। তবে চাকদহের কাজী-সাহেব সম্ভ্রান্তবংশীয় মক্কেল—তাঁর জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তিনি তামাক খেতেন না, চা খেতেন। তাঁর জন্য এনামেলের কাপ-সসার ও জলখাবার জন্য কাঁচের গেলাস থাকতো আলাদা। সংসারের বাসনপত্রের সঙ্গে মেশানো হতো না, 'মোসলমানের' এঁটো বাসন ঝিরা ছোঁবে না, মাজবে না—জাত যাবে। আমরা চা এনে দিতাম, খাওয়া হয়ে গেলে কাপ-সসার নিয়ে গিয়ে ধুয়ে রাখতাম—রাখারও একটা বিশেষ স্থান ছিল।

আজকাল ভদ্রলোকের বাড়ি হুঁকো-কলকের বালাই নেই। বন্ধুজন এলে সিগারেট বের করে দেন,—অপরিচিতের সঙ্গে সামান্য পরিচয়কে প্রগাঢ় করবার জন্য সিগারেট 'অফার' (offer) করা রীতি। এমন কি দামী লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। আমাদের বাসার বারান্দায় মক্কেলদের ভিড় জমতো সকালে। একটা দিকে থাকতো অনেকগুলো 'থেলো হুঁকো', কলকে, টিকে, তামাক। 'থেলো হুঁকো'র গলায় কড়ি বাঁধা—এক কড়ি বা দু'কড়ি বাঁধা। ব্রাহ্মণ শূদ্রের জন্য পৃথক হুঁকো বোঝা যেতো কড়ি গুনে। বাবা তামাক খেতেন—রূপোর বাঁধানো হুকো। থাকতো পিতলের তৈরী পরীর হাতে—

আমাদের শহরের কাঁসারী শিল্পীদের হাতে গড়া। খুব সম্ভ্রান্ত স্বজাতি এলে বাবা হুঁকে দিতেন তাঁর হাতে। তিনি পকেট থেকে নল বের করে অথবা কলার পাতা ভৃত্যদের দিয়ে আনিয়ে হুঁকো টানতেন।

তামাকেরই ব্যবস্থা কত রকম ছিল। মধ্যবিত্তেরা খেতেন মিঠে তামাক, উচ্চবিত্ত বা অতি ভদ্রের দল টানতেন অম্বরী তামাক। সে তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরে উঠতো। সে তামাক আসতো বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে—বোধ হয় বিষ্ণুপুরের হিন্দুরাজাদের উৎসাহে ও অনুগ্রহে এই শিল্পটির জন্ম হয়। এখন শুনি বিষ্ণুপুরের এই শিল্প উঠে গেছে। নিম্নবিত্তদের জন্য কড়া তামাক তৈরী হতো মোটাপাতা কুটে চিটেগুড় মেখে মশলাপাতি সুগন্ধাদি দিয়ে। মিঠে করলে ওদের ভাল লাগতো না।

গ্রাম্য অর্থনীতির আভাস একটু দিই। কলকে থেকে পোড়া তামাকের 'গুল' ফেলে দেওয়া হতো না। সেগুলি গুঁড়ো করে দাঁতের মিশি বা মাজন তৈরী হতো। আজ দেখছি পাঁচ বছরের শিশুর হাতে পেস্ট ও বুরুশ। সকলের সামনে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা এখন প্রায় ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেকালে সিগারেটের চল্ শুরু হয়েছে—বিলাত থেকে আমদানী নূতন ধূমপান অভ্যাস। বিড়ির নামও শুনিনি সেকালে। সাধারণ লোকের মুখেও সিগারেট দেখিনি কখনো। শুনতাম স্কুলের কোনো কোনো ছেলে 'বার্ডসাই' খেতো। Bird's Eye বা পাখীর চোখ ছিল সিগারেট কোম্পানীর পেটেন্টের প্রতীক। সেই পদার্থটা লোকমুখে 'বার্ডসাই' নামে চালু হয়। এ ছাড়া Ogden কোম্পানীর সিগারেটের সেকালে নামডাক ছিল—এখন তার নামও শুনিনে। সব সিগারেট বিলাত থেকে আসতো, প্রত্যেকটি প্যাকেটে একটি করে রঙীন ছবি থাকতো বাক্সের মাপে—বিদেশী নর্তকী, ব্রিটিশ সেনাপতি, অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ, রাজপুরুষ ও মন্ত্রীদের ছবি। আমার সেজো কাকার সখ ছিল ছবি জমানো। বড় একটা বাঁধানো খাতায় সেগুলি সযত্নে আঠা দিয়ে এঁটে রাখতেন—আমাদের হাতে দিতেন না—পাছে নষ্ট করি। আজকাল মন ভোলাবার জন্য সিগারেট কোম্পানীকে সুন্দরীদের ছবি বিলি করে প্রলুব্ধ করতে হয় না—গত সাত দশকের মধ্যে তামাকের নেশা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। এখন আবার সুর বদলাচ্ছে—ডাক্তারদের মধ্যে একদল বলছেন ক্যানসার রোগের কারণ নাকি সিগারেট ধূমপান। এখন সিগারেটের বাক্সে ছাপিয়ে দিতে হয় 'ধূমপান ক্ষতিকর।' কিন্তু নেশা ছাড়বে কে?

কয়েক বৎসর পূর্বে হঠাৎ হুজুগ উঠলো 'সিগারেট খাবো না'—'বিড়ি খাবো'।

সিগারেটের বিক্রী খুব কমে গেল—কর্মচারী-শ্রমিকও ভাবছে তাদের চাকুরি যাবে। তারা তাদের সাহেবকে গিয়ে বললে তাদের মনের কথা। সাহেব বলেছিলেন ডরো মাৎ, শূয়র লোক ফিন্ পিয়েগা। এমন হাড়ে হাড়ে চিনেছিল সাহেবরা আমাদের! কালে দেখা গেল সাহেবের কথাই ঠিক।

শহরে যান ছিল গোযান, অশ্বযান আর বাহন ছিল পালকি ও ডুলি। আর দ্বিচক্র যান সবেমাত্র দেখা দিচ্ছে দু-একটা করে। স্টেশনে ঘোড়ারগাড়ি ছাড়া আর কোন যানবাহন ছিল না। পালকি ছিল ডাক্তারদের বিশেষ বাহন তবে অন্তঃপুরবাসিনীরাও পালকি চেপে বিয়েবাড়ি যেতেন। বড়লোকের বাড়িতে আজকাল যেমন মোটরকারের জন্য গ্যারাজ থাকে, সেকালে ছিল পালকি রাখার ছাউনি। আমাদের দেশের বাড়িতে ভগ্নশ্রী অবস্থায় ভাঙা পালকি দেখেছিলাম—তার স্মৃতিচিত্র পূর্বেই এঁকেছি।

চারবেহারা গলদঘর্ম হয়ে প্রায় আড়াইমণি দিনু ডাক্তারকে বয়ে আনে পালকি করে। অসুখবিসুখ লেগেই আছে সংসারে—ডাক্তারের ভিজিট দু'টাকা ঔষধের প্রেসক্রুপশন ডাক্তারদের নিজস্ব ডাক্তারখানা থেকে আনাই ছিল রেওয়াজ দিনু ডাক্তারের প্রেসক্রুপশন তাঁর কম্পাউণ্ডার ছাড়া বোধ হয় কেউ পড়তে পারতে না—এমন লেখার শ্রী। এই দিনু ডাক্তারের জামাইকে ইংরেজ গোরারা বারাক পুরে ট্রেনে হত্যা করে—তাঁর অপরাধ তিনি ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে আসছিলেন কাগজে লেখালেখি ও ঘরে বসে উত্তেজনা প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনে প্রতিকারের ক্ষমতা তখন জনতা আবিষ্কার করতে পারেনি। ট্রেনের মধ্যে আজকাল রাহাজানি ডাকাতি ছিনতাই তো নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে সেকালে এ ধরনের দেশীয়দের 'বীরত্ব' কাহিনী শোনা যেতো না। সেকালে শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অত্যাচার অবিচার অপমান প্রায়ই ঘটতো। দুই একটা কাহিনী মনে পড়ছে লিখতে লিখতে।

ব্রাহ্মসমাজের এক অতি ভদ্র ধার্মিক অথচ প্রভূত বলশালী ব্যক্তি ট্রেনে যাচ্ছেন প্রথম শ্রেণীতে। এক সাহেব উঠে দেখেন বাঙালী বসে। অসহ্য হলো সাহেবের। বেঞ্চে বসে প্রথমে পা তুলে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক সরে বসলেন আর মনে মনে বলছেন—, ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মের সন্তান। একটু পরে পা সরতে সরতে গায়ে ঠেকলো। ভদ্রলোক সরে বসলেন—মনে মনে ব্রহ্মনাম করছেন, ও ভগবানের সন্তান। যখন ট্রেনে প্রায় কোণঠাসা হয়েছেন, তখন মনকে বললেন, আমিও তো ব্রহ্মের সন্তান। বিরাশীওজনের এক চপেটাঘাতে সাহেব-পুঙ্গব ছিটকে পড়লেন। শান্তভাবে ভদ্রলোক নিজের জায়গায় ফিরে ব্রহ্মনাম জপ করতে লাগলেন। সাহেব



ধুলো ঝেড়ে ক্ষমা চেয়ে অন্য কোণে চুপচাপ বসে থাকলো।

সেকালের আর-একটি কাহিনী। রামহরি শর্মা সাহেবী পোশাক পরে রেলওয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছেন—স্ত্রীকেও গাউন পরিয়ে মেম সাজিয়েছেন। মাঝ স্টেশনে তিনজন গোরা সৈন্য উঠলো। রামহরি শর্মা সাহেব নন, কালো বাঙালী; সাহেব-কয়টা রামহরির স্ত্রীর সহিত হাস্যপরিহাস করে রামহরিকে আক্রমণ করে। বেচারা প্রাণপণে চিৎকার করে—সাহেবরা হাসে। এমন সময় ট্রেন একটা স্টেশনে থামলে চীৎকার শুনে ডেভিড হেয়ার সাহেব গাড়িতে উঠে এলেন ও রামহরির অবস্থা দেখে সাহেবদের মিষ্টি কথায় শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে ফল হল না দেখে হেয়ার সাহেব ঘুষি ধরলেন। গোরা সাহেবরা বুঝল সুবিধা হবে না। পরবর্তী স্টেশন এলে হেয়ার সাহেব রামহরি শর্মা ও তার স্ত্রীকে নামিয়ে দিলেন। হেয়ার রামহরির কানটি ধরে বললেন, When you will be so strong as we are, then imitate—অর্থাৎ গায়ের জোরে আমাদের সমকক্ষ হও, তখন অনুকরণ করো। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে Imitation is the worst form of flattery.

যাক, সেযুগের সাহেবদের উপদ্রবের অনেক কাহিনী শুনতাম।

বড়কাকা বারাকপুর স্কুলের শিক্ষক। কী একটা ছুটির দিনে আমরা দুই ভাই কাকার সঙ্গে বারাকপুর যাই। তখন বারাকপুরে ছিল বড়লাটের একটা বাড়ি—গোরা সৈন্যদেরও একটা ছাউনি। বড়কাকার কাছে শুনেছিলাম এখানে নাকি সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়—মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী বিদ্রোহের সর্দার। বড়কাকা বলতেন, মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরতে সাহেবদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সৈনিক বিভাগের দুজন উচ্চপদস্থ সাহেব তাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দেয়। মঙ্গল পাণ্ডে ধরা পড়ে, বিচারে ফাঁসিও হয় কিন্তু আজ দেখছি দেশবাসী তাকে ভোলেনি। বড়কাকার কাছে এইসব কাহিনী শুনে বারাকপুর দেখতে ইচ্ছা করে, তিনি নিয়ে গিয়ে অনেক কিছু দেখালেন। বললেন, 'হাঁ রে, লেডিকেনি পান্তুয়া খাস নিশ্চয়ই। লেডিকেনি কেন বলে জানিস?' আমরা কি করে জানবো, দ্বারিকের দোকান থেকে কিনে খাই। কাকা বললেন, ভারতের বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর নাম শুনেছিস তো? যাঁর সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সেটা জানতাম আবদুল করীমের ছোট ইংরেজি পাঠ্য ইতিহাসের বই থেকে। কাকা বললেন, 'লর্ড ক্যানিং-এর স্ত্রী লেডি ক্যানিং-এর নাম অনুসারে এই মিষ্টান্নের নাম। বাংলাদেশের বারাকপুর তাঁর খুব ভালো লাগতো। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দেখেছো তো তাঁর সমাধি—কতদূর থেকে দেখা যায়।'

ছোটবেলার কথা। শহর ঘুরলাম কাকার সঙ্গে, উনি স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিলেন। এমন সময়ে কলকাতাগামী ডাউন ট্রেন এসে থামলো—কাকা বললেন, 'ঐ দেখ সুরেন বাঁড়ুজ্জে যাচ্ছেন। উনি খুব পণ্ডিত, রিপন কলেজের অধ্যাপক ও 'বেঙ্গলি' নামে কাগজের সম্পাদক। 'বেঙ্গলি' কাগজ জানতাম—বাবার জন্য রোজ বিকালে লালু পালের দোকানের উপর অবস্থিত পাবলিক লাইব্রেরী থেকে ঐ কাগজ আনতাম। পরের দিন ফেরত দিয়ে আবার আনতাম। সুতরাং 'বেঙ্গলি' কাগজের সম্পাদককে চোখে দেখলাম। তখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়নি—বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের নেতারূপে তাঁর কথা পরে আসবে।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির অপেক্ষায়। দেখি দুটো গোরা সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। আমাদের দুই ভাইয়ের প্রাণ উড়ে গেল—এদের দৌরাত্ম্যের কথা জানতাম। এমন সময়ে ট্রেন এসে গেল—উঠে পড়লাম—বাঁচা গেল।

গরুর গাড়ির বড় বড় দুই কাঠের চাকা টানে জোড়া বলদে, চালায় গাড়োয়ানে। ঘোড়ার গাড়ির চার চাকা, টানে দুই পক্ষীরাজ ঘোড়ায়। চালায় কোচম্যান উপরে বসে। কিন্তু যেদিন লালু পালের এক ছেলে বাইসাইকেলে চড়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল—দেখবার জন্য লোকে ছুটে এলো। আজও ঐ যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না—কয়লা পোড়ায় না, তেল খায় না, চলবার সময় বিকট শব্দ করে না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক আবিষ্কার এই সাইকেল—কেবল পায়ের জোরে চলে। ভারতচন্দ্র অশ্বশক্তির প্রশস্তি করেছিলেন

কাঞ্চীপুর বর্ধমান দু'মাসের পথ
ছয়দিনে উত্তরিল অশ্বমনোরথ॥

আজ যদি ভারতচন্দ্র ফিরে এসে কাব্য লেখেন তবে তাঁকে সাইকেলের উপর ছড়া কাটতে বলতাম। জানি না কোনো নবীন কবি এই দ্বি-চক্রযানের উপর আধুনিক কবিতা লিখেছেন কিনা। আমি আধুনিকও নই, কবিও নই—তাই সাইকেলের উপর কবিতা লেখা হলো না।

অবাক হয়ে ভাবতাম দু-চাকার উপর ব্যালেন্স রাখে কি করে—পড়ে যায় না! ভাবতাম দুপাশে দুটো রেলিং থাকবে, মাঝখানে পথ—সাইকেলে চেপে পাশের রেলিং ধরে যাওয়া যাবে না—বুঝতাম না হাত দুটো যে সাইকেলটাকে সিধে রাখছে, মোড় ফেরাচ্ছে। সুতরাং ওভাবে শেখা তো যাবে না। তারপর

যৌবনে একদিন সাইকেল কিনলাম, চড়তে শিখলাম। তখন মনে হলো, 'বাঃ, এ তো সহজ।' আজ অর্ধশতাব্দী পরে দেখছি সাইকেল চড়তে জানে না এমন বালকবালিকাও শহরে গ্রামে দেখা যায় না। শান্তিয়া ধোপার গাধায় কাপড়ের মোট বয় না। সে তার সাইকেলের উপর পাঁচটা বিরাট মোট চাপিয়ে নিয়ে যায়। ডবল রাইডিং ম্যুন্সিপালটি এলাকায় নিষিদ্ধ থাকলেও কেউ মানে না—দু-তিনজনও চড়ে। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র তার কনিষ্ঠ তিনি ভাইকে পিছনে ও রডে বসিয়ে, পিনে দাঁড় করিয়ে স্কুলে নিয়ে যেতো। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন, 'প্রভাতবাবুর লরী আসছে।' আজ বাড়িতে পাঁচ-ছটা সাইকেল—নাতি, নাতনী, পুত্রবধূরা, সেবকরা সবাই চড়ে।

যানবাহনের কথাটা শেষ করা যাক। সেকালে অশ্বযান বা ঘোড়ার গাড়ি ছিল শহরে চলাচলের শ্রেষ্ঠ যান—পালকি চলতো মানুষের কাঁধে ঝুলে। সাহেবরা পালকিটাকে চার চাকার উপর উঠিয়ে গাড়ি বানিয়ে ঘোড়া দিল জুতে। আমাদের স্কুলের পাশ দিয়ে যে পথ নদীঘাটে এসেছে সেই পথের ধারে ছিল ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল। এ আস্তাবল শব্দটিকে নিয়ে আরবী ভাষীরা দাবী করে ওটা তাদের শব্দ; ইংরেজি stable-এর সঙ্গে আবার আশ্চর্য শব্দ-সাযুজ্য; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বলেন যে শব্দটা লাতিন থেকে এসেছে। ছোটবেলা থেকে ঐ পথের আস্তাবল বা ঘোড়ার আস্তানা এবং সহিস কোচম্যানদের বাস-স্থান গায়ে-গায়ে লেপ্‌টা। গাড়োয়ান আর তার স্ত্রী, তাদের ছেলেমেয়ে—ঘোড়া, ঘোটকী, তাদের বাচ্ছা—ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার মূত্র, বিষ্ঠা সমস্ত কাছাকাছি। অশ্ববিষ্ঠা ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস রোগের উৎস জেনেছি বলে পথে-ঘাটে সামান্য আঘাত লাগলেই ডাক্তাররা অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন দেন। অথচ ঐ ছেলে-মেয়েগুলো ঐ আবর্জনার মধ্যে থাকতে থাকতে কি ইম্যুনিটি পেয়েছিল!

খেয়ালি ছিল আমাদের গাড়োয়ান, বাবাকে নিত্য আদালতে নিয়ে যেতো। তাদের পরিবারকে চিনতাম—গাড়ির দরকার হলে এদের বাড়িতে এসে বলে গেলেই ঠিক সময়ে খেয়ালি হাজির হতো। ঘোড়াগুলো পক্ষীরাজের বংশধর নয়। অনেকগুলি তাদের ঘরের বাচ্ছা। ছোট বাচ্ছা মায়ের দুধ খায়, মায়ের পাশে ঘুরঘুর করে, মাকে কেন্দ্র করে গোল হয়ে ঘোরে। পিকউইক শুধিয়েছিল, গাড়োয়ানকে, 'গাড়ির ঘোড়া কখন খোল?' সে বলেছিল, 'বাঁধন খুলি নে, খুললেই বসে পড়বে—ঘোড়া একবার বসলে আর ওঠে না।' আমাদের পক্ষী-রাজদের সাজসজ্জায় আভিজাত্য ছিল না—লাগাম দড়ির, জিন্‌ চটের—কারও কারও চামড়ার জিন্‌ লাগাম সাজসজ্জা পরবার সৌভাগ্য ছিল। এমন কি পাশ

ঢাকা চশমাও পরতো কেউ কেউ। এমনই বলবান এরা যে দুজনে ছাড়া চার-চাকার পালকি গাড়ি টানতে পারতো না। অবশ্য শহরের জঞ্জাল ফেলার দু-চাকার গাড়ি একজনেই টানতে পারতো।

তবে দেখলাম বটে 'ওয়েলার' ঘোড়াকে পালকি গাড়ি টানতে। সোনা-রূপার কাজ করে পয়সা হয়েছে পরামানিকদের। পাকা বাড়ি উঠলো দোতলা। বড়লোকের 'ঘোড়া রোগ' দেখা দিল। এক দামী পালকি গাড়ি ও বিরাট 'ওয়েলার' ঘোড়া এলো। স্কুলে যাবার পথে দেখতাম, তাকে দুজন সহিস হিস হিস্ শব্দ করছে আর দলাইমলাই করছে—খট্‌রা বুরুশ দিয়ে গা সাফ করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-রোজই দেখতাম। ছেলেদের কাছে শুনতাম, 'ওয়েলার' ঘোড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে। ভূগোল পড়েও জানতাম অস্ট্রেলিয়া ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে 'ওয়েলার' অস্ট্রেলিয়ার জাত কিনা তা জানি না আজও।

চকচকে নতুন পালকি গাড়ি নিয়ে চলেছে ওয়েলার ঘোড়া—ঠগান কোচকেসে বসে লাগাম টেনে ধরে। একদিন দেখি ওয়েলার ঘোড়া গাড়ি টানবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তার মাঝে। ঠগান চাবুক মারে। ফল উলটো হয়। চিঁহিঁ শব্দ করছে আর পিছনের পা দিয়ে লাফাচ্ছে—গাড়িটা জখম হয়ে গেল। লোক জড় হয়ে গেল। সবাই শুধোয়—পাগল হয়ে গেল নাকি? অনেক কষ্টে ঠগান ঘোড়ার মুখ ধরে আস্তাবলে নিয়ে যায়। পরদিন ভোরে ন্টুটি বলে, 'পরামাণিকদের সেই ঘোড়াটা মরে গেছে কাল রাতে।' স্কুলে যাবার সময়ে রোজ যাকে দেখতাম সহিসদের সেবা করতে—আজ সেই বিশালকায় জন্তুটা চার পা সটান করে পড়ে আছে। অত বড় প্রাণীটাকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। তারপর তার কি গতি হলো জানিনে—হয়তো তার বিরাট চামড়াটা কোনো বিলাতী পাইপ-অর্গান বাদ্যযন্ত্রের 'হাপর' (bellows) তৈরীর জন্য কাজে লেগেছিল। কে জানে!

কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম; আমি দেখিনি সে অদ্ভুত যান। তবে দাদা একবার বাবা ও কাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে ঐ অশ্বযানে চড়ে কী বিপদে পড়েছিলেন, তার গল্প শুনি তাঁরা কলকাতা থেকে ফিরে এলে। একদিন তিনজনে মিলে যেন কোথায় যাবেন। বাবা ট্রামে উঠে গেছেন—কাকা দাদাকে নিয়ে উঠবেন এমন সময় ঘোড়া চলতে আরম্ভ করলো। কাকা 'রোখো রোখো' করে চিৎকার করেন। কিন্তু 'রোখো' বললেই অশ্বশক্তি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না—গাড়িতে 'ব্রেক' কষতে হয়। ইতিমধ্যে এক পাঞ্জাবী কাকা ও দাদাকে টেনে

ট্রামে উঠিয়ে নিয়েছেন। মা শুনে বললেন, 'ভাগ্যে পাঞ্জাবী ছিল! নইলে ঠাকুরপো ভাইপোকে নিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন। আর 'বাবু' কোথায় গিয়ে নামতেন?' দাদার কাছে শুনলাম লোহার রেললাইনের উপর একটা করে গাড়ি ঘোড়ায় টানতো। গাড়ি থামবার দরকার হলে ড্রাইভার 'ব্রেক' দিলে চাকা আর ঘুরতে পারে না—গাড়ি থেমে যায়। দাদা অনেক খবর দিলেন, ঘোড়া বদলের স্থান আছে, পথে জল খাবার জন্য চৌবাচ্চা আছে। কাকা বললেন, উনি কোথায় বেড়াতে যান, দেখেন দুপুরে সর্দিগর্মি হয়ে একটা ঘোড়া মরে রয়েছে রাস্তার উপর। বাবার কাছে পরে শুনি ১৮৭৯ সালে একটা ইংরেজ কোম্পানি ট্রাম খোলবার অনুমতি পেয়ে কলকাতায় ট্রামওয়ে আরম্ভ করে। প্রথমে ঘোড়ায় ট্রাম টানতো। মাঝে স্টীমইঞ্জিন দিয়ে কিছুকাল কাজ চলে—১৯০২ সালে সর্বপ্রথম চলে ইলেকট্রিক ট্রাম।

দাদা ঘোড়ার ট্রামে প্রথম চড়েন, আর মোটরকারও প্রথম দেখেন। একবার গ্রামের বাড়িতে দাদা আছেন মা'র কাছে—আমি শহরে আছি বাবার কাছে। দাদা গ্রাম থেকে এসে গল্প বললেন, 'একদিন আমি ও দেবেনদা বেড়াচ্ছি—এমন সময়ে দেখি একটা অদ্ভুত গাড়ি এসে থামলো আমাদের সম্মুখে—তার না আছে ইঞ্জিন, না আছে ঘোড়া—অথচ ভিতরে ভিতরে ঘরঘর করছে। আরোহীরা নেমে যে ভাষায় কথা বললো তা বুঝলাম না। কেবল বুঝলাম 'কালকুত্তা' 'গো'—অর্থাৎ তারা কলকাতায় যাবেন, পথ পাচ্ছেন না। আমাদের ইংরেজি বিদ্যায় বুঝিয়ে দিলাম কোন্ দিকে গেলে পুরাতন বাদশাহী সড়ক পাবে। তারা ফরাসী—দার্জিলিং থেকে আসছে, কলকাতায় ফিরছে—পথ ভুলে এদিকে এসে যায়।' এখন সে-পথ 'টারম্যার্ক' করা—সর্বদাই বাস, লরী, মোটর গাড়ি চলছে। ফরাসীরা কেন এ পথে আসে—কি উদ্দেশ্যে ঘুরছিল, কিছুই জানলাম না।

কয়েক বৎসর পরে দুই ভাই কলকাতায় গিয়েছি—আছি মানিকতলা পাড়ায় হরিতকী বাগান লেনে হরগোপাল সরকারদের বাসায়। সকালে দুই ভাই যাই হেদোতে—যার নাম আজ হয়েছে 'আজাদ হিন্দ্ সরোবর'। রেলিঙের ভিতর দাঁড়িয়ে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে কত মোটরগাড়ি যাচ্ছে গুনতাম—দাদা উত্তরমুখী গাড়ি, আমি দক্ষিণমুখী গাড়ি। কে কখনো মোটরগাড়ি বা হাওয়াগাড়ি দেখলাম তা নিয়ে হতো তর্ক। মোটরগাড়ি চড়েছি অনেক পরে।

আমার জন্মের ত্রিশ বৎসর পূর্বে বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে (১৮৬২) নির্মিত হয়; এবং এই রেলপথ তৈরীর সঙ্গে আমাদের পিতামহদের বৈষয়িক উন্নতি-অবনতির

যে যোগ ছিল তা পূর্বেই বলেছি। আমাদের ছোটবেলায় রেলওয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল খুবই কম—কারণ দেশের বাড়ি নির্মিত হয় অনেক পরে। আজকালকার মতো ভ্রমণের নেশা তখনো বাঙালী মধ্যবিত্তকে পেয়ে বসেনি, এখন তো ঘরে ঘরে পূজার ছুটি হবার ক'মাস পূর্ব থেকেই টাইমটেবল্ নিয়ে কর্তা, গিন্নী, ছেলেমেয়ের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।

সেকালে ট্রেনের গাড়ি ছিল চার শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম বা ইন্টারমিডিয়েট ও তৃতীয় বা থার্ড ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাসে শ্বেতাঙ্গরাই ভ্রমণ করতো বলে বোধ হয় সে গাড়ির রঙ ছিল সাদা। সেকেণ্ড ক্লাসের রঙ ছিল সবুজ, মধ্যমের পাটকিলে, থার্ডের মেটে-লালচে। আজকাল সব গাড়িরই এক রঙ। ব্রিটিশ যুগেই গাড়ির রঙে 'ডিমোক্রেসি' এসে যায়। তার গূঢ় কারণ ছিল। স্বদেশীযুগে রুদ্রপন্থীরা যখন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের হত্যাচেষ্টা আরম্ভ করেন, তখন 'শ্বেতাঙ্গ' ফার্স্ট ক্লাস ছিল তাদের লক্ষ্য। সেটি সরকার নিরাকৃত করেন—সব গাড়ির এক রঙ করে।

আমরা মধ্যবিত্ত, তাই আমরা ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীতেই যাতায়াত করতাম। তাছাড়া আর একটা সুবিধা ছিল—রিটার্ন টিকিট কিনতে পারা যেতো। অর্থাৎ যাওয়া-আসার দেড়া-ভাড়া দিলে তিনদিনের জন্য ফিরতি টিকিট পেতাম। আজ আমরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভারত স্বাধীন হয়ে কর্তৃপক্ষ প্রথমেই ঠিক করলেন দুনিয়াতে দুটি জাত আছে—প্রভু ও ভৃত্য বা শোষক ও শোষিত।

মধ্যবিত্তরা সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকে এটা ডিমোক্রেসির আদর্শ নয়, অতএব ট্রেনের মধ্যে 'মধ্যম শ্রেণী' গাড়ি উঠিয়ে দাও। পয়সা কম থাকে জনতার সঙ্গে থার্ড ক্লাসে যাও, গান্ধীজি যেতেন না? পয়সা বেশী থাকে ফার্স্ট ক্লাসে যাও, এয়ারকনডিশন কামরায় যাও। শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের প্রথম পদক্ষেপে মধ্যম শ্রেণী বিলুপ্ত করা হলো।

আজকাল সেকেণ্ড ক্লাস বলে যে কামরা থাকে তাতে রিজার্ভেশন হয় না—খাড়া হয়ে সারারাত্রি বসে থাকো পয়সা বেশী দিয়ে। তা না হলে দশদিন আগে তিন-তলা (থ্রী-টায়ার) বা দুই-তলা (টু-টায়ার) গাড়িতে রিজার্ভেশন পাবার জন্য ঘন্টার পর ঘণ্টা 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—অথবা অ-যাত্রী টিকিট-ক্রেতার কাছ থেকে খেসারত দিয়ে গোপনে টিকিট সংগ্রহ করো। এখন ট্রেনে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস। তবে জনতা ট্রেনে কেবল 'থার্ড ক্লাস' দিয়ে সাধারণের সুবিধা করে দিয়েছেন সরকার। কিন্তু মধ্যবিত্তদের জন্য? সেকালে মধ্যবিত্ত আমরা 'মধ্যম' শ্রেণীতেই যাওয়া-আসা করতাম সাধারণত।

আমাদের স্টেশন মাত্র জংশন হয়েছে। বনগাঁর লাইন তৈরী হয়েছে, সেই পথ গিয়েছে যশোর পর্যন্ত, কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দমদম হয়ে শাখা রেলপথ বনগাঁ হয়ে যশোহর পর্যন্ত মিলিত হয়েছিল। রেলপথ নির্মিত হবার পূর্বে চাকদহ স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে লোকে যেতো বনগাঁ যশোহর। ছোটবেলায় দেখেছিলাম চাকদহ স্টেশনের পূর্বদিকে—আমাদের গ্রামে যাবার পথের ধারে পড়ে আছে ভাঙা ঘোড়ারগাড়ি—কারও চাকা আছে পালকিটা নেই, কারও পালকিটা আছে চাকা নেই।

একবার যশোর যাই; দাদামশাই তখন সেখানে জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মনে পড়ছে রাণাঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি—সেগুনবনের মাঝ থেকে হঠাৎ ধক্ ধক্ করতে করতে ট্রেন এলো। সেই ট্রেন ফিরে যাবে যশোহর।

ছবির মতো ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে উঠছে—তখন বয়স বোধহয় সাত-আট বৎসর হবে। স্টেশন থেকে ঘোড়ারগাড়ি করে যেতেই পথে দেখলাম ভৈরব নদীর মজে যাওয়া রূপ। আজ শুনি পাকিস্তানী সরকার ভৈরবের রূপ ফিরিয়ে এনেছেন—নদী নাকি বহতা হয়েছে।

ডেপুটি দাদামশায়ের বাড়ি দোতলা—চার মামা ও ছোট মাসি থাকেন। পূজার ছুটিতে আমরা এসেছি, মাসিও এসেছেন কালনা থেকে তাঁর ছেলে পাঁচু (নলিন)-কে নিয়ে। দোতলা থেকে দেখা যায় একটা পুষ্করিণী গোল পানায় ভর্তি—তখনো কচুরিপানার আমদানী হয়নি এদেশে। দোতলার এক কোণে ছিল ছোট এক টুকরো বারান্দা, সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতাম পুকুরটা—সিঁড়ি ভেঙে পড়ছে। কবে কোন্ পুণ্যার্থী পুকুর কেটে সর্বজনহিতায় উৎসর্গ করেছিলেন, তার নাম সবাই হয়তো ভুলে গেছে। হয়তো ম্যালেরিয়া মহারাক্ষসী সমস্ত পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম পুকুরে লোকের আনাগোনা, পানা সরিয়ে ডুব দিতে। হাঁসগুলো চরছে—তাদের স্নান ও আহার যেন শেষ হয় না। একটা ডুব দিল দেখতে পাই নে—ভাবছি ডুবে মরলো নাকি, হঠাৎ দেখি অনেক দূরে উঠেছে। অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে নূতন শহরের যেটুকু দেখা যায় তাই দেখছি। এমন সময় শুনি ঘরের ভিতর হাসির হল্লা—মা, মাসি, দিদিমার কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তর্কের মীমাংসা হচ্ছে না দেখে মেজো মামা তাঁর ঘর থেকে কয়েকটা লাঠি, চেলাকাঠ এনে প্রত্যেকের সামনে রেখে দিয়ে বলে-ছিলেন, 'এইবার তর্কের মীমাংসা হবে।' এতেই তর্ক বন্ধ হলো হাসির হল্লায়।

মেজো মামার ধর্মে গিয়েছিল মন, তাই দোতলার ছোট বারান্দার পাশে একটা তে-কোণা ঘরে জপতপ করতেন। ঘরে দেখতাম কোষাকুষি, ঠাকুরদেবতার

পট দেওয়ালে টাঙানো।

সেই সময়ে যশোহরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৯৯-১৯০১) জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে আছেন। মনে পড়ছে একদিন বাবা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়। খড়ের বিরাট ঘর, সামনে লম্বা বারান্দা—সেখানে খানকয়েক কাঠের চেয়ার, যোগেন্দ্রবাবু সেখানে বসে। তখন কি জানতাম সাহিত্য ও স্বাদেশিকতায় তাঁর স্থান কোথায়? বাবা জানতেন। তাঁদের যৌবনে হয়তো তাঁরা যোগেন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে ইনি ইতালিয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবুক ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী লেখেন বাংলায়। এসব কথা জানবার ও বুঝবার বয়স হয়নি। তবুও সেই মহাপুরুষকে দেখে ধন্য হয়েছিলাম—তা আজ মনে পড়ছে।

যশোহরের বাড়িতে মা, মাসি, দিদিমারা যোগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি সব আলোচনা করতেন—ছোট ছেলে হলেও কিছুটা বুঝতাম বৈকি। শুনতাম তাঁরা বলাবলি করছেন যে যোগেন্দ্রনাথ নাকি বিধবাবিবাহ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাল্লায় পড়ে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ছোট বিধবা মেয়েকে বিবাহ করেন।

সে যশোহর আজ বিদেশ। সেখানকার বাসিন্দারা, তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তাদের সঙ্গে দেখাশোনা হবার সম্ভাবনা কম। খোলা পথে যাওয়া-আসা নিষিদ্ধ; কিন্তু রাতভর চলে অ-পথে আনাগোনা, কিছু দক্ষিণা চেকপোস্টে এপারে-ওপারে দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

পার্টিশনের পূর্বে খুলনায় যাই—পথে যশোহর পার হই; তখন জানতাম না যে ঐসব স্থান একদিন 'বিদেশ' হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণের ঘরে যখন জন্মেছি তখন 'পৈতা' পরতেই হবে। পুরাকালে কর্ণবেধ চূড়াকরণ, উপনয়নাদি অনুষ্ঠান দ্বিজ সন্তানদের করতে হতো, একটা বয়সের মধ্যে। মেয়েদের যেমন আজকাল গৌরীদান হচ্ছে বিশ-পঁচিশ বৎসরে—উপনয়নের বয়স বেড়েই চলেছে—কলেজে পড়তে আসার পর দেখি একদিন অনিল চাটুজ্জে মাথা কামিয়ে কান ফুটিয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে এলো। আমাদের বয়স বাড়ছে। পঞ্জিকা দেখে দিন ঠিক হয় তো—ম্যালেরিয়া জ্বর আসে কেঁপে—মুলতুবী হয় শুভদিনে উপনয়নের আয়োজন। জ্বর ছাড়ে তো শুভদিন পাঁজিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। একটির পর একটি বাধা। শেষকালে বাবা বললেন, 'অত হাঙ্গামার দরকার নেই, কালীঘাটেই নিয়ে গিয়ে 'পৈতে' দেবো—একদিনেই সব হবে।' ব্রাহ্মণ সাজতেই হবে। শহরের মধ্যে ব্রাহ্মণদের যা নমুনা দেখতাম তাতে ব্রাহ্মণের

প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছুই হতো না, কেবল সংস্কারগত ভয় ছিল—ব্রাহ্মণ তো, কি জানি!

আমাদের শহরে প্রতিবেশী মুখুজ্জে পদবীধারী জনৈক ভদ্রলোক পাঁড়মাতাল—প্রতিরাত্রে লণ্ঠন হাতে যেতেন তাঁর জলপাত্রের বাড়ি—যার জন্য বড় সড়কের ধারে দোতলা বাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলেন। এখন শহরের যে পাড়ায় বাস করি সেখানে এক সৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঘর করতেন এক বিবাহিতা ডুম্বিনীর সঙ্গে। কিন্তু ভাল রাঁধুনী বলে প্রায় সকল হিন্দুবাড়ির বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি পুণ্যক্রিয়াকলাপে তার ডাক পড়তো। ডুম্বিনীর সঙ্গে বাস করেও তার ব্রহ্মণত্বের হানি হতো না। হিন্দু পাঁঠার দোকান, হিন্দু পানিপাঁড়ে। পেশা প্রবৃত্তি চরিত্র যাই হোক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেই সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকদের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা আদায় করেন পুরোপুরি। অন্য দৃশ্যও দেখেছি—গুরুবংশের গুরু-পুত্তুর এসেছেন—শীর্ণদেহ, কৃষ্ণকায়—'বার্ষিক' আদায়ের ভরসায়। দেশের বাড়িতে দেখি কাকা তাঁকে চার আনার একটা সিকি দিয়ে বিদায় করে দিলেন—বেচারা কত কাকুতি করলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি কবিতা মনে পড়ছে—

"ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়া-না মাথা কে আছে এমন হিন্দু
আমাদের কোন্ পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিন্ধু।
গিরি-গোবর্ধন ধরেছিল যে মেরেছিল রাজা কংসে,
তার বক্ষে লাথি মেরেছিল যে জন্মেছিল এই বংশে।
এখনও গলায়ে ঝুলায়ে রেখেছি এমনি ধুলাই পৈতে,
তোমরা মোদের সম্মান করবে সে-কথা আবার কৈতে।
যদিও করেছি চটির দোকান, ঠেলেছি বেড়ি ও হাতাটা,
টিকিটি শুধু বজায় রেখেছি, মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা।
চুপ করে যাই চাচার হোটেলে, খাই নিষিদ্ধ পক্ষী,
ভোরবেলা হলে গীতা নিয়ে বসি, বাবা বলে ছেলে লক্ষ্মী।"

সেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কলকাতায় যাই সবাই মিলে। কালীঘাটে যাঁদের বাড়ি উঠি, তাঁরা আমার মায়ের দ্বিতীয় বিমাতার দূর-সম্পর্কীয় কারা হন। সেই লতায়-পাতায় কুটুম্বিতার সূত্র ধরে আশ্রয় নিলাম দুইদিনের জন্য। তাঁরা কালী-ঘাটের বিরাট হালদারগোষ্ঠীর হয়তো তেষট্টিতম শরিক। কালীঘাটের মন্দিরের অদূরেই তাঁদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। আমরা দুই ভাই ঘুরছি—যদি কিছু পড়বার মতো বই পাই। সারা বাড়িতে ছাপা কাগজ চোখে পড়লো না—পেলাম একমাত্র সাহিত্যগ্রন্থ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। পঞ্জিকা, পঞ্জিকাই সই। তার ছবি

দেখি—পাতার পর পাতা। বিজ্ঞাপন সালসার—তা খেয়ে ক্ষীণকায় জরাজীর্ণ মানুষটি বলবান হয়ে সিংহের সঙ্গে লড়ছে। কোষ্ঠব্যাধির ঔষধ সেবন করে টিকিধারী ব্রাহ্মণ গাড়ু হাতে, গামছা পরে দাঁড়িয়ে, কী বাস্তব বিজ্ঞাপনপদ্ধতি! সুন্দরী কি একটা তৈল চুলে দিয়েছে—পা পর্যন্ত চুল এসেছে। পাঁজির ভিতরের ছবি দেখতে ভাল লাগতো—গঙ্গাস্নানের ছবি, মকরবাহিনী গঙ্গা, জামাইষষ্ঠী ইত্যাদি।

যথাসময়ে কালীঘাট মন্দিরের বাইরে এক চাতালের উপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপনয়নের সকল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। আজকাল কাগজেপত্রে পড়ি কালীঘাটে গিয়ে একটি বামুন ডেকে মালাবদল হলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চনমূল্যে সবই দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। কালীঘাটে বিবাহের অভিনয় করে ধূর্ত লোক কামান্ধ মেয়েদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছে। তারপরের বহু শোকাবহ ইতিহাস কাগজে পড়েছি।

মনে পড়ছে কয়েক বৎসর পূর্বে দেশের বাড়িতে ছোট কাকার 'পৈতা' হচ্ছে। 'শাস্ত্র'মতে কর্ণবেধ করে নাপিতে। এবং প্রথামতে তারপর একটি পক্ব কদলী নাপিতের মুখে দিতে হয় ভাবী ব্রাহ্মণ বটুকে। কাকার কান দিয়ে রক্ত পড়ছে। তিনি নাপিতের মুখে কলাটা ঠুসে দিতেই দুর্বল ম্যালেরিয়া-ভোগা নরসুন্দরটি মাটিতে চিৎ হয়ে গেলেন পড়ে। আমাদের কি উল্লাস! উপনয়ন তো হলো। তারপর তিনদিন শূদ্রের মুখদর্শন নিষেধ। বেচারা ছোটকাকা! তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে—আমরা দুই ভাই লুকিয়ে ঢুকি, কথা বলি, কেউ ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন বুঝেই সরে পড়ি। উপবীত হলে 'ভিক্ষাং দেহি' বলে ব্রহ্মচারীকে আত্মীয়দের কাছে ঘুরতে হয়—নবীন ব্রহ্মচারীর ঝুলির মধ্যে সবাই কিছু দান করে কৃতার্থ হতেন। আমাদের পৈতা কালীঘাটে হওয়ায় এই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরা হয়নি। আচারের আবর্জনা মেনে চলেছি অন্ধভাবে।

শহরে ফিরলাম মুণ্ডিত মস্তক, গলায় যজ্ঞোপবীত—যে উপবীত যজ্ঞের সময় ধারণ ছিল বিধি, তাই সর্বদাই ধারণ করা হয়েছে রীতি। নিষ্ঠার সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি অর্থ না বুঝেই। মনে করি মন্ত্র উচ্চারণ করলেই পুণ্য হবে। এখন দুটি দাসীর ছোঁয়া খেতে আর পারিনে। সে মাটিতে জল ছিটিয়ে, পিঁড়ি পেতে দেয়—পাচক ব্রাহ্মণ ভাত এনে দেয়। দুটি অস্পৃশ্য—সে যে সদ্‌গোপের মেয়ে; অথচ ক'দিন পূর্বেও ভাত মেখে দিয়ে হাঁসের ডিম, বকের ডিম সাজিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ছে পৈতার পর দেশের বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটিতে আছি। রান্নাঘরের

দাওয়ায় বসে খাচ্ছি—হেলান দিয়েছি খুঁটিতে। এমন সময় সেই খুঁটিতে হাত দিল কার্তিক—কী কথা বলতে বলতে। সর্বনাশ! 'ছুঁয়ে দিলি' বলেই খাওয়া ফেলে উঠতে হলো। কার্তিক আমাদের বয়সী, খেলার সাথী, আম কুড়ানো তাকে ছাড়া হয় না। তার অপরাধ সে কায়স্থ অতএব শূদ্র। লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থমতে বাংলা দেশে আছে মাত্র দুইটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের বাইরে বিরাট শূদ্র জনতা—তারা নানা স্তরে বিভক্ত, জল-চলনীয়, জল-অচলনীয় স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্মণই কি একটা জাত বা বর্ণ! মনে পড়ছে কাকার শ্রাদ্ধে 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রমতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। কিন্তু তার ভোজনব্যবস্থা হয়েছিল বারান্দার নিচের উঠানে। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বলে অগ্রদানীরা পতিত ব্রাহ্মণ। কিন্তু আজ অপ্রতিগ্রাহী কি জগতে কেউ আছে?

আমরা ছোটলোয় শুনি জসড়া গ্রামের জমিদার রাবণ বারণ মিত্র 'পৈতা' নিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক সারদাচরণ মিত্র কায়স্থদের 'পৈতা' দিয়ে 'ক্ষত্রিয়' করার আন্দোলনের জনক। কিন্তু আন্দোলন দেশব্যাপী হলো না —কারণ কায়স্থদের মধ্যেই তো অসংখ্য ভাগ। বাংলাদেশের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে প্রতি দশকে জনগণনার সময়ে 'নবশাখ'দের জনসংখ্যা কমছে আর কায়স্থদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। রাজপুতানার 'ক্ষত্রিয়'রা বাংলা দেশের প্রত্যন্তবাসী কোচ্ ও টিপ্রা ক্ষত্রিয় বলে গ্রহণ করে নেন। কিন্তু বাংলা দেশের নূতন 'ক্ষত্রিয়'দের কেউ স্বীকৃতি দিল না। 'কায়স্থ' উত্তর-ভারতের লেখক জাতকে বুঝাত—এলাহাবাদের নামকরা কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যাক সে কথা। বোধ হয় কায়স্থদের মধ্যে উপবীত ধারণ করে 'ক্ষত্রিয়' হবার আন্দোলন থেকে একে একে বহুবর্ণের মধ্যে উন্নততর বর্ণে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। তাই উগ্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কত বর্ণই হলো। সংবাদপত্র খুলে প্রায়ই দেখা যায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট করে নামের হীনত্বসূচক পদবীর পরিবর্তন দাবী করেছে।

বাংলাদেশে বৈদ্যরা দাবী করলেন তারা ব্রাহ্মণ—অর্বাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করে প্রমাণ দিলেন। কিন্তু মুশকিল হলো বৈদ্যদের মধ্যেও ভাগাভাগি ছিল যথেষ্ট। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে বৈদ্যদের সঙ্গে স্থানীয় কায়স্থদের বিবাহ হতো—কারণ বৈদ্য সেখানে সংখ্যালঘু। কিন্তু বিক্রমপুরের বৈদ্যরা এই দুই জেলার বৈদ্যদের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপ করতে রাজী হলেন না। তাঁদের চোখে এঁরা নিকৃষ্ট বৈদ্য। এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যদের আবার পূর্ববঙ্গের খাস

বৈদ্যদের সঙ্গেও বিবাহাদি হতো না। কলকাতার 'আয়ুর্বেদ' নামে এক কাগজে পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্যদের সঙ্গে কোনো পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় কী তীব্র নিন্দার বিষ উদ্‌গীরণ করেছিলেন! জাত জাত জাত নিয়ে সবাই উত্তেজিত। 'জাতে ওঠা' শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে—তেমনি আছে 'জাতে ঠেলা' 'জাত মারা' 'জাত যাওয়া' শব্দ। হিন্দুসমাজে জাত যাওয়া যত সহজ ছিল, জাতে ওঠা তত সহজ ছিল না। প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণদের 'আচার্য' পদবী দিয়েছিলাম—পীরালি ব্রাহ্মণদের 'ঠাকুর' পদবীতে ভূষিত করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা অচল থেকে গেলেন ব্রাহ্মণসমাজে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ উপাধি ছিল আচার্য উপাধ্যায়—তারাই মান হারালো তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের কাছে।

বাবার এক অদ্ভুত সাহেব মক্কেল প্রায়ই শহরে ঘোড়ারগাড়ি থেকে টলতে টলতে নামতেন। শুনতাম তিনি বেগলার সাহেব। দেশের বাড়িতে যাবার পর বেগলার পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয় সবারই। চাকদহ স্টেশন থেকে খানিকটা গেলেই পেতাম একটা বিরাট ঝিল। বোধ হয় সেটা কাটা হয় ইটের জন্য। ঝিলের ধারে কত রকমের গাছ, কত জাতের বাঁশ। দৃশ্যটা খুব মনকে টানতো। যেতে যেতেই ছুটো পাকা বাড়ি দেখা যেতো। সামনের বাড়িটা সাহেবের লাইব্রেরী—ইংরেজি বই ঠাসা। কিছুই বুঝিনে সেসবের মূল্য। দাদা সেখান থেকে বই আনতেন। মনে আছে একটা বই পড়ে ছোট একটা উপন্যাসই লিখে ফেললেন। তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। দাদার এক বন্ধু সেটা কপি করে সুন্দর ভাবে বাঁধিয়ে দেন। বেগলার-এর ছুই মেয়ে থাকতেন—একজন কুমারী। বড় বোনের একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল। আমরা গেলে বিলাতী কায়দায় মেয়েটি কাছে এসে গালে চুমো দিত। আমি এ আদর সহ্য করতে পারতাম না। তবে নীরবে সহ্য করতেই হতো। এঁরা আমাদের গ্রামের নূতন বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। বাংলাদেশে আর্মানীরা বংশপরম্পরায় আছে বলে বাংলা বলতে পারতেন, তাই মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা জমতো। বেগলার-এর পতন হলো এক নীচজাতীয়া মেয়েকে বিয়ে করার পর। মিশ্ কালো মেম গাউন পরে ঘুরে বেড়ান। আর দেখি তাঁর পুত্র যোসেফকে—মায়েরই পুত্র বটে। সে ঝিলের ধারে প্যাণ্টে হাত ভরে ঘুরে বেড়ায়; আমাদের আসা-যাওয়া চোখেই পড়ে না তার। এর কারণ আমরা বাঙালী, আর সে সাহেব। বঙ্কিমের লোকরহস্যের একটা দৃশ্য মনে পড়ছে—'হামি সাহেব আছে'।

বেগলার সাহেব ছিলেন আর্মানী খৃষ্টান। এককালে বাংলাদেশে বহু আর্মানী

ছিল তার প্রমাণ কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদে আর্মানী চার্চ, আর্মানীটোলা নাম। মোগল সম্রাট আকবরের এক স্ত্রী ছিলেন আর্মানী। দেশ ছাড়ার পর আর বেগলার-এর খোঁজখবর রাখিনি। বহুদিন পরে কলকাতায় যখন পড়ি, তখন পুরাতন বইয়ের দোকানে J. D. M. Beglar-এর নাম সহি করা Smith's Classical Dictionary বিক্রীর জন্য পড়ে আছে দেখেছিলাম। দেশে বেড়াতে গিয়ে একবার বেগলার-এর বাড়ি দেখতে যাই। সব নিশ্চিহ্ন—মনে পড়লো কত বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলাম বাগানের মধ্যে, কত পুরাতন কারুকার্য করা পাথর। শুনেছি সেসব সরকার অন্যত্র নিয়ে গেছেন।

বেগলার-এর নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সঙ্গে। বয়স বাড়লে পড়াশুনা করতে করতে জানতে পারি বেগলার কে ছিলেন ও কি করে গেছেন ভারতের প্রত্নতত্ত্বের জন্য। ব্রিটিশ সরকার প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ খোলেন—কানিংহাম সাহেব ঐ বিভাগের পরিচালক (১৮৭০-৮৫)-রূপে ভারতের নানাস্থানের প্রাচীন কীর্তি রক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। বোধ হয় বহুনিন্দিত বড়লাট লর্ড লীটন এর প্রবর্তক—লীটনের পিতা বুলার লীটন Last days of Pompei লিখে অমর হয়েছিলেন। তিনি পম্পাই নগরে খননকার্য দেখেন; বোধ হয় পুত্র তাই ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের জন্য এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত বলি, আর একজন কুখ্যাত ইংরেজ ভারতের বড়লাট হয়ে এসে এই বিভাগ পুনরায় খোলেন মার্শেল সাহেবকে তার অধ্যক্ষ করে। মার্শেল বোধ হয় কার্জনের সহপাঠী ছিলেন, তাই সাময়িক ভারতীয় কাগজে কার্জনকে ধিক্কৃত করবার এই একটা তথ্য তাঁরা পেয়েছিলেন। সত্য কথা বলতে কি, ভারতের প্রাচীন কীর্তি সমস্তই লুপ্ত হয়ে যেতো যদি কানিংহাম ও মার্শেল নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ না করতেন। কোনো আইন না থাকায় হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন পাঞ্জাবের রেলওয়ে কনট্রাক্টররা।

বেগলার সাহেব ছিলেন কানিংহামের সহকারী। তিনি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি সংগ্রহ করে মন্দিরের মূল রূপটি গড়ে দেন। পূর্বে এ রূপ ছিল না। বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রবেশমুখের উপর একটি ফলকে বেগলারের নাম খোদিত দেখেছি। মহাকালের স্পর্শে বেগলারের নাম মুছে গেছে চাকদহ থেকে। যখন দেখতে যাই বর্তমান কালের নূতন বাসিন্দাদের কাছে বেগলারের নাম অজ্ঞাত, বেগলারকে সবাই ভুলেছে, তবুও যারা বুদ্ধগয়া মন্দির পরিদর্শনে যাবেন তাঁরা যেন একবার মন্দিরফলকে খোদিত বেগলার নাম দেখে স্বল্পক্ষণের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

প্রসঙ্গত এখানে একটি অবান্তর বিষয়ের স্বল্পাভাস দিচ্ছি। কানিংহামের ২৩ খণ্ড প্রত্নবিভাগের প্রতিবেদনের বিস্তারিত সূচী ও নির্দেশিকা সংকলন করেন তরুণ সিভিলিয়ান ভিনসেন্ট স্মিথ। এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে Early history of India গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়েছিল এবং পরে ভারতের শিল্পস্থাপত্য সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থ লিখতে পেরেছিলেন। কানিংহাম সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন চাকদহের বেগলার সাহেব।

আমাদের চাকদহ রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার বিনোদবাবু এক ফৌজদারী মামলায় পড়ে 'সাসপেণ্ড' হলেন। কী অপরাধ সে সব কিছু শুনিনি। অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারিনি। বিনোদবাবুকে সবাই খুব ভালবাসতো —অত্যন্ত অমায়িক, ভদ্র। সেকালের চাকদহ স্টেশনে আঙুলে গোনা ডেলি প্যাসেঞ্জার ওঠা-নামা করতেন—সবারই নির্দিষ্ট ট্রেন ছিল যাওয়া-আসার, সবারই মান্থলি টিকিট। চাকদহ ও তার আশেপাশে আজ বহু-বিস্তারিত জনপদ গড়ে উঠেছে। পাকা সড়ক, বিজলিবাতি জ্বলছে। রিকশ, ট্যাক্সি, মোটরকার চলছে। ফোন বাজছে। মনে পড়ছে ১৯৪১ সালে পাবনায় এক সভার পর ফিরছি। নামলাম চাকদহে পিতা-পুত্রে। পৈতৃক গ্রাম ও গৃহ দেখবো বলে। জনশূন্য প্রান্তর দিয়ে গেছি—ফিরছি অন্ধকারে পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে জলে ভিজতে ভিজতে। জনমানব পথে দেখা যেতো না। সেই deserted village ধনে-জনে পূর্ণ হলো জিন্না সাহেবের ম্যাজিকদণ্ডের স্পর্শে। দেশ ভাগ হলো—দলে দলে লোক এলো; জনহীন অরণ্যসঙ্কুল স্থানে জনপদ গড়ে তুললো।

জনহীন চাকদহে বিনোদবাবু থাকতেন সপরিবারে প্ল্যাটফর্মের উপর একটি কোয়ার্টারে। পরিবারের মধ্যে এক পুত্র—সে কলকাতায় কাজ করে; যায় আসে। আমরা দেশের বাড়ি থেকে রাণাঘাটে ফেরবার সময়ে তাঁদের ঘরেই বিশ্রাম করতাম। ওয়েটিং রুম ছিল, কিন্তু বিনোদবাবু নিয়ে যেতেন তাঁর কোয়ার্টারে। বিনোদবাবুর স্ত্রী সারাদিন একা একা থাকেন—সঙ্গী নেই কথা বলবার। মা ও আমরা গেলে খুব খুশি হন তিনি। হঠাৎ শুনি বিনোদবাবু কী এক অপরাধে 'সাসপেণ্ড' হয়েছেন। কাজ করতে পারবেন না—তবে জীবনধারণের জন্য কিছু টাকা পাবেন।

মামলা রাণাঘাটের ফৌজদারী আদালতে হচ্ছে। সরকারী উকিল বাবার বন্ধু অক্ষয় মৈত্র আসেন কৃষ্ণনগর থেকে—ওঠেন আমাদের বাসাতেই। মা তাঁর জন্য খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করেন। এসব দেখে আমরা বিরক্ত হই—বলি,

'বিনোদবাবুকে জেল দেবার জন্য আসছেন—তাঁর এতো খাতির কেন!'

রেলে, আদালতে, পুলিসে ও সরকারী অফিসে যুধিষ্ঠিররা নিশ্চয়ই কাজ করে না। ঘুষ খায় একজন—আর ঘুষ দেয় দশজন। ঘুষ যারা দেয় তারা বিভাগীয় বিধিনিষেধের বেড়া সহজে টপকাবার জন্য বা কাজকে ত্বরান্বিত করবার জন্য স্বল্পপ্রাণ, স্বল্পবিত্ত কেরানীদের প্ররোচিত করে; অধিকাংশেরই অভাবের সংসার। ফলে ঘুষ পেতে পেতে উপরি পাওয়াটা স্বভাবে এসে যায়। তখন তাদের অভাবও বাড়ে, খাঁকও বাড়ে—দম্ভও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

যারা রক্ষা করতো সেই পুলিসের বদনাম সুপরিচিত। রেলওয়ে কর্মচারীদের সুনাম ছিল না। আদালতের কেরানীকুলের অপবাদ প্রবাদগত। এখন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে Anti-corruption Squad-এর কাণ্ড-কারখানা। তবে দেখা যায় যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঘুষ দেওয়া-দেয়ি চলে—'এ রাজ্য তুমি নাও, ও জায়গীর আমায় দাও।' কিন্তু ঘুষের খাঁক বেড়ে যায়—Munich pact করেও যখন শান্তি এলো না তখনই ঘুষের স্থলে 'ঘুষি' বর্ষণ শুরু হলো। দুনিয়াটা চলছে এই ঘুষো-ঘুষির আবর্তে। যতদিন সম্ভব তোষণ চলে—তারপরেই শুরু হয় পেষণ। কেউ যে আজ যুদ্ধে নামছে না তা শান্তিকামী বলে নয়—ভাবী যুদ্ধের মহা প্রলয়ঙ্করী রূপের কথা ভেবেই।

আমার এক পরিচিত বন্ধু বি. এ পড়তে পড়তে রেলে কাজ পান—অবশ্য বহু বৎসর পূর্বে। বৎসরখানেকের পরে স্টেশন মাস্টার তরুণ কর্মীর হাতে একটা বন্ধ খাম দিলেন। খাম খুলে দেখেন দু'শো টাকার দুখানা নোট। নূতন কর্মী হকচকিয়ে গেলেন—ব্যাপার বুঝতে পারেন না। হাড়পাকা স্টেশন মাস্টার বললেন, 'ওটা আপনার ভাগের প্রাপ্য। কাজ করতে করতে ক'বছরের মধ্যেই সবই বুঝতে পারবেন।' পরে তিনি বুঝতে পারেন এবং বিজ্ঞ হয়েই অবসর গ্রহণ করেন। বড় স্টেশন যেখানে মালগাড়ি খালাস হয়, ভরতি হয়—সেই রকম একটা স্টেশনে বদলি হয়ে আসবার জন্য যথাযথস্থানে কী পরিমাণ তদ্বির করতে হয় তা তো প্রবাদগত। যুদ্ধোত্তরপর্বে হাওড়া স্টেশনে একটা মালগাড়ি (wagon) পাবার পারমিট বা ছাড়পত্র যিনি দিতেন, তাঁর কথা অনেকেরই জানা। আসলে 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা'। উপরতলা থেকে নিচেরতলা পর্যন্ত সমস্ত কর্মীর মধ্যে চোখ-টেপাটেপি থাকলে সবাই চুপ করে থাকবে—ভাগ পাবে জানে।

সিমেণ্ট 'কনট্রোল' কড়াভাবে চলেছে—অথচ দেখছি বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। শহরে সরকারী বিশেষ বিভাগ আছে চোরাকারবারী তল্লাস করবার জন্য—তাঁরা

কি করেন ? নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বলি। এক ভাড়াটে এলেন। তিনি এই বিভাগের দারোগা। পরিচয় হলে বললাম, 'পুঁটিমাছ ধরবেন তো রুই-কাতলা ঠিক ফসলে যাবে।' বললেন, 'দেখবেন আমাকে।' দেখলাম সেটা একদিন। রেড-ইঙ্ক নিব বিক্রীর দাম বুঝি ছিল দু পয়সা—এক বেচারা দোকানী বেশী দামে বিক্রী করার অপরাধে চালান হয়ে গেল। আর একদিন ঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময় গোপাল আঁকুড়ি কেঁদে এসে বললে, থানায় তাকে ধরে নিয়ে সিউড়ি চালান দিচ্ছে। ব্যাপারটা শুনলাম। কলকাতার এক ধনীর দুলাল গ্রামে আছেন শিল্প উন্নয়ন কাজ নিয়ে। একদিন তাঁর এক মোসাহেব জনৈক প্রাক্তন কংগ্রেসী-কর্মী সন্ধ্যার সময়ে গোপালের কাছে এসে বলেন, 'সাহেব আসবেন, রান্নার জন্য কয়লা চাই।' বেচারা গোপাল গাড়িঝাড়া কয়লা কিছু জমিয়ে রাখে—সের দশ হলো কোনো রকমে—দাম নিল এক টাকা। গরীব গোপাল বুঝতে পারলে না যে সেটা সহি-করা নোট। কয়েক মিনিট পরে সেই দুর্নীতি-নিবারক পুলিস কর্মচারী এসে হাজির—থানাতল্লাসী করে সেই নোট বের করলেন। বিশেষ তল্লাসী করতে হলো না, কারণ বস্তার নিচে ঐ একটাই নোট ছিল—আর কয়েকটা পয়সা। সুতরাং সে কয়লা বেশী দামে বিক্রী করে black market করছে। সেই অপরাধী সিউড়ি চালান হলো গোপাল। সে রাতে কলকাতার ধনীর দুলাল ও রাজকর্মচারী নিষিদ্ধ পক্ষীমাংস সানন্দে ভোজন করলেন। অপর দিকে সিউড়িতে মহামতি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট পনেরো টাকা জরিমানা করলেন গোপালের। আমার কাছে গোপাল কেঁদে এসে কাহিনীটা বলেছিল। খুব সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনাটুকু বলি। ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাই। বুঝিয়ে বললাম—গ্রামে থাকতে হলে গ্রামের লোকের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে থাকতে হবে। তাঁকেই শেষ পর্যন্ত জরিমানার টাকাটা দিতে হলো। এই শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী জনসেবা করতে আসেন। এই শ্রেণী-ভদ্রেরা আসেন গ্রামের শিল্পোন্নতি করতে।

সমাজ কী ভাবে কর্মচারীদের প্ররোচিত করে, তার একটা কাহিনী বলি। আমাদের দূরসম্পর্কীয় এক কুটুম্ব পুলিসের দারোগা। তখন তিনি থাকেন উত্তর-বঙ্গের এক থানায়। কোথায় কোন্ ধনীগৃহে একটি বিধবা বধূ অন্তঃস্বত্বা হয়ে 'আত্মহত্যা' করে। পুলিসই সেটা খুন বলে জমিদারকে চালান দিতে পারে, পুলিসই সেটা আত্মহত্যা বলে সাফাই করতে পারে। সবই নির্ভর করছে তাঁর রিপোর্টের উপর। হঠাৎ গভীর রাতে জমিদারের ঘর থেকে লোক এলো দুই বালতি ভরা রূপোর টাকা নিয়ে—মামলাটা 'হাস্-আপ' করবার প্রস্তাব এলো।

ষাট টাকা মাহিনার দারোগা—পাঁচ-সাতটি অবিবাহিতা কন্যা। দারোগাকে বালতি ঘরে নিয়ে যেতেই হলো।

ঘুষ খায় একজন, দেয় দশজন। মনে পড়ছে সিন্ধুর কথা। সদ্‌গোপের মেয়ে। ঘরে বিবাহিত মেয়ে রেখে 'বের' হয়ে আসে। তারপর যা হয় তাই ঘটেছিল। পুরুষের গায়ে তো কলঙ্কের দাগ লাগে না। সে ফিরে গেল আপন গাঁয়ে-সমাজে, কোনো কথাই উঠলো না—সে যে পুরুষ! মেয়েটা দাসীগিরি করে। অবশেষে গ্রামের লোকে অত্যাচার শুরু করলে সে মুসলমানকে বিবাহ করবে বলে ঠিক করলো। সেই মুসলমানটি আমারই পরিচিত। আমি সিন্ধুকে ডেকে পাঠাই। সে এসে কেঁদে বললে, 'বাবু, গাঁয়ের লোক বলছে আমার নামে ট্যাক্স ধরাবে—অর্থাৎ 'বেশ্যা' বলে পুলিস থেকে ঘোষণা করাবে।' আমি পরে গ্রামের কয়েকজন হিন্দুকে বলি ব্যাপারটা। তাঁদের একজন বললেন, 'মেয়েটা খারাপ বড়।' আমি তাঁকে শুধিয়েছিলাম, 'একটা খারাপ মেয়ের পিছনে কতগুলি খারাপ পুরুষ থাকে বলো, তাদের কী হয়?' সুতরাং ঘুষ খায় একজন, দেয় দশজন—সমাজে তাদের কেউ দেখতে পায় না।

বিনোদবাবু বেকসুর খালাস পেলেন। তাঁর ছেলে একদিন আমাদের বাড়ি এসে মা'র কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—'মাসিমা, বাবা খালাস পেয়েছেন।' বাপের কলঙ্ক মুছে যেতে ছেলের কী আনন্দ! তার সেই উত্তেজিত দীপ্ত মুখটি এখনো মনে আছে। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ সময়ে দেখেছি শহরে চোদ্দ ক্যারেট সোনা দিয়ে কে কত গয়না করছেন! বিশিষ্ট ভদ্রলোক, মেয়ের বিয়ে—গিনী সোনার অলঙ্কার করালেন পুরোপুরি। বেচারী স্বর্ণকার দোকানে বসে চোদ্দ ক্যারেট নিয়ে ঠুকঠাক করে, ভিতরে গিনী সোনার কাজ চলে, কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দেয়, মাসকাবারী দক্ষিণাটা পৌছয় যথাস্থানে, যথাসময়ে।

দুনিয়াটা বোঝে দুটো জিনিস— ঘুষ ও ঘুষি। ঘুষ দিয়ে তোষণনীতি করে, যতদিন অধর্মকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। তারপরই ঘুষি। এই জোয়ার-ভাঁটা চলছে অনাদিকাল থেকে।

সেদিন অঝোর বৃষ্টিধারা চলছে। কাঁচের জানালা বন্ধ করে লাইব্রেরী ঘরে বসে আছি বিজলি বাতি জেলে। এমন সময়ে শ্রীমতী গরম চা ও সাবুর পাঁপড়ভাজা নিয়ে হাজির। আমায় চা দিয়ে নিজে বেশ গুছিয়ে বসলেন একটা বেতের চেয়ারে। বুঝলাম হাতে কোনো কাজ বা অকাজ খুঁজে পাচ্ছেন না বর্ষার জন্য। তাই গল্প করার জন্য এই শুভ আগমন। আমি বললাম, 'মনে পড়ছে একটা গান —গাইবে?'

'এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়'

গৃহিণী প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়েছেন—এখন তিনি ঘোর বস্তুবাদী, যা এই বয়সে নারীরা হয়ে থাকেন। তাই বললেন, 'এ কি আর এ বয়সের গান।'

আমি বললাম—

'সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুখি
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর।'

শ্রীমতী হেসে ফেললেন। বললেন, 'এমনি বরষায় কোনো দিনের কথা শুনতে শুনতে, সেই না-দেখা যুগের মধ্যে চলে যাই। তোমার গল্পের মধ্যে দিয়ে অতীতকে দেখি।

শেষ বর্ষণ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছে কয়দিন ধরে। আকাশের কলঘরের চাবি যেন হারিয়ে গিয়েছে—বর্ষণধারা বন্ধ কেউ করতে পারছে না। শহরের রাস্তার উপর দিয়ে জল চলেছে, ড্রেন বা নর্দমা ছাপিয়ে গিয়েছে কখন। বৃষ্টি যখন অল্প ছিল, ড্রেন দিয়ে জল যখন চলছিল সে সময়ে আমরা দুই ভাই কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিতাম।

বাড়িতে ঢোকার মুখের সাঁকোর তলা দিয়ে যদি নৌকা অক্ষত দেহে পেরিয়ে যেতো, তবে আমাদের সে কি উল্লাস! কিন্তু আজ সব এলাকার ড্রেন রাস্তা অভিন্ন হয়ে গেছে—প্রবল স্রোত চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে। হঠাৎ দুড়দাড় শব্দ। বারান্দায় গিয়ে দেখি রাস্তার উপরে হরি ভশ্‌চাজির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সেটা হরি ঠাকুরের পুজার-ঘর—পরিবার থাকতো ভিতরদিকে। আর বাড়ির লোক তো দুটি—হরি ঠাকুর ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এরা নিঃসন্তান। ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা ছিল—যেমন আজও দেখি পাড়ার ছেলেমেয়েরা আসে কুল, পেয়ারা, আম-জামের সন্ধানে। হরিঠাকুরের স্ত্রীকে কাকীমা বলতাম। সেটাই ছিল সেকালের রেওয়াজ—অনাত্মীয়কে আত্মীয়বোধে ডাকা। খিড়কিতে গেলেই কাকীমা দরজা খুলে সযত্নে ফল পেড়ে দিতেন। মাঝে মাঝে দেখতাম খিড়কির দরজা খুলে দিচ্ছেন বিনু ঘোষালের ভাইপো—আমাদের পড়শি। কানাঘুষো যা শুনতাম তার অর্থ তখন বুঝতাম না।

হরিঠাকুরের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ছিল। সন্ধ্যার সময়ে শুনতে পেতাম আরতির ঘণ্টা ও শাঁখের শব্দ। আমাদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে পূজা দেওয়ার জন্য একঠোঙা বাতাসা ও চারটে পয়সা দক্ষিণা নিয়ে যেতাম। হরিঠাকুর কয়েকটি বাতাসা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বারকোশে (কাঠের থালা) রেখে ঠোঙার উপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিতেন। পয়সা চারটে সামনের পিতলের থালায় দিতাম। বাড়ি ফিরে সেই বাতাসার হরিলুট হতো। পাড়ার ছেলেরা আসে হরিলুট কুড়োতে। সেজকাকা সেই বাতাসা নিয়ে 'হরিবোল' বলে উপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন—মাটিতে পড়তেই সবাই কুড়িয়ে নিত। ধুলোয় পড়ছে! তাতে কি? হরিলুটের বাতাসা তো। সবাই মাথায় ছুঁয়েই মুখের মধ্যে ভরে। আজ হাত ধোও ডেটল দিয়ে বা পিয়ার্স সাবান দিয়ে তবে খেতে পাবে; কিন্তু ধুলোয় পড়া বাতাসা? অসম্ভব। এত বাঁধাবাঁধির মধ্যে মানুষ হচ্ছে যারা, ডাক্তার তাদের বাড়িতে নিত্য আসেন—ছেলেমেয়েদের সর্দিকাসি আর সারে না। গায়ে কতো জামা-সোয়েটার। আর ঝিয়ের ছেলেমেয়েগুলো কী খাচ্ছে! কী পরছে! ধুলোয় লুটুচ্ছে—রোদে দৌড়াচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। খালি গা, খালি পা। নবীন ডাক্তার এসে বললেন, 'অত খুঁত-খুঁত করবেন না, সহ্যশক্তি বাড়তে দিন।' শিক্ষিতা (?) মাতারা সে পরামর্শ মানতে পারেন না, ছেলেমেয়েদের ভোগান্তির শেষ হয় না। বয়স হলে তারা সভ্যতার শিকল ছিঁড়ে হয়ে ওঠে হিপ্‌পী বা হ্যাভিস্ট—সব সমাজ স্বাস্থ্য বন্ধন ছেঁড়া উদ্‌ভ্রান্ত জনতা।

বর্ষাশেষে হরিঠাকুরের বাড়িটা নূতন করে তৈরী হলো। দেখা গেল নূতন প্ল্যানে একটা ফলন্ত নারকেল গাছ পড়ছে বারান্দার মাঝে। গাছটা কাটা হলো না, ঘরের পাশে বারান্দাতেই থেকে গেল। একটা নারকেল গাছ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ফল দেয়। সে গাছ কি কাটা যায়!

মনে পড়ছে, ভাগ্নেয়ীর বিয়েতে গেছি যাদবপুরে। একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে রেলের ওপারে হোগলাবনের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এসে পড়লাম নস্কর ঝিলের কাছে। চারদিকে নারকেল গাছ—অগুন্তি। বনের মধ্যে হোগলার পাতার ছাউনি, কারা বসে আছে। পরিচয় করলাম। তারা বললে তারা নারকেলের 'তাড়ি' করবার জন্য গাছ কাটে। তাদের কথা শুনে মনে হলো, তারা বাঙালী তো নয়ই, এমন কি হিন্দীভাষীও নয়। তারা বললে যে তারা খৃষ্টান—তাদের বাড়ি কেরালায়। হিন্দু বা মুসলমানরা তাল খেজুর গাছ কাটিয়ে রস বের করে 'তাড়ি' বানায়। কিন্তু তারা নারকেল গাছ কিছুতেই

কাটবে না। আমরা নারকেল গাছ কেটে তাড়ি করি বলে আমাদের মাইনেও বেশি। নারকেলের তাড়ি খুব ভাল খেতে। যাদবপুর স্টেশনে পাসিদের দেখি এই তাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। বললে, বালিগঞ্জে নিয়ে যাবে তাড়িখানায়। আমি শুধোই, 'কারা খায় ?' তারা হেসে বললে, 'অনেক ভদ্রলোকেও খায় এই নারকেলের তাড়ি।' এ এক নূতন অভিজ্ঞতা।

দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ছে। কত নারকেল গাছ ছিল। কয়েকটা গাছে বাবুই পাখীর বাসা ঝুলতো। জানি না আজ তাদের বংশধররা তেমনিভাবে বাসা তৈরী করে বাস করছে কিনা। পাখীর মধ্যে বাবুই ও জন্তুর মধ্যে বীবর হচ্ছে সেরা ইঞ্জিনীয়ার। এখন আমার ঘরে বাবুই পাখীর একটা বাসা রেখেছি। পুরনো দিনের কথা স্মরণ করায়—সেই গ্রামের বাড়ির কথা।

নারকেল গাছের বেগলোর উপর বসে খেলা ছিল খুব মজার—যাঁরা না বসেছেন তাঁরা বুঝবেন না। গোড়ার দিকে বসে লম্বা পাতা লাগাম করে ধরতাম। দাদা বা খেলার সঙ্গী চুন্নরী পদা, কখনো বাড়ির ছোকরা চাকর কার্তিক টানে বেগলোর গাড়ি। সে কী ড্রাইভ্! দুপুরে দেখতাম দুটি ঝি আমাদের লাগাম সব ছিঁড়তে বসেছে বঁটি নিয়ে। লাগাম পাতা কেটে কেটে বের করছে লম্বা লম্বা কাঠি—যা দিয়ে বাঁধা হতো ঝাঁটা; সংসারের জন্য 'ঝাঁটা' কিনতে হতো না—ঘরের জন্য, উঠোনের জন্য, রান্নাঘরের জন্য, গোয়ালের জন্য ঝাঁটার দরকার। এ ছাড়া এই নারকেলের পাতার কাঠি দিয়ে মুড়ি, চিঁড়ে, খই ভাজা হতো। উনুনে যেতো কাটা পাতা রাশি। এ সবই গ্রাম্য অর্থনীতি—যাকে আমরা অবজ্ঞা করছি 'মডার্ণ' নয় বলে। নারকেল কুরে মা গুড় দিয়ে নাড়ু করে রাখতেন—জলখাবারের নিত্য জোগান। সেসব দিনের কথা স্বপ্নের মতো মনের উপর দিয়ে ভেসে যায়। এখন গ্রামগুলি না-ঘরকা, না-ঘাটকা—পুরোপুরি Urbanised বা শহুরে হয়নি, আর গ্রাম্য অর্থনীতি—তাও ভেঙে গিয়েছে। কুটীরশিল্প ধ্বংস হয়েছে, এখন Small Industries হচ্ছে অর্থাৎ ক্ষুদে বণিকরা কুটীরশিল্পকে গ্রাস করছে। যন্ত্রযুগ—যন্ত্র ছাড়া কোনো কাজ হয় না—খুবই সত্য কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, অতি-যান্ত্রিকতা কি মানুষের আর্থিক সমস্যা নিরাকৃত করতে পারছে ? মুষ্টিমেয়ের দল সুখ পেতে পারে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে কি তারা ? ধন বন্টনের উৎকট অসাম্য শ্রম সমস্যাকে কি দিন দিন তীব্র করে তুলছে না ?

বাড়িতে 'জন্মভূমি' নামে মাসিকপত্রের পুরাতন একটা বাঁধানো খণ্ড ছিল। বোধ হয় প্রথম বর্ষেরই হবে। মনে পড়ছে কাঠের খোদাই ছাপা ছবির কথা—

ছোটনাগপুরে সোনাচুর ধুচ্ছে আদিবাসী মেয়েরা। সব থেকে বেশি করে মনে পড়ছে বন্দী বীর টিকেন্দ্রজিৎকে—হাতকড়ি বাঁধা, দু'পাশে দাঁড়িয়ে সঙীন-আঁটা বন্দুক নিয়ে দুই গোরা সৈন্য অর্থাৎ ইংরেজ।

গল্প শুনতাম বাবা ও কাকাদের কাছে মণিপুরের কাহিনী। মণিপুর স্বাধীন রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা নাগাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ যুদ্ধাভিযানে সহায় হয়েছিলেন। নাগা ও মণিপুরীদের মধ্যে উপজাতীয় বিদ্বেষ বহুকালের হলেও মণিপুরী জনতা ব্রিটিশকে সহায়তা দানের পক্ষপাতী ছিল না। ফলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় ১৮৯০ সালে। বশংবদ রাজা সুরচন্দ্রকে লোকে তাড়ালে দেশ থেকে। রাজা করলো কুলচন্দ্রকে ও যুবরাজ করলো টিকেন্দ্রজিৎকে। এঁরা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করলো না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির সহায়তা দান করতে চাইলেন না। তারই ফলে ব্রিটিশের 'যুদ্ধং দেহি' রব। শুনতাম মণিপুরীরা বৈষ্ণব, তাই ইংরেজ যখন মণিপুর আক্রমণ করলো তখন সৈন্যদলের সম্মুখে রসদ-পত্রবাহী গো-শকট দেখে তারা আর যুদ্ধ করতে পারে না--যুদ্ধ করতে গিয়ে গোহত্যা করবে! ইংরেজরা অনায়াসে মণিপুর জয় করলো আর বিপ্লবের নায়ক সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। এই কাহিনী মনকে খুবই নাড়া দেয়। তাই মাঝে মাঝে বন্দীবীর টিকেন্দ্রজিতের ছবিটা দেখতাম—আজও দেখতে পাচ্ছি সেই যুবককে।

গত সাত দশকে সেই দেশের কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা বৈষ্ণব এটা ভাল করে জানতে পারি অনেক পরে—যেদিন মণিপুরী মালি এসে লাইব্রেরীতে আমার কাছ থেকে চৈতন্যচরিতামৃত চাইলো পড়বার জন্য। অবাক হয়েছিলাম বাংলা বই চাইতে দেখে। মালি বললে, বাংলা বৈষ্ণব বইয়ে তাদের ধর্মের কথা আছে। জানলাম তাদের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু লিপি বাংলা। আজও তারা মণিপুরী ভাষা লেখে বাংলা লিপির সাহায্যে।

বয়স তখন বছর সাত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বাড়িতে আসে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা—একটা বিরাট কাগজ, মাত্র চার পৃষ্ঠার। সেটা পড়ি, ছবি দেখি আর ব্যাপারটা শুনি বড়দের কাছ থেকে। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার—লম্বা দাড়ি, চাবাড়ে চেহারা। তাঁর পৌত্র—তার হাতে বন্দুক। গল্প শুনি একটি টোটা নিয়ে যায় শিকার করতে, একটি হরিণ মেরে আনে জঙ্গল থেকে। গরীব চাষী এরা—টোটা পাবে কোথায়? দেশে তো তৈরী হয় না। ইংরেজ চায় বুয়রদের হীরের খনিগুলো। তাই ছুতো খুঁজে

যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। কিন্তু ইংরেজ পেরে উঠছে না এই চাষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে। ইংরেজ সৈন্যদের ঘিরে রেখেছে তিনটে জায়গায়—লেডিস্মিথ, কিম্বারলি ও ম্যাফেকিঙে। লেডিস্মিথে ইংরেজ সেনাপতি হোইট্ সসৈন্যে অবরুদ্ধ। ইংরেজ হারছে খবর পেয়ে কি উল্লাস আমাদের! আমি বুয়রের দলে, দাদা ইংরেজের। মনে পড়ছে ছবিতে দেখেছি স্যার জন সাইমন নামে সেনাপতি ঘোড়ায় চড়ে বনপথে যাবার সময় লক্ষ্যভেদী বুয়রের গুলিতে আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধে বুয়রদের কিছুতেই কায়দায় আনা যাচ্ছে না। তখন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ যুদ্ধে নামলেন। তাঁর এক পুত্র যুদ্ধে মারা গেছে। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলে যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল ব্রিটিশের অনুকূলে। বুয়র সেনাপতি ক্রোনজী বন্দী হলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার সন্ধি করতে চাইলেন। কিন্তু সেনাপতি স্মাট্স, বোথা, ডিওয়েট যুদ্ধবিরতি করতে রাজী নয়—কিন্তু কতদিন লড়বে তারা! অবশেষে নতিস্বীকার করতে হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে। বিজয়ী ব্রিটিশ সৈন্য বুয়রদের রাজধানী প্রিটোরিয়ায় প্রবেশ করলে আমাদের শহরে উৎসব কেন? জমিদার পালচৌধুরীবাবুরা 'গড়ের বাত্ত' বাজিয়ে শহর পরিক্রমা করলেন। বুয়ররা হেরেছে, ইংরেজ জিতেছে—তাই উৎসব। আমি দেখবো না সে মিছিল। দাদা বারান্দায় গেলেন দেখতে। আমি ঘরের ভিতর। কিন্তু 'গড়ের বাত্ত' বাড়ির কাছে রাস্তায় আগিয়ে আসছে। প্রতিজ্ঞা করেছি দেখতে যাবো না। আমি বারান্দায় গেলাম না, তবে জানালার একটু ফাঁক করে দেখলাম 'গড়ের বাত্তি' চলেছে—কালো লাল পোশাক পরে, মাথায় টুপি দিয়ে, নানারকমের বাজনা নিয়ে চলেছে 'গোরা' বাজনেরা। একটা স্বাধীন নিরীহ চাষাদের দেশ জয় করেছে ইংরেজ, এইজন্য উৎসব! কিন্তু সেই বুয়রদের কী রূপ দেখলাম পরে ও আজও দেখছি? সেকথা এখন থাক।

ইংরেজ বুয়রদের হাতে মার খেয়েছে, তাতে আমরা মনে মনে খুশি। যেদিন জাপান দুর্দান্ত রুশকে হারালো—সেদিন আশান্বিত হলাম এই ভেবে যে প্রাচ্যদেশ কেবল মার খায় না, মারতেও পারে। ব্রিটিশ সামাজ্য সম্বন্ধে শুনতাম, সূর্য তাদের সাম্রাজ্যে অস্ত যায় না—মানচিত্র খুলেই চোখে পড়তো সেটা। কিন্তু রুশ সাম্রাজ্য ইউরোপে এক মুড়ো থেকে এশিয়ায় আর এক মুড়ো যে বিস্তৃত ছিল —সেটা সম্বন্ধে তেমন সজাগ ছিলাম না। সেই বিরাট রুশকে হারালো জাপান। হেম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত উচ্ছ্বাসে পড়েছি: 'অসভ্য জাপান তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।' এখন আর তো বিজয়ী জাপানকে

'অসভ্য' বলা যায় না—আমরা ঐ কবিতা আবৃত্তির সময় বলতাম 'ক্ষুদ্র জাপান তারাও স্বাধীন।' বুয়র যুদ্ধ শেষ হবার বছর দুইয়ের মধ্যে এশিয়ায় এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেদিন কাগজে পড়লাম মুকডেন থেকে রুশ সৈন্য অপসারিত হলো, যেদিন পড়লাম পোর্ট আর্থার জাপানীরা রুশের কাছ থেকে কেড়ে নিলো, সেদিন সর্বত্রই কী উৎসব! কিন্তু এসবের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি হবে তা আমাদের অভিভাবকরাও বুঝতেন বলে মনে হয় না।

রুশ সেনাপতি প্রিন্স ক্রোপাটকিনের রুশ সৈন্যদের মুকডেন থেকে অপসারণ নাকি রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা বলে শুনতাম; অর্থাৎ সমস্ত সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী না হয়ে পলায়ন করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে। স্থলসৈন্য দিয়ে যুদ্ধে সুবিধা হচ্ছে না দেখে, রুশের শাসকরা স্থির করলেন সমুদ্রপথে জাহাজ নিয়ে দ্বীপবাসী জাপানীদের আক্রমণ করতে হবে। তখন জাপানে ও ইংরেজে গলাগলি ভাব। ইংরেজ তখন সুয়েজ খালের কর্তা; তারা রুশকে সরাসরি বলে দিল যে পরদেশ আক্রমণ করবার জন্য তারা রুশের নৌবহর খাল দিয়ে যেতে দেবে না। অগত্যা রুশীয় নৌবহরকে চলতে হলো আফ্রিকা ঘুরে—যে-পথে যাওয়া-আসা চলতো আদ্যিকালে। রুশীয় নৌবহর এই বিরাট পথ অতিক্রম করে যেমন জাপান দরিয়ায় প্রবেশ করেছে, তখনই জাপানী অ্যাডমিরাল টোগোর নেতৃত্বে তাদের যুদ্ধজাহাজ ঝাঁপিয়ে পড়লো রুশীয়দের বাল্টিক নৌবহরের উপর। আমরা এখানে ইতিহাস লিখছি না—সংক্ষেপে বলি, রুশকে জাপানের কাছে পরাভব স্বীকার করতে হলো। আমাদের কী উল্লাস! দাদা 'সুসিমো সমর' নামে দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। বাড়িতে কেউ এলে বাবা বলতেন দাদাকে সেটা পড়ে শোনাবার জন্য—তখন সবাই খুশি জাপানের জয়েতে, তাই কবিতার গুণাগুণ বিচার না করে বিষয়ের গুরুত্বেই খুশি হতেন। আমি জানি দুইটি পরিবারের এই সময়ে সদ্যজাত দুই বালকের নাম প্রদত্ত হয় 'টোগো'। টোগো তখন আমাদের হিরো বা আদর্শ বীর। আজ শুনি লেনিন।

ক্ষুদ্র সে জাপান, পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য রাশিয়াকে পরাজিত করলো,—সন্ধি হলো ১৯০৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। আর বাঙলাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা হলো বয়কট বা বৃটিশ পণ্যবর্জন নীতি গ্রহণের দ্বারা ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট। ভীতু বাঙালী, ভেতো বাঙালী, মছলিখোর বাঙালী—ভারত-ইতিহাসের পট পরিবর্তন করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, অঘটনও ঘটে দেখা গেল বাঙালীর জীবনে।

তখন বয়স বছর বারো। ১৯০৪ সাল। তখন থেকেই শুনছি 'বঙ্গচ্ছেদ' হবে। বঙ্গদেশ বলতে তখন বোঝাতো পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা। তখন এই বিশাল প্রদেশ (Province) শাসন করতেন একজন লেফনেন্ট-গবর্নর। বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া ছাড়া অনেকগুলি উপজাতি ছিল এই প্রদেশপালের তত্ত্বাবধানে। তখনও কলকাতা ছিল ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী। বড়লাট থাকতেন আজকালকার রাজভবনে, আবার বঙ্গদেশের রাজধানীও ছিল কলকাতায়। ছোটলাট থাকতেন আলিপুরের বেলভেডিয়ারে—আজ যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার। ভারত সাম্রাজ্যের বড়লাটের দপ্তর বা সেক্রেটারিয়েট ও বিরাট-বঙ্গে ছোটলাটের দপ্তর দুই-ই তখন এই মহানগরীতেই কাছাকাছি থাকতো। তবে গ্রীষ্মকালে বড়লাট তাঁর দপ্তর নিয়ে যেতেন সিমলা শৈলে আর ছোটলাট যেতেন দার্জিলিঙে। তখন বিজ্ঞানীরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত বা এয়ার-কনডিশন ঘর করার বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেননি, তাই অফিসে ও ঘরে ঘরে টানা পাখার হাওয়া করতো কুলিতে। এই টানা পাখার আবিষ্কর্তা নাকি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানীর লোক।

পূর্বে ভৃত্য বা দাসরা বড় বড় তালপাতার পাখা দিয়ে অভিজাত ধনীদের 'বাতাস' করতো। আমাদের বাড়িতেও কোনো সভা বা গানের মজলিশ বসলে ঐরকমের 'বৃহৎ পাখা' ব্যবহৃত হতো। আমাদের স্কুলে টানা পাখা কুলিতে টানতো—বড় লম্বা ক্লাসে তিনটে পাখা পর পর টাঙানো থাকতো—তার একদিকে বসে লোকে টানতো। শান্তিনিকেতনে এসে দেখি দিপুবাবুর শোবার ঘরে মশারির ভিতর টানা পাখা। শুনতাম সৈনিকদের 'ব্যারাকে'ও ঐ টানা পাখার হাওয়া দিয়ে গোরা সৈন্যদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা চলতো। তাঁরা শীতের দেশের লোক—গরমের দেশে এসেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ; সুতরাং টানা পাখার ব্যবস্থা করতেই হয়েছে। পাঞ্জাবে কোনো সৈন্য-ছাউনিতে 'পাংখা পুলার' বা পাখা-টানা-কুলি রাতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পাখা টানছিল বলে ক্রুদ্ধ কোনো সৈনিক লাথি মেরে কুলিটার পিলে ফাটিয়ে দেয়। সেকালে ম্যালেরিয়ার কল্যাণে প্লীহাটা একটু বেশী স্ফীত হয়ে উঠতো এবং সামান্য (?) আঘাতে সেই অংশটা বিদীর্ণ হয়ে যেতো। পাঞ্জাবের সৈন্যব্যারাকে এই প্লীহা বিদারণ ঘটনা বড়লাট কার্জনকে ক্ষুব্ধ করে ; তাই তিনি অপরাধীকে খুঁজে বের করবার জন্য সৈনিক বিভাগকে বলেছিলেন। এই ছোট ঘটনা নিয়ে শেষকালে সামরিক বিভাগের লর্ড কিচেনার ও বড়লাট লর্ড কার্জনের মধ্যে বিবাদ বেশ ঘনিয়ে ওঠে। যাক সে কথা।

আজকাল তালপাতার পাখায় হাওয়া খাওয়া কমে আসছে—এখন বিদ্যুৎ-

শক্তি নগর থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে এবং ঘরে ঘরে নানা রকমের 'ফ্যান' বা পাখা চালু হয়েছে। খবরের কাগজে ফ্যানের কতো ছবি, কতো বিজ্ঞাপন।

কার্জন ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ গভর্ণর-জেনারেল তথা ভাইসরয় হয়ে এসেছিলেন গত শতাব্দীর শেষপাদে। লর্ড লীটনের পর এমন জবরদস্ত বড়লাট ভারতে আর আসেননি। তাঁর মাথায় এলো 'বঙ্গদেশ'কে পার্টিশন করতে হবে। এতো বড় প্রদেশ একজন ছোটলাটের পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়।

বঙ্গচ্ছেদে হিন্দু বাঙালীরই আপত্তি সোচ্চার হয়ে উঠলো। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ চিরদিনই অবহেলিত ছিল; আর সাধারণ মানুষের বেশির ভাগ অচ্ছুৎ হিন্দু ও হিন্দুর অস্পৃশ্য মুসলমান। ঢাকায় পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী স্থাপিত হলে মুসলমানদের প্রতি স্বভাবতই সরকারী নেকনজর পড়বে—তারা বড় হবে, মানুষ হবে, সমান সমান এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বীও হতে পারে—এটা ধনী হিন্দু জমিদার ও বর্ণহিন্দুদের ভালো লাগছিল না। তাই ভাবুকতায় বিহ্বল হয়ে আমরা সেদিন বাঙালীকে দ্বিখণ্ডিত করা হচ্ছে বলে প্রথমে জিগির, পরে প্রতিবাদ, আরও পরে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের হুমকি দিলাম।

কলকাতার উত্তেজনা-তরঙ্গ আজকাল বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সেকালে তা হতো না, কারণ তখন বেতার অজ্ঞাত এবং বাংলায় দৈনিক পত্রপত্রিকা না থাকারই মধ্যে। ইংরেজি কাগজ 'বেঙ্গলি' (Bengalee) ছিল স্বাদেশিকদের মুখপত্র। আর ছিল বাঙালীদের প্রাচীন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। আর অন্য সব কাগজের মালিক ছিল ব্রিটিশ Englishman, Statesman, Indian Daily News। কলকাতার খবর আনতেন সপ্তাহান্তে বসু-পরিবারের দুই ভাই—সন্তোষকুমার ও সুধীরকুমার। সন্তোষকুমার পড়েন রিপন কলেজে। তখন স্বাদেশিকতার কেন্দ্র ছিল রিপন কলেজ। বেঙ্গলির সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে তথাকার অধ্যাপক। তাঁর বাগ্মিতায় ও অধ্যাপনায় ছাত্ররা মুগ্ধ। বাংলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' ছিল রাজনীতির নূতন ভাবুকদের মুখপত্র। আজ ইংরেজি 'বেঙ্গলি' ও বাংলা 'সঞ্জীবনী'র নামও লোকে ভুলে গেছে।

বসু-পরিবারের সুধীরকুমার কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। তিনি এসে গল্প করেন টহলরাম গঙ্গারাম, লিয়াকৎ হোসেন, বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বক্তৃতার কথা।

দ্বিজু রায় (ডি. এল. রায়) ও রবিঠাকুরের স্বদেশী গান মুখে মুখে চলতে শুরু

করেছে। দ্বিজু রায়ের সদ্য রচিত গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার' ও রবিঠাকুরের 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'—সুধীরদা এসে শোনাতেন খুব উচ্ছ্বসিত আবেগে। তাঁর মুখে প্রথম আবৃত্তি শুনি রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'। বালক বয়সে শোনা সেই আবৃত্তি তারপর কত মুখে কতবার শুনেছি, কিন্তু সেদিনকার অনুভূতি সে আর ফিরে পাইনি।

সন্তোষদের বাড়িতে শনি ও রবিবারে বসতো ছাত্রদের 'সন্তান সম্প্রদায়ের' সভা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তখন প্রায় অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে দেশের মধ্যে—'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি কী ভাবে বাঙালী তার জাতীয় জয়ধ্বনিরূপে কণ্ঠে গ্রহণ করলো সে-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়নি। সন্তান সম্প্রদায়ের সদস্যদের পড়ানো হতো সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' গ্রন্থ। ইংরেজ কী দুশমন, শয়তান, তস্কর, লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি এই সব তথ্য সংগ্রহ করে বইটি লেখা। বইয়ের উদ্ধৃতি সবই সাহেবদের লেখা গ্রন্থ ও সরকারী রিপোর্ট থেকে; কিন্তু পারিপার্শ্বিক বা সমকালীন ঘটনাপুঞ্জ থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভয়াবহই হয়, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল 'দেশের কথা' থেকে। বয়স হলে বুঝলাম ইংরেজ বণিকরা যতই পাষণ্ড হোক, তার থেকে পাষণ্ড ছিল সেকালের হিন্দু-মুসলমান ধনী শাসকগোষ্ঠী—আর জনতা ছিল বিচ্ছিন্ন।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ আশ্বিন ৩০) বঙ্গচ্ছেদ সরকারী ভাবে ঘোষিত হলো। সেদিন আমরা উপবাস করলাম, রাখি পরালাম সকলের হাতে —বললাম 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই'। কিন্তু কে জানতো অদৃষ্টে বিধাতাপুরুষ হাসছেন 'ভেদ নাই' শুনে।

পার্টিশন হয়ে গেল। ঢাকা হলো পূর্ববঙ্গের নূতন রাজধানী, গ্রীষ্মাবাস হলো আসামের শিলং পাহাড়ে। তবে সে পার্টিশন চল্লিশ বৎসর পরে ভারত ত্যাগ করবার পূর্বে ইংরেজ সরকার বাঙালী ও পাঞ্জাবীর মর্মে আঘাত হেনে গেল। উত্তর ভারতের Brain ও Brawn বাঙালী ও পাঞ্জাবীদের টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। বাঙালীর কবি প্রথম দিনে গেয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে।' তাও বর্ণে বর্ণে ফলে গেল অর্ধশতাব্দী পুরতে না পুরতে—ইংরেজ আজ কোথায় নেবে গেছে। পড়ন্ত রোমান সাম্রাজ্যের মহানগরী রোম ও ইতালীর যে দশা হয়েছিল, আজ ব্রিটেনে তারই পূর্বাভাস যেন দেখা যাচ্ছে।

ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞরা স্থির করলেন, ব্রিটিশ সরকারকে জব্দ করতে হলে তার মেরুদণ্ড শিল্পপতিদের বস্ত্র-ব্যবসায়ে আঘাত হানতে হবে। কলকাতার নেতারা ঘোষণা করলেন—বৃটিশ বস্ত্র বয়কট করো। বানিয়াদের পকেটে হাত

না পড়লে বিলাতের শাসকগোষ্ঠীর চেতনা হবে না।

সভা, সভা, সভা—বক্তৃতা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, প্রচ্ছন্ন হিংসাত্মক বক্তৃতা। বয়কট—বিলাতী বস্ত্র বর্জন কর। পূর্ববঙ্গে বরিশালের বাজারে শুনছি বিলাতী বস্ত্র, বিলাতী লবণ দুষ্প্রাপ্য হয়েছে—অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে সব হচ্ছে। এসব শুনছি—কিছুটা পড়ে পড়ে জানছি। একদিন সেই বরিশাল থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন আমাদের শহরে, উঠলেন আমাদেরই বাড়িতে। খবর নিয়ে তিনি জেনেছিলেন 'স্বদেশী'দের আড্ডা আছে আমাদের বাড়িতে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক, মাথায় গেরুয়া চাদরের পাগড়ি। সঙ্গে ছোট পুঁটলি ও হাতে একতারা। সন্ন্যাসীর যে গানের গলা ছিল তা নয়; তবুও মোটা গলায় গান গাইলেন—তার একটুখানি মনে আছে: 'প্রাণে প্রাণে মনে মনে কে শোনাল মায়ের নাম'। সন্ন্যাসীর প্রতি কী শ্রদ্ধা আমাদের। খাওয়ার ব্যবস্থা করে ভয়ে ভয়ে শুধোই, 'মাছ মাংস খাবেন?' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমরা তো স্বদেশী সন্ন্যাসী, আমাদের আহারে বাদ-বিচার নেই।' মা তাঁকে সামনে বসে খাওয়ালেন।

আমার বয়স তখন বছর তেরো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ১৩১২ সাল। বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হয়ে দেশ বিভক্ত হয়ে গেছে। বৃটিশের চেতনা-সম্পাদনার জন্য বিলাতী বস্ত্র বর্জন নীতি ঘোষিত হয়েছে। প্রতিজ্ঞাপত্রে ছাপা আছে—'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গচ্ছেদ যতদিন রদ না হয়, ততদিন বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিব না।' আজকাল কেউ ভাবতেও পারে না যে আমাদের লজ্জা নিবারণের বসনভূষণ আসতো ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কল থেকে; লবণ আসতো লিভারপুল থেকে জাহাজের খোল বোঝাই হয়ে। ঔষধ, পথ্য, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, কলকব্জা সবই আসতো বিদেশ থেকে—বেশির ভাগই গ্রেট-ব্রিটেন থেকে। বৃটিশের ধনের উৎস যে শিল্প তাকে আঘাত হানতে হবে।

আমাদের শহরের যে সব যুবকরা কলকাতায় কাজ করেন বা পড়েন তাঁরা 'স্বদেশী' বস্ত্র আনেন সপ্তাহান্তে। লালু পালের কাপড়ের দোকানের উপর ছিল 'পাবলিক লাইব্রেরী'—সেখানে সেগুলি থাকে ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। স্কুলের ছোট ছেলেরা সেই সব ধুতি শাড়ি বেঁধে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাই; আমি দলের কনিষ্ঠ, দেখতেও সুন্দর ছিলাম—তাই বাড়ির মধ্যে মেয়েদের কাছে হাজির হতাম কাপড় ও দু-একটা মনোহারী সামগ্রী নিয়ে। ধীরেন বাঁড়ুজ্জে কলকাতায় কেরানীগিরি ছেড়ে নিজ বাড়িতে স্বদেশী দোকান খোলাতে আমাদের সখের ফেরিওয়ালাগিরির অবসান হলো। ১৯০৫ সালে কটাই বা দেশী জিনিস ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপগুলির 'কুলি'দের জন্য যে মোটা কাপড় বোনা হতো, সেই বস্ত্রই

বাংলা দেশে এলো। মনে আছে স্কুলে গেছি এই কাপড় পরে—আমেদাবাদের 'গুজরাট জনিং মিলে' তৈরী। ধোপারবাড়ি থেকে ধুতি ধুয়ে এসেছে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে পাড়ের রং ছড়িয়ে গেছে। তাই দেখে ছেলেদের কি বিদ্রূপের হাসি, 'দেখ্ দেখ্, প্রভাত 'স্বদেশী চট' পরে এসেছে।' গ্রাহ্য করিনি সে সব কথা—সেই চট-পানা ধুতি পরেই ক্লাসে আসতে থাকলাম।

তখন বাংলাদেশে কোনো কাপড়ের কল ছিল না। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল' স্থাপনের প্রস্তাব হচ্ছে। একদিন শহরে এক সুদর্শন ভদ্রলোক এলেন—কলকাতার কাছে বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল হবে তার অংশীদার সংগ্রহ করতে। তাঁকে নিয়ে অনেক ভদ্রের বাড়ি যাই—শেয়ার কে কত নিয়েছিলেন, তা জানিনে।

কলকাতা আজও যেমন, তখনও তেমনি—সকল উত্তেজনা উৎসাহের কেন্দ্র। তাঁরা মফঃস্বলে আসছেন 'বয়কট' ও 'স্বদেশী' প্রচারের জন্য। শহরের ধনী সম্ভ্রান্ত পালচৌধুরীরা—বড় তরফের অনেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদ পেয়েছেন—রায়বাহাদুরও আছেন। তাঁরা আন্দোলনে যোগদান করতে পারলেন না। সভার স্থান হলো ছোট তরফের প্রাঙ্গণে। ব্রজগোপাল পালচৌধুরীর মাঠে। এদের পড়ন্ত সূর্য। কিন্তু মনটা বোধ হয় মরেনি, দেহটা ক্ষীণ হয়ে আসলেও।

মহানগরী থেকে এলেন নেতারা—সবাই উঠলেন আমাদের বাড়িতেই। এদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমানের আবুল কাসেম ও বাংলার তৎকালীন ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু—এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির এক চাঁই। আমাদের বাড়িতে উঠবার কারণ ছিল। মোহিতচন্দ্র সেন ছিলেন বাবার সমবয়সী সহপাঠী। কলকাতায় স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী থেকে বি. এ. পর্যন্ত একত্র পড়াশুনা করেন। বাবা গেলেন আইন পড়তে, মোহিত সেন গেলেন এম. এ. পড়তে।

দুজনের বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় ছিল যে, বাবা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের অর্থাৎ দাদার নাম দেন মোহিতকুমার। এই সুবাদে কয়েক বৎসর পরে মোহিতচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও তাঁর দুই বালিকা কন্যার সঙ্গে পরিচয় হয় শান্তিনিকেতনে—যথাসময়ে সেকথা আসবে।

সেদিনকার সান্ধ্যভাষণে মনে পড়ছে তরুণ শচীন্দ্রপ্রসাদ দৃপ্তকণ্ঠে বলছেন, 'আপনারা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনুন ইংরেজ শাসক ও শোষণের কীর্তিকলাপ।' বহু বৎসর পরে দেখলাম সেই বীরকে—স্থূলদেহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। খুঁজে পেলাম না আমাদের কৈশোরের বীরকে। মনে পড়ছে 'দুরাশা'র কেশরলাল ছুটিয়া পল্লীতে ছুটাক্ষেত নিড়োচ্ছেন। কার কথা ঠিক মনে পড়ছে না,

বোধ হয় জর্জ এলিয়টের—প্রেম প্রসঙ্গে বলেছিলেন : There is a curse on the love of eighteen। যে আদর্শবাদ বস্তুতন্ত্রহীন এবং যে বস্তুবাদ আদর্শ-হীন—দুয়েরই ফল বিষময় হয়। যৌবনের আদর্শবাদী প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হতে না হতেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। শাস্ত্রে যে বলে—যৌবনে ধন অর্জনের চেষ্টা করবে, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য।

বিলাতী বস্ত্র বর্জন করতে হবে এই প্রতিজ্ঞায় তো সই করেছি। আমরা ভলাণ্টিয়ার—ক্লাসের সময় ছাড়া ঘুরছি বাজারে। দোকানে অদূরে দাঁড়িয়ে—নূতন ক্রেতাকে কাপড়ের দোকানে ঢুকতেই তাকে পাকড়াও করে বোঝাই 'স্বদেশী' কী? ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে—বোঝে না আমাদের ভাষা। ইংরেজ দুশমন, শোষক, অত্যাচারী, তাঁতির আঙুল কেটে বিলাতী কাপড় চালাবার চেষ্টা করেছে ইত্যাদি শেখানো বুলি বলে। যে বেচারী ভয়ে ভয়ে বিলাতী কাপড় না কিনে মোটা চট্ কিনে নিয়ে যেতো সে আমাদের চোখে ভারি ভালো লোক। কতো অনুনয়-বিনয়—যে লোকের সঙ্গে কখনো কথা বলতাম না পথেঘাটে দেখা হলে, তাদের আজ হাত ধরে কথা বলছি। কিন্তু তারা ভাবে ইংরেজ শত্রু, ইংরেজ দুশমন, ইংরেজ শোষক! কিন্তু ইংরেজ কোথায়? মন্‌রো সাহেব 'দয়া বাড়ি' থেকে রোগীদের চিকিৎসা করেন—মন্‌রোর জামাই মেয়ে ডাঃ নীল ও মিসেস্ ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের গাঁয়ে যান। তারা তো শত্রু নয়! 'দেশ' 'স্বদেশ'—অর্থ তারা বোঝে না। তারা দেখছে- জমিদারের গোমস্তা, নায়েব, পেয়াদা, বরকন্দাজ তারাই তো অত্যাচার করে। তারা নিরক্ষর বলে কতরকম আবোয়াব আদায় করে। বিলাতী লাট্টুমার্কা শস্তা পাতলা ধুতি ফেলে ঐ চট্‌পানা ধুতি কেন পরবো? পরিষ্কার বিলাতী লবণ ফেলে ময়লা করকচ্ কেন খাবো? তারা আমাদের কথা বোঝে না, আমরাও তাদের বুঝি না। তারা না বুঝলে রাগ করি, জুলুম করি, ভেদ দূর করতে গিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করি।

মনে পড়ছে প্রথম রাখিবন্ধনের দিনের কথা। 'বঙ্গচ্ছেদ' ঘোষিত হয়েছে। সকাল থেকে সবার হাতে রাখি বাঁধছি—মন্ত্র বলছি 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।' সন্ধ্যার দিকে মিছিল বের হয়েছে—গান ধরেছি 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক। জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক' ইত্যাদি। ভাবের সঙ্গে আবেগের সঙ্গে গাইতে গাইতে চললাম নিকিরীপাড়ায়। দেখলাম তাদের জীর্ণ মসজিদে তারা 'নমাজ' পড়ছে। এতকাল পাশাপাশি বাস করছি, কখনো এ-পাড়ায় প্রবেশ করিনি —'মোছলমান পাড়া'! নমাজ পড়া হয়ে গেলে তাদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে রাখি পরালাম। কিছুই তারা বুঝছে না। যে-হিন্দুরা কখনো তাদের পাড়া

মাড়াতো না, যারা হিন্দুর ঘরে ঢুকতে পেতো না, যারা হিন্দুর বাড়ি গেলে সম-আসন পেতো না—সেই হিন্দুর ছেলেরা তাদের হাত ধরে রাখি পরালো। কিন্তু অল্পকাল পরেই দেখা গেল, যেখানে ভেদ আছে সেখানে ভেদটাকে মেনে না নিয়ে ধামাচাপা দেবার যে চেষ্টা হিন্দু নেতারা করছিলেন—তা ব্যর্থ হলো। বঙ্গচ্ছেদ বয়কট আন্দোলনের এক বৎসরের মধ্যে ঢাকায় মুসলীম লীগ্ (১৯০৬ ডিসেম্বর) গঠিত হলো, আর মুসলমান যে একটা 'পৃথক জাতি' এই মত প্রচারিত হতে শুরু করলো গ্রামে গ্রামে। খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুরা যোগ (?) দিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতিকে আরও ঘুলিয়ে তুললেন, এবার তারই অনিবার্য বিষফল দেখা গেল ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয়বার বঙ্গচ্ছেদ হয়ে।

ফিরে ফিরে চাই অতীতের দিকে। উনবিংশ শতকের শেষ দশকের নরনারী আজ বিংশ শতকের সাত দশকে ফিরে এলে তেমনি বিস্মিত হবেন, যেমন হতেন তাঁদের আট দশক পূর্বের পিতৃপিতামহরা তাঁদের দেখে। বাঙালী নরনারীর সাজসজ্জায়, বসনে-ভূষণে, চলনে-বলনে যে কী পরিবর্তন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। হুতোম পেঁচার নকসার বাবুদের সাজ-পোশাক স্মরণীয়।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই পরতাম পাঁচ-হাত ধুতি, মেয়েরা পরতো পাঁচহাত ডুরেশাড়ি। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুতিশাড়ির বহর-ওসার বাড়তে থাকে। দশ হাত লম্বা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহর ধুতিশাড়ি বড়রা পরতেন। আজকাল যাঁরা ধুতি পরেন তাঁদের সেই ধুতিগুলি ক'ইঞ্চি বা ক'ফুট বহরের তা বলা কঠিন—কারণ কোঁচা সব লুটিয়ে চলে। আর যাঁরা কোঁচা দেন না, তাঁরা যেভাবে কাপড় পরেন তা না মল্লকচ্ছ, না ভদ্রসভার যোগ্য। বরং মারাঠারা যেভাবে ধুতি পরে তাতে শরীরের নিম্নাঙ্গে আঁটসাট পড়ে, অথচ সামনে ভদ্রতার আবরণটা থাকে। আমরা ছোটবেলা স্কুলে যেতাম ধুতি পরে—কোঁচা দুলিয়ে। মালকোঁচা মেরে যারা পথে চলে তারা তো 'গুণ্ডা'! বাড়িতে ধুতি পরি ধড়া বেঁধে, অর্থাৎ কোঁচার অংশটা কোমরে জড়িয়ে।

'হাফ্ প্যান্ট' বলে একটা শব্দ আমরা সৃষ্টি করেছি—ইংরেজি অভিধানে তার অস্তিত্ব নেই। 'প্যাণ্টালুন' শব্দটার ক্ষুদ্র সংস্করণ ইংরেজিতে Pant হয়েছে—তবে সেটা মার্কিনী-ইংরেজী; ইংরেজিতে 'সর্টস্' বলে ওটাকে। ছোট ছেলেরা আজকাল ঐ 'হাফ্-প্যান্ট'ই পরে। আমাদের সময়ে হাফ্-প্যাণ্ট, লুঙ্গি, পায়জামা কেউ পরতো না—মুসলমানরাও ধুতি পরতো। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ মাথায় সাদা গোল টুপি পরতো। হিন্দু বাঙালীর 'নাঙ্গা' মাথা চিরকাল

—কোনো 'জাতীয়' বা 'ন্যাশনাল' শিরভূষণ ছিল না, আজও নেই।

কলকাতার ভারতীয় মালিকদের 'অভিজাত' হোটেলে বিজ্ঞাপন থাকে যে 'ন্যাশনাল' বা 'জাতীয়' পোশাক পরে অথবা সাহেবী স্যুটে হোটেলে প্রবেশ করতে পারেন; অর্থাৎ পায়জামা বা চোস্ত, সেরওয়ানী এবং মাথায় গান্ধীটুপি হচ্ছে ন্যাশনাল ড্রেস। সেটা কর্তৃপক্ষের সহ্য হবে। বাংলাদেশের বুকে বসে যে ব্যবসায় চলছে, সেখানে বাঙালীর ধুতিচাদর পরে প্রবেশ নিষেধ। রাণী এলিজাবেথ ভারত সফরে আসেন—জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী ভোজ দেন। তিনি ঘোষণা করেন—ডিনার স্যুট পরে আসতে হবে। রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী নিমন্ত্রিত হন। তিনি সাহেবী স্যুট পরে ভোজসভায় যেতে রাজী হলেন না—তখন কী পরিস্থিতি হয় তা স্মরণীয়!

বাঙালী মধ্যবিত্ত 'বাবু'দের পোশাক-পরিচ্ছদ বহুরূপী বা ক্যামেলিয়নের মতো—পাঁচমিশালী জীবের সমাবেশ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কালে বাবরী চুল রাখা ছিল রীতি; ইংরেজ আমলে অ্যালবার্ট তেড়ি ও অ্যালবাট-কাট্ দাড়ি হলো বাবুদের ফ্যাশান—বোধ হয় মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী অ্যালবার্টের অনুকরণে। আর এক দল নবীনরা রাজপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অনুকরণে মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন; বাবার মুহুরী ঐ ফ্যাশানে তেড়ি কাটতেন—একজন মক্কেলও আসতেন তেল-চুকচুকে মাথার মাঝখানে সিঁথি কেটে। এ ফ্যাশান আর দেখা যায় না এখন। তবে সেকালে ব্রাহ্মদের অনেকে লম্বা দাড়ি রাখতেন—বাবাও প্রথম যৌবনে রেখেছিলেন। শুনেছি আমারই উৎপাতে সেটি ত্যাগ করেন। কিন্তু এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, আমি আ-কৈশোর শ্মশ্রুমান রয়ে গেলাম।

বাবা উকিল, আদালতে যাবার সময়ে পরতেন উকিলী সাজ। মুসলমানী যুগের চোগা-চাপকান, পায়জামা, মোজা, শামলা বা তাজ পরতে হতো। অনেক সময়ে তার উপর থাকতো পাকানো চাদর। আমাদের সময়ে আদালতে মুন্সেফ বাবু গলাবন্ধ কোট ও প্যাণ্টালুন পরে এজলাসে বসতেন। আজকাল দেখি মফঃস্বলের আদালতে হাইকোর্টের জজদের অনুকরণে সাদা কলার পরে বসেন মুন্সেফবাবুরা। ভারত স্বাধীন হবার পর আজও দেখি চীফ্ জাস্টিস্ পর্যন্ত মাঝে মাঝে মাথায় পরচুলো পরে বসছেন। নূতন রাষ্ট্রপালকে Oath বা শপথবাক্য পড়াচ্ছেন ঐ অপরূপ সাজে। এই ছবি দেখলে আমার তো হাসি পায়। ইংরেজ গিয়েছে, 'আংরেজি হঠাও' বলে আর্তনাদ করছি, অথচ অন্তরে-বাহিরে আমরা যে ইংরেজিয়ানায় ভরা—তা বুঝতেই পারিনি! ভুলে যাই অনুকরণ তোষামোদের নামান্তর—**Imitation is the worst form of flattery.**

মধ্যবিত্ত ভদ্রের বেশ ছিল 'অপরূপ'। শীতের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় গায়ে অনেকগুলি জামা উঠতো। দেহের সংলগ্ন 'গেঞ্জি'—বিলাতী পরিচ্ছদ। ইংলণ্ডের দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেলে গারেন্‌সি ও জার্সি বলে দুটো দ্বীপ আছে। জেলে, মাঝি প্রভৃতি দ্বীপবাসীরা যে জামা গায়ে দিত, তার থেকে এই নাম। 'জারসি' পরে খেলোয়াড়রা; আর গেঞ্জি পরি আমরা সবাই। গেঞ্জির উপর তাঁরা পরতেন 'কামিজ'—আসলে সেটা সাহেবদের শার্ট, 'কামিজ' পেয়েছিলাম পর্তুগীজদের কাছ থেকে। এই শার্টের কলার কতো রকমের। আবার সাহেবরা 'ডবল্-ব্রেস্ট' শার্ট পরতো ডিনার স্যুটের সঙ্গে। সে শার্টের বুকের দিকটা মোটা কাপড়ে তৈরী, স্টার্চ দেওয়া—কাঠের মতো শক্ত ও চুনের মতো সাদা। শার্টের উপরে অনেকে পরতেন ওয়েস্ট কোট—তার উপর ওপেন্-ব্রেস্ট কোট। আমার কাকা এই অপরূপ পোশাক পরে আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। অথচ পরনে একটি ধুতি। আজকালকার মতো পাতলা ফিনফিনে ধুতির নীচে সাদা লংক্লথের ছোট ইজের পরবার রীতি তখন চালু হয়নি। এই সাজের উপর থাকতো চাদর বা উড়ুনী কুঁচিয়ে পাকানো। 'একছুটে' বের হওয়া নিন্দিত। শীতকাল পড়তেই অনেকের দেহের উপর চাপতো আল্‌স্টার—এটাও খাস বিলাতী পোশাক; আল্‌স্টার আয়ারল্যাণ্ডের একটা অংশের নাম। অধিক সাবধানীরা গলায় 'কম্‌ফরটার' জড়াতেন—আরামদায়ক বলেই এই নামটা প্রদত্ত হয়। সাধারণ লোকে গায়ে জড়াতো 'র‍্যাপার'—গাত্র আবরণ বলে ইংরেজিতে ঐ নাম বলা হতো, বাংলায় 'র‍্যাপার' শব্দটাই চালু হয়। মধ্যযুগে এই ধরনের গাত্র-আবরণকে বলতাম শাল, আলোয়ান। এ দুটি ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তরাই ব্যবহার করতেন। সাধারণত জারমেনীর তৈরী পাট ও পশম মিশ্রিত সুতোয় বোনা 'র‍্যাপার' লোকে ব্যবহার করতো। গাঁয়ের লোকেরা 'দোলাই' গায়ে দেয়। সেকালে কাবুলিরা শাল, আলোয়ান, র‍্যাপার বিক্রী করতো। আমাদের বাড়িতেও একজন কাবুলি আসতো; তার কাছ থেকে দামী দামী আলোয়ান বাবা কেনেন, শুনতাম কাশ্মিরী মাল। আজকালও সেই কাবুলিরা আছে শহরে-গ্রামে, দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—কাপড়ের ব্যবসা করতে দেখি নে। তবে এখন তারা টাকার লগ্নী ব্যবসায়ী।

গরমের সাজ ছিল অন্য রকমের। বাবা 'পাঞ্জাবি' পরতেন—সে-জামার বোতাম থাকতো কাঁধের দিকে। পরে শুনেছি সামনে বোতাম দেওয়া 'পাঞ্জাবি' জামার প্রচলন করেন রবীন্দ্রনাথ (?)। পাঞ্জাবির সঙ্গে উড়ুনী বা চাদর ব্যবহার করা ছিল রেওয়াজ। আজকাল অধমাঙ্গে পায়জামা, ঊর্ধ্বাঙ্গে পাঞ্জাবি হয়েছে সাধারণের পোশাক। তারও স্থান নিচ্ছে প্যান্টালুন ও হাওয়াই শার্ট।

শার্টেরই কত বাহার।—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে চোখ ঝলসে যায়।

ছোটবেলা থেকেই জুতো পায়ে দিতে হতো। ভদ্রলোকে জুতো পায়ে না দিয়ে পথে হাঁটবে—এটা অভাবনীয়। কেবল পিতৃদায়ের সময়ে নগ্নপদে ধনী-দরিদ্র সকলকেই চলতে হতো—ব্রাহ্মণদের দশ দিন, শূদ্রদের এক মাস। আর বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে তো দুটি মাত্র জাত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ছাড়া সব জাতকেই ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করতে হতো—তখন নগ্নপদেই চলতেন সবাই। আজকাল অবশ্য এ-সবের ব্যত্যয় দেখা যায়—সে-কথা থাক্। আমরা বলছিলাম জুতোর কথা। মনে পড়ে না কখনো বাড়ির বাইরে সদর রাস্তায় 'খালি পায়ে' বের হয়েছি। সাধারণত ঘরে চটি সবাই ব্যবহার করতাম; আজকালকার কোলহাপুরী চপ্পলের অনুকরণে বাটা কোম্পানীর জুতা তখন অজ্ঞাত ছিল। কে. এম. দাসের চটি ও তালতলার চটি বা বিদ্যাসাগরী চটি ছিল চালু। সামান্য শুঁড়তোলা বিদ্যাসাগরী চটি রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করতে দেখতাম। কে. এম. দাসের নাম আজ আর শোনা যায় না। ঘরে অনেকেই পরতেন খড়ম—মোটর-টায়ার-কাটা 'চামড়া' দিয়ে স্ট্র্যাপ লাগানো কাঠের খড়মের কথা তখন কেউ জানতো না, তাই 'গুলো' দেওয়া খড়মই সবাই ব্যবহার করতেন। লছমন দাস বাবাজীকে দেখেছি সেইরকম খড়ম পরে তীরবেগে হেঁটে চলেছেন।

সেকালে অভিজাত জুতো ছিল 'ভার্বি-সু'। বোধ হয় বিলাত থেকে আসতো—নাম দেখে তো তাই মনে হয়। আমাদের বাড়িতে বাজার থেকে কেনা জুতো আসতো না। আড়ঙঘাটা—আমাদের শহরের উত্তরের স্টেশন, সেখান থেকে অধর দাস আসতেন; গায়ে ছিট-কাপড়ের কোট, পরনে পরিষ্কার থান-ধুতি, কাঁধে ভাঁজকরা চাদর। আমাদের এই বীরভূম অঞ্চলে এ-শ্রেণীর লোকদের যে হীন অবস্থা, অধর দাস সে-শ্রেণীর অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। কারণ তখন ভদ্রলোকে এঁদের ডেকে জুতো তৈরী করাতেন—তখন দেশে বাটা কোম্পানীর আবির্ভাব হয়নি। আমরা ছিলাম অধর দাসের বাঁধা ঘর। পূজার আগে তিনি আমাদের জুতো এনে দিতেন। আজ কোথাও দেখতে পাইনে বাঙালী 'দাস'-দের হাতে-সেলাই জুতা! কোথায় গেল এই সমাজ? বয়স হবার পর বোলপুরে এসে যতদিন পেরেছি স্থানীয় রবিদাস কারিগরকে দিয়ে জুতো করিয়েছি—নিজের ও ছেলেদের জন্য। তারপর সেই কারিগররা মারা গেল যক্ষায়, একের পর এক। তখন বাধ্য হয়ে 'বাটা'র শরণ নিতে হলো। পাইকারী মাপে জুতো তৈরী হয় এখন—ডিমক্রেসির যুগ এটা। আমার পা, আমার গা'র মাপে আমার জুতা জামা হবে—পাইকারী মাপে নিজেকে ছেড়ে দেবো কেন?

'জুতো' ও 'মোজা' দুটো শব্দই মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। তা বলে 'জুতো' ব্যবহার হিন্দুযুগে অজ্ঞাত ছিল—একথা যেন কেউ মনে না করেন। প্রাচীন ভাস্কর্যমধ্যে বিচিত্র পাদুকার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। গল্প আছে: বুদ্ধদেবের শিষ্যরা নগ্নপদে ভিক্ষা করতেন। পা পাথরে-কাঁকরে ক্ষতবিক্ষত হয়—তাই ভগবান বুদ্ধের কাছে এসে শিষ্যেরা পাদুকা পরবার অনুমতি চাইলেন। বুদ্ধদেব বললেন—"ভিক্ষায় যদি পাও তো পরবে।" সেদিন থেকে ভিক্ষুরা জুতো ভিক্ষ করা শুরু করলো ; গৃহীরা পাদুকা উপহার দিয়ে পুণ্যঅর্জন করলেন। এক-দিন বুদ্ধদেব দেখেন ভিক্ষুরা বিচিত্র জুতো-পায়ে আসছেন—মেয়েদের জুতো থেকে অশ্বারোহীর জুতা তাঁদের পায়ে। দৃশ্য দেখে বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই হেসেছিলেন ; তিনি নির্দেশ দিলেন—"ও রকম জুতো নয়," এই বলে যে-রকম জুতোর ডিজাইন দিলেন, তাই আজ 'চপ্পল' হয়েছে।

জুতোর সঙ্গে মোজা পরা ছিল ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। মোজাকে বলতাম হাফ্-স্টকিং, ফুল-স্টকিং ইত্যাদি—এ সবই বিদেশ থেকে আসতো। হাফ্-স্টকিং আঁটতাম 'গার্টার' দিয়ে। তাও বিলাতী। রবারের জুতো ও কাপাসের সুতো মিশিয়ে বোনা ফিতে দিয়ে গার্টার তৈরী হতো। বড়রা পরতেন টানা-টানা দেওয়া গার্টার—নিকেলের দাঁতে স্প্রিং দেওয়া, মোজার কিনারা কামড়ে ধরতো, সেটা বাঁধা হতো হাঁটুর নীচে ঘেরা একটা ব্যাণ্ডের সঙ্গে। এটা হলো বাবুগিরির পয়লানম্বর নমুনা। ফ্যাসান চালু হলে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আজ দুনিয়া-ভর দেখতে পাচ্ছি ছেলেরা পরছে 'হাফ্-প্যান্ট' বা প্যান্টালুন, মেয়েরা পরছে ফ্রক—কোথাও পরছে শ্ল্যাক্স্। টপ্‌লেস বটম্‌লেস্ অর্ধউলঙ্গ নারীদেহ পুলিসী অশ্লীল আইন যতটা বাঁচিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব, আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকা-ওয়ালারা তা ছাপতে কসুর করেন না।

মেয়েরা সেকালে একবস্ত্রী থাকতেন, অর্থাৎ একখানি শাড়ি পরতেন—কী ঘরে, কী বাইরে। তবে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের দোপাট্টা করে শাড়ি পরতে দেখতাম। আমাদের সময়ে মিহি শাড়ির নীচে সায়া, শেমিজ থাকতো না। তাই স্নানের পর মামী-খুড়ীদের সামনে যেতে আমাদেরই লজ্জা করতো। পাতলা ভিজে শাড়ি তাদের গায়ের সঙ্গে থাকতো মিশে।

জুতো-মোজা পরা, শেমিজ, সায়া, ব্লাউজ পরিহিত ব্রাহ্মমেয়েদের দেখেছিলাম। আর প্রায়ই দেখতাম গোয়ালপাড়ার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে এক কৃষ্ণকায় কদাকার খৃষ্টান মেয়ে শেমিজ-শাড়ি পরা,—গাইছে খ্রীষ্টানীগীত বিলাতী বিকৃত সুরে। আমাদের শহরের কাছে মনযো সাহেব এসে খ্রীষ্টান মিশন খুললেন। তাঁর জামাই

ডাক্তার নীল। মিসেস্ নীল মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়ি—ভাঙা ভাঙা বাংলায় খৃষ্টকথা শোনাতেন। সে-সময়ের মেয়েদের পোশাক ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। স্কার্ট বা ঘাঘরা পরতো পা পর্যন্ত—বেশ খেলানো। আজকাল হাঁটু পর্যন্ত কোনো রকমে আসে স্কার্ট—মনে হয় পা দুটোকে পাশবালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢোকানো এমন সরু। সেকালে মেয়েদের সারা বুকটা খুব ফাঁপানো হতো, ধনুকপারা বাঁকা করসেট দিয়ে খাড়া রাখতো ব্লাউজটা। কোমরে বেল্ট বাঁধা—খুব সরু করার চেষ্টা। ঘোড়ায় বসতেন এক পাশে দুই পা ঝুলিয়ে। আজকাল স্ল্যাকস-পরা মেয়েরা পুরুষদের মতো করেই ঘোড়ায় চড়ে। আমাদের দেশে মারাঠা মেয়েরা আঠারো হাত শাড়ি মালকোঁচা মেরে পরে ঘোড়ায় চড়তো এককালে। এখন পুনায় সে-মেয়েরা বাঙালী মেয়েদের পোশাকে সাইকেল চড়ে। মিসেস্ নীলের সঙ্গে এদেশের দু-একজন খ্রীষ্টান মেয়ে আসতো। তারা বাংলায় গান গাইতো, বাংলায় ছাপা খ্রীষ্টানী বাণী ও জীবনী উপহার দিয়ে যেতো। সে-সব কথা এখনো মনে আছে,—বেথেলহামের গোয়ালঘরে যীশু জন্মেছেন, একটা গাধা দেখছে। যীশু-জীবনের নানা ছবি; যীশুকে ক্রুশ-কাঠ কাঁধে করিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাকানো দড়ি দিয়ে মারছে তাকে। পরে 'দয়াবাড়ি' নাম হয় সেই মিশনের। কী ভাবে সেটি ধ্বংস করা হয় সে-কাহিনী বিস্তারিত করবো না।

ব্রাহ্মমেয়েরা শেমিজ, সায়া, বডিস্, ব্লাউস পরতেন শাড়ি ছাড়া। সায়া বা পেটিকোট কখনো দেখা যাবে না—শাড়ির তলায় দেখা দিলেই পরস্পরকে সাবধান করে দেবার সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল। আভাস পাওয়া মাত্র শাড়ি টেনে নামিয়ে দিতো। আজ দেখি শাড়ির নিচের সায়ার রঙ ফুটে উঠছে শাড়ি ফুঁড়ে, আর শাড়ির ওসার ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গিয়েছে। আজ শেমিজ পরা উঠে গেছে—সবাই সায়া বা পেটিকোট পরেন। বডিস্ ছাড়া অনেকে ব্যবহার করেন কাঁচুলি। সেকালে ব্লাউস হতো পুরো হাত বা হাফ-হাত—বগল-কাটা ব্লাউস ছিল অজ্ঞাত। কত পরিবর্তন হয়ে গেছে পোশাকে-পরিচ্ছদে। আসলে যে পরিবর্তন হয়েছে তা বহিরাবয়বে—মনের মধ্যে রয়ে গেছে পুরাতনী। সেখানে তারা আচারী, তীব্রভাবে সব কিছুকে নির্বিচারে মানবার জন্য আকুল।

আমাদের বাড়ির সামনে দীনু ঘোষালের বাড়ি। বৃদ্ধ কোনো জমিদারের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন, সেই জন্য আদালতেও যেতে দেখতাম। একদিন দেখি দীনু ঘোষালের বাড়ির বারান্দায় দুই সন্ন্যাসী বসে। আমরা যে-রকম

সন্ন্যাসী শহরে দেখি, এরা সে রকমের নয়। এক সন্ন্যাসী আমাদের চূর্ণি নদীর ধারে থাকতো। গাছতলায় কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে রাখে—আসতে-যেতে দেখি লম্বা কম্বল পেতে গাঁজা টানছে। রোজ ছাই মাখে, হাতে-গায়ে অনেকগুলি টুকরো কাপড় বাঁধে, কাঁধে একটা ঝোলা; হাতে একটা লম্বা চিমটে নিয়ে ভিক্ষায় বের হয়,—সেটা দিয়ে শব্দ করে। বাঁ হাতে থাকে একটা কালোমতো পাত্র—কেউ বলতো মড়ার মাথা। মুখে 'ব্যোম্-ব্যোম্' শব্দ করতে করতে চলে; ভিক্ষা চায় না কখনো—তবুও লোকে দেয়, আমরাও দিতাম। কোথাও থামে না—ভিক্ষা নেবার সময়ে আগুপিছু হাঁটছে। সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়, কেন সন্ন্যাসী হয়েছিল কে জানে! আর আজ ভাবি—সন্ন্যাসী হলি, তবে শহরে-শহরে ঘুরে বেড়াস কেন বাপু! ভিক্ষা করে পেটের খাদ্য জোটাতে তো কম মেহনত করতে হয় না! আর প্রতিদিন সকালে সন্ন্যাসী সাজতেও কম সময় যেতো না!

লছমনদাস-বাবাজী খুব নামকরা সন্ন্যাসী। নগ্নদেহ, স্বল্পবস্ত্র পরনে, মাথায় সামান্য জটা, হোমাগ্নির ছাই মাখেন গায়ের উপরিভাগে, বৈরাগ্য দেখাবার আড়ম্বরটা কমই। সেকালের স্কুলের পাশে পোড়ো জমিতে ছোট একটা চালাঘরে থাকতেন মাঝে মাঝে এসে। আমাদের স্কুলের 'কেষ্ট'বাবু তাঁর পরম ভক্ত; তিনি লম্বা দাড়ি ও মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। শুনতাম সাধনভজন করেন। অত্যন্ত স্নেহশীল স্বভাব। বিকালে স্কুলে তিনি জিমনাস্টিক করাতেন।

লছমনদাস বাবাজীকে আমার বাবাও খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাই বলে তার সেই খড়ের চালের তলায় কোনো দিন যাননি। আমরা স্কুল থেকে তাঁকে দেখতে যেতাম। মৌনী হয়ে খান, খাওয়া-শেষে উদ্‌গার উঠলেই খাওয়া বন্ধ করতেন। বলতেন—"পেট পুরে খাবে না, আধখানা ভরবে খাদ্য দিয়ে, সিকিটা ভরবে জলে, আর সিকিটা থাকবে খালি।" আকণ্ঠ ভোজনকারীরা দেখেছি কখনো দীর্ঘায়ু হয় না, নানাবিধ পেটের রোগে ভোগে। লছমনদাস বাবাজীর কথাটা মনে রাখবার চেষ্টা করি; তবে ভুলেও যাই এবং তার জন্য খেসারতও দিতে হয়। এই লছমনদাস বাবাজীকে আমাদের বাড়ি এসে হোম-যাগ-যজ্ঞ করতে দেখেছিলাম—যজ্ঞের ইন্ধন যোগান দিতে দিতে নাকের-জলে চোখের-জলে হতাম ভিজে কাঠের ধোঁয়ায়।

দীনু ঘোষালের দাওয়ায় যে সন্ন্যাসীরা বসে ছিলেন তাঁরা গৈরিকধারী। হাতে চিমটে বা ভিক্ষার জন্যে নরকপাল বা সেই রকমের কিছু নেই—আছে পিতলের কমণ্ডলু। একজনের বিরাট বপু, কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরা। দ্বিতীয়জন শ্মশ্রু গুম্ফ কেশ মুণ্ডিত। তুজনেই সুপুরুষ, উজ্জল গৌরবর্ণ। সন্ন্যাসী আমাকে

ডাকলেন। নাম, পিতার নাম ও পরিচয়াদি নিয়ে শুধোলেন—"আজ কি…বাবুর শ্যালীর বিয়ে?" আমি বললাম—"হ্যাঁ।" বয়স্ক সন্ন্যাসী যা বললেন তা বুঝবার বয়স আমার হয়নি; তবুও মনে আছে যা বলেছিলেন—"ঐ মেয়ে বিবাহিত; তাঁর সন্তানও হয়েছিল; তার চিহ্ন আছে।" দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বললেন—"ইনি তাঁর স্বামী। বহুকাল পূর্বে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।" ঘটনা বানানো নাও হতে পারে, যে-বয়সে মেয়েটির বিবাহ হচ্ছে—সে-বয়সের অনূঢ়া মেয়ে সে-যুগে কারও ঘরে থাকতো না। যাই হোক, সেই…বাবুর প্রতাপে সন্ন্যাসীদের সন্ধ্যের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। বোধ হয় একদিন যৌবনপ্রারম্ভে যেমন সংসার-বিরক্ত হয়েছিলেন, আজ তেমনি সন্ন্যাসী-জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৃহী হতে চাইছিলেন—তাই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনরায় পাওয়া যায় কিনা হয়তো সেই সন্ধানে এসেছিলেন। সেই…বাবুর শ্যালীর বর এলেন—শুনলাম এটর্নি। বরের বয়স হয়েছে—বয়স্কা মেয়ে পাচ্ছেন বলেই বোধ হয় বিবাহ করছেন। কেননা তাঁর যে-বয়স তাতে সেকালের বালিকা বধূ পেলে, স্ত্রীরূপে পেতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হতো। তাই ভাবী বধূ সম্বন্ধে কানাঘুষা যদি বা কিছু শুনে থাকেন, গ্রাহ্য করেননি। একেবারে রেডিমেড্ গৃহিণী, সচিব, সখী, দাসী পেয়ে গেলেন।

আর একটি সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ছে। তখন দাদার ও আমার পৈতা হয়েছে—খুব সদ্‌ব্রাহ্মণ দুজনেই। গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করে জলগ্রহণ করিনে। গায়ত্রীর অর্থ বুঝিনে, শুধু শুনেছি জপ করতে হয়। জপের প্রত্যক্ষ ফলও একদিন পেলাম। খেতে খেতে গলায় একদিন মাছের কাঁটা বিঁধলো। কিছুতেই বের হয় না—শুকনো ভাত দলা দলা গিললাম, বিড়ালের নামে মনে মনে মাথা কুটলাম; কিন্তু কিছুই হলো না। তার পরদিন গায়ত্রী জপ করার সময় দেখি কাঁটা নেমে গেছে—মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল। মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল আরেকবার স্বচক্ষে দেখেছিলাম। ঘরে বসে সবাই পড়ছি—কাকারা আছেন। ঘরের ভিতর একটা গুব্‌রে পোকা ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছে। সেজকাকা বললেন—"দেখবি, ঐ যে গুব্‌রে পোকাটা উড়ছে, এখনি মন্ত্রবর্লে ওটাকে মাটিতে ফেলবো! হাত মুঠো কর, জোরে ধর।" সত্যিদেখতে দেখতে পোকাটা গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে পড়লো। মন্ত্রের শক্তি হাতে-নাতে প্রমাণিত হলো। যাহোক, গায়ত্রী জপ করতে করতে গলা থেকে মাছের কাঁটা নেমে যাওয়াতে মন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বাবা জপতপ করতেন, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি দেখাতেন—কতখানি আন্তরিকতা ছিল জানি না। একদিন সকালে বাবা বসে আছেন বারান্দায়, আমরা ঘরে পড়ছি এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাজির—খড়ম পায়ে, সামান্য বস্ত্র গায়ে।

শীতকাল তখন। সন্ন্যাসী এসে বাবার সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা শুরু করলো। সবাই মুগ্ধ—সাহেব বাংলা বললে যেমন আশ্চর্য হই, তেমনি সন্ন্যাসীকে ইংরেজি বলতে দেখেও কম আশ্চর্য হলাম না! যাবার সময়ে বাবার গায়ে কমলালেবু রঙের যে গরম-ধোসাটা ছিল, সেটা পুরস্কার পেয়ে পিট্টান দিল।

দুপুরে স্কুলে যাবার আগে আমরা দু'ভাই খাচ্ছি,—মাথায় ঘুরছে সকালের ঘটনাটা। খাওয়ার সময় মৌনী থাকি—উপনয়নের পর এক বৎসর এ-নিয়ম মানতেই হয়, অথচ খেতে খেতে ভুলে গেলাম সে-কথা। হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এলো—"দাদা, সন্ন্যাসীটা কেমন ইংরেজি বললো!" দাদাও মৌনী; তিনি বলে ওঠেন—"এই, তুই কথা বললি!" বলেই বোঝালেন উভয়েই পাপ করেছি—সুতরাং আর অন্নগ্রহণ করতে পারবো না। দাদা পাত ছেড়ে উঠতে উঠতে আমাকে বললেন—"গেট আপ্, গেট আপ্!" আমি গেট আপ্ (Get up) করলাম,—তবে মাথ. ভাতগুলো গলাধঃকরণ করার পর।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ভয়াবহতার কথা আজকের লোক আর জানে না, যদিও ইদানীং আবার শুরু হয়েছে। কিন্তু শতাব্দী-পূর্বে এই ব্যাধির আবির্ভাবের পর কত কোটি লোক যে মরেছিল মশার দংশনে, তার হিসাব দেওয়া যাবে না। হিসাব চাইলে দশশালী আদম সুমারের খণ্ডগুলি দেখতে বলবো। প্লেগ মহামারীর মতো হঠাৎ মারতো না ম্যালেরিয়ার বীজাণু, ধীরে ধীরে জীর্ণ করতো দেহমন। ভুগতে ভুগতে যারা বেঁচে থাকতো, তারা উৎসাহহীন আধমরা জীবমাত্র। মনে আছে অমাবস্যা, পূর্ণিমায় কেঁপে জ্বর আসতো, লেপকম্বল চাপা দিয়ে পড়ে থাকতাম। পরে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তো। ডাক্তাররা বলতেন 'ডি. গুপ্ত' খাও। 'ডি. গুপ্ত'র অর্থ হচ্ছে দ্বারিকানাথ গুপ্তের পেটেন্ট দাওয়াই। কুইনাইন তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতো। পোস্টাপিসেও কেনা যেতো কুইনাইনের বড়ি, শিশি। 'ডি. গুপ্ত' খেয়ে কিছুই হয় না। মাসান্তে কেঁপে জ্বর আসে। তখন বাজারে 'গোবিন্দ সুধা' নামে ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধের চল হয়েছে। 'ডি. গুপ্ত'র অনুকরণে কোনো বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী এই দাওয়াই চালু করেন। কুইনাইনে জ্বর চাপা পড়ে, রোগের মূলে আঘাত পড়ে না। তখন স্থির হলো কবিরাজী চিকিৎসা। চূর্ণি নদীর তীরের গ্রাম রঘুনাথপুরের বনমালী কবিরাজের যেমন নামডাক, তেমনিই হাতযশ—লোকে বলে ধন্বন্তরি। লম্বাচওড়া প্রৌঢ় মানুষ—মুখে একটিও দাঁত নেই, গোঁফদাড়ি কামানো, কথা মুখ ফসকে ফসকে বের হয়। তিনি দেখতে এলেন আমাকে। থার্মোমিটার দিলেন না জ্বর দেখবার জন্য—নাড়ি টিপে অনেকক্ষণ পরে বললেন বি-জ্বর হয় না। ঔষধ দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা হলো—সুজির রুটি, মাগুর মাছের ঝোল। অন্ন নিষেধ। স্নান নিষেধ। শুনেছিলাম কবিরাজ মশায় স্বয়ং নাকি চল্লিশ বৎসর স্নান করেননি।

বনমালী কবিরাজ রঘুনাথপুর গ্রামেই থাকেন। তিনি চিকিৎসা করছেন। মাসে মাসে একবার করে যেতে হয় তাঁর কাছে। চূর্ণি নদীর ধারে গ্রাম, যেতে হয় নৌকোয়। সঙ্গে যায় বাড়ির পুরাতন দাসী হুটি। নৌকোয় এই কয় ঘণ্টা যাওয়া-আসাটা খুবই ভাল লাগে। সিনেমার ছবির মতো আজও সেই দৃশ্য মনের পর্দার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। তখনও চূর্ণি নদীতে কচুরিপানা আসে নি, আর নদীর কিনারায় মুনিসিপালিটির ফেলা জঞ্জাল নদীপথ সংকীর্ণ ও বহতাকে

বাধাপ্রাপ্ত করেনি। চূর্ণির উপর সেতুও নির্মিত হয়নি—হাঁসখালির ঘাট পর্যন্ত ট্রেন আসে রাণাঘাট জংশন থেকে। দেখতাম নদীর ধারে ট্রেন দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। ওপারে শান্তিপুরে যাবার ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা নৌকোয় পার হয়ে সেই গাড়িতে চড়বে। বহু বৎসর পরে নৌকোযোগে বেড়াতে গিয়ে সেই জায়গাটা সনাক্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম—দেখলাম কতকগুলি ভাঙা ঘরের চিহ্ন আছে পড়ে, আজ বোধ হয় তাও নেই।

ভাত না খাওয়া, স্নান না করা সব সয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রতিদিন তিনবার করে কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ খাবার সময়ে চোখে জল আসতো—ওষুধের জন্য নয়—বড়ি গুঁড়ো করে মধু দিয়ে খেতে হতো। কিন্তু অনুপান দিয়ে তার যে বিকট স্বাদ-গন্ধ হতো তা সহ্য করতে পারতাম না। খল-নুড়ি চেটে চেটে খেতে হতো। কাল-পরিবর্তনে আধুনিক কবিরাজেরা স্টেথিসস্কোপ, থার্মোমিটার প্রভৃতি ব্যবহার করেন, সেলোফোনে মোড়া বড়ি বা গুঁড়া ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেন, এলোপ্যাথির ঔষধে সংস্কৃত নাম জুড়ে দিয়ে শোধন করে নেন। স্বর্ণ-অভ্র শতবার জারণ করেন না কেউ। বিজলি-চুল্লিতে স্বর্ণ-অভ্র মিশ্রিত হয়ে মকরধ্বজ প্রস্তুত হচ্ছে। যাক সে আলোচনা।

দেশের গ্রামে বাড়ি করা থেকে বাবার শরীর ভাঙতে শুরু করে। এই ভোগান্তির জন্য দায়ী সমাজ সংসার ও স্বয়ং যিনি ভোগেন তিনি। Public Health বা জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা সমাজ সংস্থানের উপর নির্ভরশীল। Personal Hygiene বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জন্য দায়ী individual। আসলে অজ্ঞানতা, ঔদাসীন্য হেতু মানুষ ব্যাধিতে ভোগে। শহরের জনস্বাস্থ্য অবর্ণনীয় ছিল [এখনো বিশেষ কি পরিবর্তন হয়েছে ?]। খাটা পায়খানা, খোলা নর্দমা, ধুলোভরা রাস্তা। সেই নারকীয় পরিবেশ আজ মনে হলেও সমস্ত দেহমন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডার ভয়ে জানলা বন্ধ করেই মা খুশি হতেন না, কাগজ দিয়ে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতেন। Ignorance is not innocense but sin। মূঢ়তার খেসারত দিতেই হয়।

ভুগতে ভুগতে সবারই মনে হলো দোষ বাড়িটার। পুরুত ডেকে স্বস্ত্যয়ন করা হলো। কিন্তু মন্ত্রবলে ম্যালেরিয়ার বিষভূত তাড়ানো গেল না। তখন সেই বাড়ি ত্যাগ করাই স্থির হলো। কাছে মোড়ের মাথায় একটা বাড়ি পাওয়া গেল, পূর্বে সেখানে একঘর গাঁড়াল বাস করতো। এ নামের জাত আজ আর শুনিনে। তারা ছোলা, কুটকলাই ভাজে, খই, মুড়ি তৈরী করে। প্রায়ই গরম কুটকলাই আনতাম কিনে। মনে পড়ছে তাদের বাড়ির কাছেই একটা 'জিওল'

গাছ ছিল। সেই গাছের গা থেকে ঘন আঠা বের হতো, বই কাগজ আঁটবার জন্য তা সংগ্রহ করে আনতাম। আজকাল তো দোকান থেকে 'গ্নয়' কিনে আনি। কালে সে গাছ কাটা গেল, গাঁড়ালরা কোথায় উঠে গেল, নূতন মালিক ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিলেন। এলাম সে বাড়িতে, কিন্তু ম্যালেরিয়া? সে তো জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

* * * *

ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ দূষিত বায়ু। রোম মহানগরীর পাশে ক্যাম্‌পেনিয়ার সোঁতা ভিজে জমি ছিল—জ্বরে জ্বরে দেশ উজাড় হতে থাকে। লোকবিশ্বাস দূষিত বায়ু থেকে ম্যালেরিয়ার জ্বর হয়। বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের পর দ্রুত রেলপথ নির্মাণের ফলে বৃষ্টির জল ও নদীর ধারার সহজ প্রবহমাণতা বাধা-গ্রস্ত হতে থাকে। তারপরই বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিল। বর্ধমান ফিভার বলে কথাটা চালু হয়। এককালে বর্ধমান ছিল স্বাস্থ্যকর স্থান। এদেশের ডাক্তারবাবুরা বললেন, বায়ু পরিবর্তন না করলে এ জ্বর ছাড়বে না। বাঙালী জ্বরের জ্বালায় গ্রাম ছাড়লো—অনেক গ্রামই তো জনমানবশূন্য। আমরা গ্রাম ছেড়েছি, এবার দেশ ছাড়তে চলেছি। মা বাবাকে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে যাবো।' বাবা ভেবেই পান না কোথায় টাকা। আর চেঞ্জেই বা যাবেন কোথায়। বাঙালীর ঘর ছাড়লে আঙিনা বিদেশ। বাইরের দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আমরা সবাই। স্থানীয় মুন্সেফবাবু অতি মহাশয় ব্যক্তি, বাবা অসুস্থ হলে প্রায়ই খবর নিতে আসতেন। তিনি বললেন, 'গিরিধি যদি চেঞ্জে যান, তবে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার এক আত্মীয় ফকিরবাবু সেখানে থাকেন। তাঁকে লিখলে বাসার ব্যবস্থা হতে পারে।' গিরিধি যাওয়া ঠিক হলো। কিন্তু টাকা? যে ভদ্রলোক টাকা দেবেন বলেছিলেন, তিনি এসে মাকে বললেন, 'বৌমা, টাকার যোগাড় করতে পারলাম না।' তাঁর কাছে বহু আসবাব বাসনপত্র রেখে যাবার কথা হয়েছিল। বোঝা গেল তাঁর শঠতা!

মা তখনই কাঁসারীদের ডেকে পাঠালেন। রানাঘাট এককালে কাঁসারীদের তৈজসপত্র তৈরীর জন্য খ্যাত ছিল। সেকরা ডাকলেন। হাতের চুড়ি ছাড়া যা গয়না ছিল বিক্রী করলেন। কাঁসারীরা নিল বাসনপত্র। সেকালে একটা মধ্যবিত্ত ঘরে কী পরিমাণ কাঁসা-পিতল-তামার বাসনপত্র থাকতো তা আজ নাগর-জীবনের বাসিন্দারা কল্পনাই করতে পারবেন না। এসব পৈতৃক সম্পত্তি। বেশীর ভাগ পূজার সামগ্রী। কাকাদের সঙ্গে বিষয়ভাগের সময় এইসব অস্থাবর

সম্পত্তির ভাগাভাগি হয়। পুজোর সরঞ্জামই বেশী—বড় বড় থালা, বাটি, ঘড়া, কলসী, তামার বিরাট কোষাকুষি। দুই ভাই ধরে কোষাটা তুলি; দাদা বললেন, 'এই রকম কোষা ছুঁড়ে ইন্দ্রজিত বোধ হয় লক্ষ্মণকে যজ্ঞঘরে মেরেছিলেন!' কিছুদিন পূর্বে রাণাঘাটে ভদ্রেরা 'মেঘনাদ বধ' থিয়েটার করেছিলেন, তখন এই দৃশ্যটা দেখি।

কাঁসারী বাসনপত্র কিনে নগদ টাকা দিয়ে গেল। আজ এলুমিনিয়াম, স্টেনলেস, প্লাস্টিকের বাসন অব্যবহার্য হয়ে গেলে তার মূল্য যা পাই তা কারও অজানা নেই। যে খাগড়া কাঁসার ফেরো-ঘটিতে জল খাই, তা এই পরিবারে তিনপুরুষ চলছে। এখন তাকে বিক্রী করলে সেকালের কেনা দামের চারগুণ দাম পাবো—কাঁসার এখন এতো দর। হাতে যা টাকা এলো তার উপর ভরসা করে দেশ ছাড়া স্থির হলো।

দেশ থেকে এলেন বাবার জেঠামশায়—যিনি ছিলেন অভিভাবক এককালে। মাকে তিনি কত বোঝালেন—দেশ ছেড়ে যাবার কত বিপদ। সবাই নাবালক। মা ভাবছেন দেশে থেকেই বা কার কাছ থেকে কী সহায়তা পাচ্ছেন! সে-সব কথা না তুলে মা বললেন, 'লক্ষীন্দরকে নিয়ে বেহুলা ভাসবেই। আমার স্বামীকে যদি সুস্থ করে তুলতে পারি তবেই দেশে ফিরবো।' দেশ ছাড়বার দুই বৎসর পরে বাবার মৃত্যু হয়—মা কখনো আর দেশে ফেরেননি।

পশ্চিম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত—বর্ধমান ছিল জ্ঞানের শেষ সীমান্তে—তার পশ্চিমে সমস্ত জগৎ অজ্ঞাত। গিরিধি যেতে হলে ঝাঁঝা, শিমুলতলা কি বৈদ্যনাথ পড়বে? এই কটা নাম জানতাম—বৈদ্যনাথ তীর্থস্থান, আর শিমুলতলায় সুরেন বাঁড়ুজ্জে যেতেন হাওয়া খেতে। আর ঝাঁঝার খ্যাতি এস. পি. চ্যাটার্জির ফুলবাগানের জন্য। শুনতাম ডাউন পাঞ্জাব মেল চ্যাটার্জির বাগানের ফুল নেবার জন্য সেখানে থামতো। তখন কলকাতা বড়লাট, ছোটলাটের রাজধানী—আর উপরতলার প্রায় পনেরো আনা অফিসারই খাস ব্রিটিশ। একথা মানতেই হবে, সাহেবরা ফুল ভালবাসে। নিউ মার্কেটে তাই ফুলের কদর ছিল।

পুজোর ছুটি। দাদা কলকাতায় রিপন কলেজে পড়ছেন। এসেছেন ছুটিতে। স্থির হলো এবার গিরিধি যেতে হবে। দাদা স্টেশনে গিয়ে জেনে এলেন কোথায় কি ভাবে হবে। টাইমটেবল সেদিন সুলভ ছিল না—অথবা আমাদের প্রয়োজন হতো না বলে সেসবের খবরও রাখতাম না। আজ অকারণে প্রায়ই নিউম্যানদের

ব্র্যাড্‌শ কিনি—ভারত-পাক-এর সব রেলপথের খবর পাই—যাই বা না যাই পাতা উল্টে উল্টে মানসভ্রমণের বিলাস থেকে বঞ্চিত হবো কেন?

একটা সংসার চলেছে—মালপত্র কম হলো না—এমন কি বাবার শখের দুখানা ইজিচেয়ারও। লগেজে গেল বেশির ভাগ মাল। বাহিনীটি বেশ বড় —আমরা পাঁচ ভাইবোন, মা, বাবা ও যুধিষ্ঠির নামে ওড়িয়া সেবক। ছোট বোন কল্যাণীর বয়স মাত্র দুই বৎসর—খুবই রোগা ও রুগ্ন। তার সেবা করে যুধিষ্ঠির —একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। মনিবের সৌভাগ্য অমন সেবক পাওয়া।

ভোররাতে ট্রেন ধরতে হবে—তবেই তিনটে জংশানে সময়মতো ট্রেন ধরে বিকেলে গিরিধি পৌছানো যাবে। বিদেশে-বিভুঁয়ে সন্ধ্যার আগে না পৌছলে মুশকিলে পড়তে হবে—তাই ভোররাত্রে ট্রেন ধরার ব্যবস্থা।

শেষরাতে খেয়ালির গাড়ি এলো, আরও একটা। ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম —বাগাঘাট মুনিসিপালিটির মসীমাখা পথের আলো ঝিমিয়ে এসেছে। পনেরো বৎসর পূর্বে এই শহরে জন্মেছিলাম—শৈশব, বাল্য, কৈশোরের শত বন্ধন স্মৃতি নিয়ে চলেছি সে-স্থান ত্যাগ করে। মৃন্ময়ী পাষাণী ধরণীতে কোনো রেখা পড়ে না। এখন মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হ'তে বিদায়' কবিতাটি।

স্টেশনে এলাম। এতো রাতে কখনো স্টেশন দেখিনি। গ্যাসের আলো জলছে প্ল্যাটফর্মের এপারে ওপারে থরে থরে। এই আলো এসেছে কয়েক বছর আগে মাত্র। আমরা দেখতাম রেড়ির তেলের আলো। স্টেশন মাস্টারের ঘরে, বুকিং অফিসে টেবিলের উপর থাকতো ঘষা কাঁচের চৌকোনা বাক্স—যার মধ্যে থাকতো কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প—ঘটিপানা চিমনি বসানো। সকালে দেখতাম বাতিঘরের সামনে কত রকমের বাতি—রেড়ির তেল পড়ে পড়ে স্থানটা জ্যাবজেবে হয়ে আছে।

গ্যাসের আলো তৈরীর জন্য এলো লোহার বিরাট একটা ড্রাম, আর কত যন্ত্রপাতি—কাঁচা কয়লার স্তূপ। গ্যাসের আলো আসার সঙ্গে জংশন স্টেশনে এলো সোরাবজীদের রেস্তোরাঁ বা খানাঘর। সাহেবদের মতো দেখতে, অথচ সাহেব নয় এরা। প্যান্টালুন পরে বটে, তবে গায়ে লম্বা গলাবন্ধ কোট, মাথায় হ্যাট্ ক্যাপ নয়—গোল টুপি। শুনলাম এরা পার্সি। কিন্তু পার্সি বলতে কী বোঝায় জানতাম না, শুধু জানতাম এরা বোম্বাইয়ের লোক—এরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—আর পারস্তবাসীও নয়। তবে দাদাভাই নৌরজীর নাম শুনেছি —যখন সন্তান সম্প্রদায়ের আড্ডায় 'দেশের কথা' পড়া হতো। আরও শুনেছি, এ বৎসর কলকাতায় কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হবেন।

সোরাবজীর খানাঘর দূর থেকেই দেখতাম—কাছে যাবার সাহস হতো না। উঁকি মেরে দেখি গোল টেবিলের উপর ধবধবে চাদর পাতা, চীনামাটির বাসনপত্র, কাঁচের গেলাস, তার মধ্যে রুমাল অদ্ভুতভাবে ভাঁজ করে রাখা—যেন পাখী বসে আছে। উর্দি-পরা খানসামারা চলাফেরা করছে কলের মতো—সমস্ত কী পরিষ্কার, ছিমছাম! স্কুলের কাছে 'হিন্দু হোটেল' মনে পড়ছে। চূর্ণি পেরিয়ে যারা আসতো শহরে তারা এই হোটেলে খেতো। খড়ের ঘর হুমড়ে পড়ছে, মাটির মেঝে। কুশাসন পেতে উবু হয়ে বসে লোকে খাচ্ছে দেখতাম। খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো কলার পাতা রাস্তার অপর পাড়ে ডাঙায় ছুঁড়ে ফেলে আসতো। উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে কলাপাতার উপর। কী পেতো জানি না—তবে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম কোলাহল ও আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করতো। মনে পড়ছে আরও কত ঘটনা, কত ছবি স্মৃতির দর্পণে দেখতে পাচ্ছি। জংশন বড় হয়েছে—এখন ট্রেন আসছে কৃষ্ণনগর থেকে, শান্তিপুর থেকে, বহরমপুর থেকে—সরাসরি চূর্ণি নদীর উপর ব্রিজ হয়ে গেছে। নূতন স্টেশন মাস্টার এলেন, কালোপানা মানুষটি, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, একটু কুঁজো। কী চটপটে! প্ল্যাটফর্মে বিনা টিকিটে যখন-তখন প্রবেশ হলো মানা—তিনি বিনা-টিকিট যাত্রীদের যম। একদিন দেশের বাড়ি যাচ্ছি—দেখি দাদার এককালীন সহপাঠী এক ছোকরা স্টেশন মাস্টারের ঘরে তাঁর পায়ের কাছে বসে কাকুতি-মিনতি করছে—বিনা টিকিটে এসে ধরা পড়েছে। ছেলেটা পয়লা নম্বর বকাটে, সাজসজ্জায় অতিরিক্ত মনোযোগী। ভেবেছিল তাই দেখে সমীহ করে পথ ছেড়ে দেবে টিকিট-কালেক্টার। কিন্তু নূতন স্টেশন মাস্টারের কড়া হুকুম সেকালে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হতো অধস্তন কর্মচারীদের। ছেলেটির অবস্থা দেখে সেদিন মনটা খারাপ হয়ে গেল। কয়েক বৎসর পরে কলকাতার 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে' দেখেছি—প্রায় সামনের বেঞ্চে বসে থাকতে—সেই তেলচুকচুকে মাথা, সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি খুবই। ভাবখানা তার—সেই অপরূপ রূপে যদি কোনো তরুণী মুগ্ধ হয়।

বহুদিনের পরিচিত স্টেশন ছেড়ে চলেছি। অন্ধকার থাকতেই ট্রেন এলো গোয়ালন্দ থেকে—আজ সেখান থেকে ট্রেন আসে না। চাকদহ তখন নগণ্য স্টেশন—জনহীন চারিদিক। ট্রেন থামলো না। প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে গাড়ি চলে গেলো। দেখলাম বাবা তাকিয়ে আছেন সেই আঁধার আলোছায়ায় ঢাকা তাঁর জন্মভূমির দিকে। সে গ্রাম আর তিনি দেখেননি। জানি না তাঁর মনেও কি অতীতের কথা জাগছিল! তাঁর জন্মভূমি অদূরে।

নৈহাটিতে ট্রেন বদল করতে হলো। মালপত্র নিয়ে নামা—পুনরায় ওঠা।

এবার এলাম ব্যাণ্ডেল জংশনে। এ জংশন নূতন হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে বর্ধমানে যাই মামার বাড়ি, তখন জংশন ছিল হুগলীতে—এখনো সেই পরিত্যক্ত পথের চিহ্ন আছে স্টেশনের কাছে! পশ্চিমযাত্রী গাড়ি এলো—হাওড়া থেকে। হাওড়া স্টেশন আমাদের ভূগোল জ্ঞানের বাইরে—কখনো সে স্টেশন দেখিনি—প্রথম হাওড়ায় যাই ১৯০৮ সালে—গিরিধি থেকে—কলকাতা ন্যাশনাল কাউন্সিলের পরীক্ষা দিতে।

আমরা থার্ড ক্লাস যাত্রী। সেকালের গাড়িগুলো ছিল সব খাঁচায় খাঁচায় ভাগ করা—শৌচের ব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় স্টেশনে এসে থামতো অনেক-ক্ষণ। একটা খাঁচা-ঘরে আমরা সবাই উঠেছি। দাদা সারারাত স্টেশন-ঘর করেছে—খুবই ক্লান্ত। বসে বসেই ঝিমুচ্ছে। আমি দেখছি চারিদিকটা—আজও সেই দেখার চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

বিকেলে ট্রেন এসে থামলো মধুপুরে। পূজার ছুটিতে বহু বাঙালী চলেছেন গিরিধিতে—কত ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী। মেয়েরা ফ্রক পরা, পায়ে জুতো মোজা। তারা ব্রাহ্ম—জেনেছিলাম পরে। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তথনো ধারণা অস্পষ্ট। মধুপুর স্টেশনে দেখি একজন ভদ্রলোক, লম্বা দাড়ি, বেঁটেখাটো, হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ—কাঁধে একটা 'কোরিয়া' ব্যাগ—খুব ঘোরাঘুরি করছেন গিরিধিযাত্রীদের মধ্যে। পরে জানতে পারি ইনি শশিভূষণ বসু—এঁর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পরে আসবে। এই আদর্শ ব্রাহ্ম পরিবারের স্পর্শে এসে আমাদের ধর্মজীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে।

মধুপুর থেকে গিরিধি শাখা রেলপথ—গিরিধিই শেষ স্টেশন। মাঝে দুটি স্টেশন জগদীশপুর ও মহেশমোন্ডা। জগদীশপুরে স্টেশন থেকে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি পাকা বাড়ি—প্রকাণ্ড হাতিয়ার মধ্যে। মধুপুরেও দেখতে পেলাম সে রকম বাড়ি ট্রেন ছাড়তেই। এককালে ম্যালেরিয়ার ভয়ে অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালী মধুপুর, দেওঘর, গিরিধিতে ঘরবাড়ি বানিয়েছিলেন—পূজা ও খৃষ্টমাসের সময়ে যেতেন বেড়াতে। কয়দিন শহর আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠতো। আজ শুনি সেখানে বাঙালী আর যায় না, ঘরবাড়ি সবই বিক্রী হয়ে গেছে—যেগুলোর সদ্‌গতি হয়নি, সেগুলো হানাবাড়ি হয়ে পড়ে আছে। কেন এ অবস্থা হলো তা গবেষণাসাপেক্ষ। আজ বঙ্গদেশ সবার জন্য উন্মুক্ত, আর বাঙালীর দ্বার সর্বত্রই বন্ধ হয়ে আসছে। কেন?

গিরিধি স্টেশনে ফকিরবাবু ছিলেন। তিনি বললেন যে তাঁর বাড়ি বাজারের কাছে এক গলির মধ্যে, তাঁর বাড়ি খালি পড়ে আছে, পরিবারের লোকেরা দেশে

এখন। সব ব্যবস্থাই আছে। তাই ঠিক হলো, ফকিরবাবুর বাসায় উঠবো। পরে নিজেদের ভাড়াবাড়িতে যাবো।

মালপত্র অনেক, ব্রেকভ্যান থেকে খালাশ করা হলো। স্টেশনে দেখি অদ্ভুত এক রকম গাড়ি—শুনলাম তাকে বলে পুশ্‌পুশ্‌—মানুষে ঠেলা পালকি গাড়ি। পালকি মানুষের কাঁধে চলতো, পালকি চার চাকার উপর তুলে কলকাতার সাহেবরা ঘোড়ার গাড়ি বানান—এখানে পালকি চাকার উপর তুলে মানুষে টানছে ও ঠেলছে পুশ্‌পুশ্‌। কুলিরা স্থানীয় লোক, তাদের ভাষা না-হিন্দী, না-বাংলা। কুলিদের দেহে বস্ত্র-দৈন্য, কিন্তু মাথায় জড়ানো অনেকটা কাপড়; আর পায়ে জুতো। তবে সেই 'নাগরা' জুতো অসংস্কৃত চামড়া বা hide দিয়ে তৈরী। তলায় লোহার গুলো লাগানো। গোড়ালিতে ঘোড়ার খুরের 'নাল'। পথে বের হয়ে বুঝলাম কাঁকরপথে নগ্নপদ নিরাপদ নয়—তা ছাড়া পাথরের টুকরো রোদের তাপে এমনই তপ্ত হয় যে খালি পায়ে চলা কষ্টকর। আর রোদের জন্য মাথায় পাগড়ি বাঁধে লোকে।

স্টেশন থেকে বের হয়েই সামনে দেখলাম বিস্তৃত আঙিনা—জৈনদের ধর্মশালা। আঙিনার মধ্যে পুশ্‌পুশ্‌ তো আছেই, তা ছাড়া আছে একটা বিরাট দোতলা গাড়ি—উটে টানে। পরেশনাথের পাহাড় জৈনদের তীর্থস্থান; সেখানে যায় ভক্তের দল। গিরিধি থেকেই পথ গিয়েছে হাজারিবাগে—জেলার সদর [বর্তমানে গিরিধি পৃথক জেলা]। সদরের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ সেকালে ছিল না, আজও নেই। সেকালে পুশ্‌পুশ্‌ বা উটের গাড়ি ছিল ভরসা, আজ ট্যাক্সি ও বাস।

দিন দুই-তিন ফকিরবাবুর বাসায় থাকি। বড় রাস্তার ধারে চোখে পড়লো, বাংলায় লেখা 'মাতৃভাণ্ডার'। বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে টুকিটাকি জিনিস কেনা হলো। এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দোকানে আছেন—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বদেশী মনোহারী দোকান খুলেছেন। প্রসঙ্গত বলা উচিত—ছোটনাগপুর বিহার তখন বাংলা প্রেসিডেন্সিভুক্ত। সুতরাং বাংলা ভাষার কদর তখন ছিল—আজ? থাক সে আলোচনা।

বাজার থেকে বের হয়ে রেলের পুল পার হয়ে যে পথ পচম্বার দিকে গেছে, সেই রাস্তার উপর নূতন ভাড়াবাড়িটা পাওয়া গেছে। সুবিধার মধ্যে কাছারি স্কুল হাসপাতাল কাছে। পাড়াটাকে উকিল-মোক্তার পাড়া বলা যেতে পারে। বাড়িটাতে খোলার চাল—বাংলাদেশে এ ধরনের বাড়ি দেখিনি; এখন তথা-কথিত 'রাণীগঞ্জ' টালির বাড়ি শহরতলীতে দেখা যায়—গ্রামাঞ্চলেও প্রবেশ

করছে। বাড়ির সামনে বারান্দা—ভিতরে দুখানা ঘর—একটা পরচালা জোড়া। রান্নাঘর, পায়খানা, কূপ সবই ছিল—ছ টাকা ভাড়া মাসে। খোলার ঘর গরম হয় গ্রীষ্মের সময়ে, শীতের সময় ঠাণ্ডা হয়—তাই বাড়ির মালিক 'খলিফা' ঘরের ভিতরে গানি কেটে চট্ বানিয়ে সীলিং করিয়ে দেয়। তবে তক্তপোশের উপর দাঁড়ালে সীলিং মাথায় ঠেকতো। বাবা, মা, ভাইবোনেরা ভিতরের ঘরে, আমরা দুই ভাই বাইরের ঘরে দড়ির খাটিয়ায় শুই। দুজনে এক খাটিয়ায় শোয়ার অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তারা বুঝবেন না কী আরামে রাত কাটে। দুজনেই গড়িয়ে মাঝ-খানে পড়ছি, ঘুমের ঘোরে। দাদা আমায় ঠেলে, বলে, 'সরে শো'; আমি একটু পরে বলি, 'দাদা, সরে শো'। কদিন পরে দুই ভায়ে যুক্তি করে খাটিয়া বের করে দিলাম। স্থির হলো সাহেবী কায়দায় ইজিচেয়ারে শোয়া যাক। দুখানা ইজিচেয়ার দেশ থেকে আনা হয়েছিল—তাতে পা লম্বা করে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায়। রাতে শুলাম তো। কিন্তু ঘুম হবে কেন? একবার মাথা ডানদিকে, একবার বাঁদিকে পড়ছে—পাশ ফিরে শোবার জো নেই। আমি দাদাকে শুধুই, 'দাদা ঘুমুলি নাকি?' দাদা বলেন, 'তুইও যেমন ঘুমুচ্ছিস।' পরদিন বাবা-মা আমাদের সায়েবী ভাবে ঘুমের কথা শুনে খুব হাসলেন। তারপর খলিফাকে বলে একটা কাঠের খাট যোগাড় করা হলো। চেয়ারে ঘুমুবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার দিল্লী যাবার পথে 'ভেস্টুবেল কার'-এ। আমি তার নাম দিয়েছি দাঁত-তোলা চেয়ার। ঐ রকম চেয়ারে বসিয়ে লালা আমার দাঁত তুলেছিল বৃদ্ধ বয়সে।

ঘর-সংসারের কাজ অবিস্মরণীয় চরিত্র সেবক যুধিষ্ঠির সামলায়। তবু একটা 'দাই' রাখা হলো। শব্দটা 'ধাত্রী'র অপভ্রংশ, যেমন বাংলা 'ঝি', সংস্কৃতে দুহিতৃ শব্দের রূপান্তর। এদেশের 'দাই'রা দীর্ঘ শাড়ি পরে, গায়ে আঙরাখা আঁটে, হাতে কাঁসার মোটা বালা, গলায় রূপোর হাঁসুলি, কানেও আছে গয়না। এমন সাজগোজ করা মেয়ে বাংলাদেশে 'ঝি'গিরি করতে এলে সেকালের গৃহিণীরা আড়ালে কর্তাদের বলতেন—'এ খারাপ মেয়ে, দেখছো না সাজগোজ!' আমাদের আদর্শ ছিল 'ঝি' একবস্ত্রী হবে—সর্বাঙ্গ দেখা গেলেও দোষের নয়—সেগুলি আবৃত করে এলেই সে বেচারী 'বেবুশ্যা'। আজকাল পেটিকোট, ব্লাউস পরা ছাড়া দাসী দেখা যায় না—কাল কত পরিবর্তন হয়ে গেছে!

বাড়িতে গরু এনে দুধ দুইয়ে দিয়ে যায় তোরাপ গোয়ালা—খাঁটি দুধ টাকায় দশ সের। আজ সেখানে টাকা সেরেও খাঁটি দুধ মেলে না শুনি। রেলপুল পার হয়ে হাটে যাবার পথের ধারে ছিল বিশাল 'গদ্দি মহল'—সেটাই ছিল মুসলমান গোয়ালাদের বাসস্থান—মাঝে মাঝে গিয়েছি সেখানে। 'গদ্দি মহল'

নাম কেন জানি না।

বাবার জীবনে নূতন পরিচ্ছেদ শুরু হলো—স্বল্পকালের জন্ত। রাণাঘাটে প্রায় পনেরো বৎসর ওকালতী করে নূতন জায়গায় এলেন; অপরিচিত পরিবেশ, অজানা ভাষা। বিহার বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হলেও আদালতের ভাষা হিন্দী, উর্দু। বাংলাদেশের প্রতি তখনও মোহ ছিল। তাই বাংলা মুলুক থেকে 'বকীল সাব'—উকীল সাহেব এসেছেন—সংবাদটা মামলাবাজ মহলে রাষ্ট্র হতে সময় লাগেনি। দুজন মূহুরী জুটে গেলেন। একজন হিন্দু লালা কায়স্থ, অপরজন মুসলমান মুন্সি। হিন্দু লেখেন 'কায়থী' নাগরীতে, মুসলমান লেখেন উর্দুতে—দুটোই অজ্ঞাত। 'কায়থী' লিপি অনেকটা শর্টহ্যাণ্ড লেখার মতো—আকার, ইকার, উকার, একারের বালাই নেই। 'ভয় অজ মর গয়' লেখা কায়থী চিঠির ব্যাখ্যা এক পাঠক করলেন, 'ভাই আজ মর গিয়া'; অপরজন পড়ে বললেন, 'ভাই আজমীর গিয়া।' বোধ হয় 'কায়স্থ' বা বংশগত লেখক শ্রেণীর লোকে এই প্রায়-সাংকেতিক লেখ-প্রণালী চালু করেন; ফলে তাঁদের জাত বা পেশার মধ্যে সেই লেখন-কলাটা সীমিত হয়ে পড়ে; তাই লোকভাষায় 'কায়থী' লিপিটা চালু হয়। প্রসঙ্গত বলি বাংলাদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ ছাড়া 'কায়স্থ' শব্দটা সুপরিচিত নয়। লালা মুন্সী বাস করতেন কাছেই—একটা গলির ওপারে। সে-বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের ভাইবোনদের ভাব হতে বিলম্ব হলো না—ভাষার ব্যবধান, সাংস্কৃতিক ব্যবধান বয়স্কদেরই পৃথক করে রাখে, ছোটদের মধ্যে সে বাধা থাকে না। বহুকাল পরে দেখতাম শান্তিনিকেতনে চীনাভবন প্রাঙ্গণে শিশুদের খেলা—চীনা অধ্যাপক তায়য়ুনসানের চীনা শিশুরা, সংস্কৃত পণ্ডিত আয়াস্বামী শাস্ত্রীর তামিল ভাষাভাষী ছেলেমেয়েরা এবং সুজিত মুখুজ্জের বাঙালী শিশুরা একত্র খেলায় মত্ত—তাদের ভাষা তারাই বুঝতো।

গিরিধির কাছারি খুললে বাবা ওকালতী শুরু করলেন। পূর্বে বলেছি, বিহার তখন বঙ্গদেশের বিভাগ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল, কলেজ; আদালতও কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্গত। উকিলদের মধ্যে তখন বেশীর ভাগই বাঙালী—বিহারী উকিল ১৯০৬ সালে হয়তো ছিলেন, কিন্তু তাঁদের পসার প্রতিপত্তি ছিল না। মোক্তারদের মধ্যে সাম্রুদেরই ছিল নামডাক। আজ সেখানে বাঙালী উকিল, মোক্তার আছে কিনা সন্দেহ। সকলেই নিজ নিজ দেশের মানুষদের চায়—বিহার ফর্ বিহারীজ, আসাম ফর আসামীজ, উড়িষ্যা ফর্ ওড়িয়াজ—আর একমাত্র বাংলাদেশ ফর্ অল্। বাঙালী বাঁচাও বললেই

আমাদের দুর্নাম হবে—'ওরা কম্যুনাল-স্থানীয় স্বার্থের কাঙাল।' 'উদারতা এতো কি উদার?'

পূজার ছুটির পর গিরিধি হাইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্তি হলাম। ক্লাসে পনেরো-কুড়িটি ছাত্র—তার মধ্যে বিহারী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাঁওতাল। বাঙালী আমরা জন চার-পাঁচ। সুতরাং 'উচ্চ' শিক্ষার অবস্থা বিহারে কী ছিল তা অনুমান করতে পারা যাবে। স্কুলের শিক্ষকরা বাঙালী—অন্তত প্রধান শিক্ষক, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিক্ষক ও পণ্ডিতমশায় ছিলেন বাঙালী।

নূতন স্কুলে এসে দেখি লাইব্রেরীতে অনেক বই। হেড মাস্টার আশুতোষ আইচ, আমরা যাতে বই পড়ি তার জন্য ব্যবস্থা করে দিতেন। বই পড়ার ঝোঁক রাণাঘাট থেকেই শুরু হয়। মনে পড়ছে প্রথম দিকে বাবা ইংরেজি গল্পের বই পড়ে পড়ে বাংলা করে শোনাতেন। তারপর নিজেই শুরু করি। 'রবিন্সন ক্রুসো' বড় বইটা পড়ি, কী আগ্রহভরে ক্রুসো ও ফ্রাইডের কাহিনী পড়তাম তা আজও মনে আছে। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেছে, বাঁ হাতে প্রদীপ ধরে পরিচ্ছেদের শেষ কয় পংক্তি শেষ করছি। গিরিধির স্কুলের লাইব্রেরী থেকে আনলাম অ্যাবটের লেখা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। পাঁচ-ছয় শত পৃষ্ঠার ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের ছাপা বই—রোজ স্কুল থেকে এসে পড়ি। নিয়মিতভাবে পড়ে বইটা শেষ করলাম। নেপোলিওন তখন 'হীরো'। রাতে স্বপ্ন দেখি—যুদ্ধক্ষেত্রে আমি Lodi-র যুদ্ধে তরুণ বোনাপার্টি পতাকা হাতে সেতু পার হয়ে চলেছি, ফরাসী সৈন্যরা পঙ্গপালের মতো চলেছে পিছু-পিছু। বড় হয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যখন এই কর্সিকান সাহসীকের জীবনী পড়লাম, তখন আমার 'হীরো'র খড়ের কঙ্কাল বের হয়ে পড়লো। দেখলাম নরমেধ যজ্ঞ করে যাঁরা ইতিহাসে নাম পেয়েছেন ইনি তাঁদেরই অন্যতম। কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে 'হীরো'দেরও মান বদল হয়। কলকাতার গড়ের মাঠে একদিন 'হীরো' বলে যাদের মূর্তি খাড়া করা হয়েছিল—এখন সেসব পীঠগুলি শূন্য পড়ে আছে। এককালের 'হীরো'দের নামে পথঘাট পল্লীর নামকরণ হয়েছিল; আজ সেসব নাম অপরিচিত।

ইতিহাস পড়ার দিকে ঝোঁক বরাবরই। স্কুলে পাঠ্য ছিল অধর মুখুজ্জের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান পিপল' নামটা গ্রীন-এর বিখ্যাত গ্রন্থ History of the English People-এর অনুকরণ মাত্র। অধর মুখুজ্জের অপাঠ্য বইয়ের সঙ্গে গ্রীন-এর গ্রন্থের তুলনা হয় না—স্বাধীন দেশের লোক স্বাধীন দেশের ইতিহাস লিখেছিলেন, আমরা বিদেশীর লেখা বই পড়ে অধীনতার ইতিহাস শিখি—কি করে ভারত বারে বারে পরাভূত হয়েছে বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে।

এই অগৌরবের ইতিহাস পড়তে হতো ছোটবেলা থেকে। আজও ভাবি কেন ভারতবাসী কখনো কোনো যুদ্ধে বিদেশীকে পরাস্ত করতে পারেনি। কেন?

গিরিধির স্কুলে পেলাম জেম্‌স্ মিল্-এর লেখা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস। জেম্‌স্ মিল্ ছিলেন বিলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী—সমসাময়িক দলিলপত্র ঘেঁটেঘুঁটে কয়েক খণ্ড ব্রিটিশ ভারতের বিরাট ইতিহাস লেখেন। সব বুঝতে পেরেছিলাম, তা বলতে পারিনে—তবুও জোর করেই কয়েক খণ্ড পড়ে ফেললাম। এই বইতেই কি পড়েছিলাম 'Our conquest of the Punjab is no Conquest, but mere breach of trust?' আর একটা বই পড়ি খুব ভাল করে—সেটা রমেশচন্দ্র দত্তের Civilisation of Ancient India. নূতন জগৎ খুলে গেল। স্কুলের পাঠ্য (?) বইয়ে পড়তাম দি ভেদাস্ (The Vedas)। সেটা যে কি তা জানতাম না। এই বই পড়ে প্রথম 'বেদ' সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান হলো। পরে রমেশ দত্তর বাংলা অনুবাদ থেকে প্রয়োজনমত বেদ পড়েছি। এখন হ-র-ফ প্রকাশিত বেদ-মূল ও অনুবাদ পেয়েছি—হাতের কাছে থাকে।

গিরিধিতে পরিচিতের সংখ্যা বাড়ছে—ব্রাহ্ম পরিবারই বেশী—বারগণ্ডা অঞ্চল বাঙালিটোলা শুধু নয়—ব্রাহ্মপল্লী বললে ভাল হয়। আমরা যেখানে বাসা করেছি, সেই মকতপুর এলাকায় দেখি খোলার ছাউনি দেওয়া ব্রাহ্মমন্দির। মাঝে মাঝে যাই। গান হয়, ভগবানের নাম হয়, উপদেশ হয়। রাণাঘাটে রাধাবল্লভ-তলায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখেছি, সেখানে তো এভাবে ভগবানের নাম হয় না—কীর্তন হতে দেখেছি খোল-করতাল বাজিয়ে—যার এক বর্ণও বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ব্রাহ্মরা যে-গান গায়, তার শব্দ অর্থ বোঝা যায়। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে—ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে জানবার কৌতুহল হবার আরও কারণ ছিল। আমাদের ক্লাসে প্রমোদ রায় ছিল ব্রাহ্ম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা মাঠ পেরিয়ে তাদের বাড়ি—প্রায়ই যাই সেখানে। প্রমোদের মা খুবই স্নেহ করতেন। ক্লাসে দেখতাম ব্রাহ্ম বলে তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা চলে। এই হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিত না খৃষ্টান সাঁওতাল ছেলেরা। নাসীর বিহারী মুসলমান—আমার বিশেষ বন্ধু, সেই-ই প্রমোদকে বেশি জ্বালাতন করতো। তবে এসব কথা হাওয়ায় উড়ে যেতো, কেউ গায়ে মাখতো না। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে—সত্যকার জিজ্ঞাসা, সত্যধর্ম কি? আমি ব্রাহ্মণসন্তান, উপবীতধারী, অজাতের স্পর্শ বাঁচিয়ে ভোজন করি। রমেশ দত্তের ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধে যে বই পড়েছি, তাতে দেখছি

উপবীত ধারণ তো শূদ্র ছাড়া সবাই করতো। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞের সময়ে গলদেশে উপবীত ধারণ করতেন—সেইজন্য তাকে বলা হয় যজ্ঞসূত্র। বইয়ে পড়লাম—এই যজ্ঞসূত্র অনেক সময় কুশেরও হতো। আমি ভাবি, এ তো ভারি মজা! যাগযজ্ঞ না করে, সর্বদাই গায়ে লেপটে আছে কয়েকগাছা সুতো। আমি ভাবি, এটা কিসের চিহ্ন? শ্রেষ্ঠত্বের? আমি কিসে বড়? একদিন খসে পড়লো সুতো ক'গাছা। রামতনু লাহিড়ীর জীবনীতে পড়লাম (১৯০৩ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছিল), ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্ম হয়ে তিনিই উপবীত ত্যাগ করলেন—আদিকালে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্ম হয়েও উপবীত ধারণ করতেন। লাহিড়ী মশায়ের কাছে তা অত্যন্ত অসহ্য হয়।

একদিন মা দেখতে পেলেন আমার গলায় পৈতা নেই—রাতে চিরকুটে লিখে পাঠালেন, "প্রভাত, তোমার পৈতা কোথায়?" পরদিন বাবার বকুনির ভয়ে কোথা থেকে ক'গাছা সুতা সংগ্রহ ক'রে আবার গলায় দিলাম। মা চিন্তিত হয়ে ওঠেন আমার খামখেয়ালি দেখে; কিছুকাল মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়লাম। মনে ভাবি, আমাদের সঙ্গে ঐ কুকুর শৃগাল বাঘ সিংহের তফাত কোথায়? তারা কাঁচা মাংস খায়—আর আমি জীবন্ত প্রাণী মেরে তা মুখরোচক করে ভক্ষণ করি। বাবাকে মা এসব কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি দেখো, ঐ বেটাই সব আগে ষাঁড়ের লেজে কামড় দেবে।' বাবার কথা বর্ণে বর্ণে ফলে গেল—সমস্ত জীর্ণ বিশ্বাস একদিন পরিত্যাগ করলাম।

গিরিধির বারগণ্ডা পাড়ায় ল্যাণ্ড একুয়িজিশন সেটেলমেণ্ট অফিস—অর্থাৎ ভূমি অধিগ্রহণ অফিস ছিল। তারের ঝুলানো সেতুতে বেড়াতে যাই রোজ—পথের মোড়েই খাপরার এক বিরাট বাড়ি। সেটায় থাকেন সেটেলমেণ্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সপরিবারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের নূতন লাইন—গ্র্যাণ্ড কর্ড সদ্য খোলা হয়েছে। আসানসোল থেকে সীতারামপুর হয়ে মোগলসরাই-এ গিয়ে আসল (মেইন) রেলপথের সঙ্গে মিশেছে। এই রেলপথে পড়েছে গয়া, সাসারাম প্রভৃতি বড় বড় শহর। রেলপথ নির্মাণের জন্য বহু জমি গবর্মেণ্টকে আইনবলে অধিগ্রহণ (acquire) করতে হয়েছিল—এখন সেই সব জমির দাম মালিকদের দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্যেই এই সেটেলমেণ্ট অপিস। বাড়িটার মালিক শশিভূষণ বসু—সেই যে ভদ্রলোককে মধুপুর স্টেশনে দেখেছিলাম। এঁদের কথা পরে আসবে। পাশের পাকা বাড়ির মালিক

ডাক্তার নীলরতন সরকার—সেটা সেটেলমেণ্ট অফিস। ওই বাড়ির উত্তরে সাদা চুনকাম করা তকৃতকে বাড়ির মালিক কলকাতার বিখ্যাত নাগরিক সত্যানন্দ রায়। তিন বন্ধুতে তিনখানি বাড়ি কেনেন—বারগণ্ডা কপার কোম্পানির কাছ থেকে। এই কোম্পানীর কথা সংক্ষেপে বলে নিই এখানে, কারণ এই পল্লীর ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই কপার কোম্পানীর ধ্বংসকাহিনীর সাথে।

বারগণ্ডা নামটা অন্য জায়গা থেকে ধার করা—যেমন মথুরা থেকে মতুরা, অযোধ্যা থেকে আযুথিয়া। বরাকর নদীর ধারে 'বারগণ্ডা' গ্রামে তামার খনির সন্ধান মেলে। বিলাতে 'দি বারগণ্ডা কপার কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। তামা যেখানে পাওয়া গেল, সেখানে কয়লা নেই। গিরিধিতে কয়লা পর্যাপ্ত ও সস্তা—শহরটি রেলপথের সীমান্তে অবস্থিত জেলার প্রধান শহর হাজারিবাগ যেতে হয় এখান থেকে পুশ্‌পুশ্‌ ঠেলাগাড়িতে। সেখানে থাকেন রাজপুরুষরা—তখন সকলেই শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ। গিরিধির কাছেই পচম্বা, সেখানে খৃষ্টান মিশনারীরা আছেন—তাঁরাও বিদেশী-বিদেশিনী। এই সব বিবেচনা করে কোম্পানীর সাহেবরা গিরিধিতে উশ্রী নদীর তীরে তামা শোধনের চুল্লী, তামার তাল (ingot) রাখবার জন্য ঘর ও সাহেবদের থাকবার জন্য তিনটে বাড়ি তৈরী করেন। পূর্বে যে-তিনটে বাড়ির কথা বলেছি সেগুলি এই তামাখনির সাহেবদের জন্য নির্মিত হয়—সাহেবি ধরনের ব্যবস্থা—বাথরুম, ফায়ার-প্লেস প্রভৃতি সবই আছে।

বরাকর নদীর তীরে তামা (copper pyrites) আছে, এ খবর অনেক কাল পূর্বে হুজন সাহেব লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পুরাকালে সেখানে তামার খনি ছিল—১২০ ফুট গভীর পর্যন্ত মাটি সরিয়ে তাম্রপাথর সংগৃহীত হয়েছিল। বরাকরের তীরস্থ বারগণ্ডা কপার কোম্পানীর কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৮২ অব্দে। গরুর গাড়ি করে তাম্রপাথর নিয়ে আসতো গিরিধিতে। নদীতীরে পাথর দিয়ে গাঁথা ফার্নেস বা চুল্লী নির্মিত হয়। তার পাশে কালো পাথরে গাঁথা একটা বাড়ি, যাকে বলা হতো কপার হাউস—তৈরী তামার ingot রাখার গুদাম। পরে সেটা কেনেন গণেশ রক্ষিত নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী।

ভাঙা চুল্লীটা পড়েছিল। যেতাম খেলা করতে সেখানে—উঠতাম তার পাঁচিলের উপর। কারা সেটা রাবিশ দিয়ে ভর্তি করে উপরটা সুন্দর চাতাল বানিয়ে দেয়। সেটা হলো আমাদের আড্ডার জায়গা। গান-গল্প জমে। গান রবি ঠাকুর ও দ্বিজু রায়ের। দ্বিজু রায়ের হাসির গান জমতো খুব।

গিরিধি হাইস্কুলে ভর্তি হলাম তা তো পূর্বেই বলেছি। সেকালে এণ্ট্রান্স

(আজকালকার স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষার জন্য আমাদের বহু বিষয় পড়তে হতো —সকল বই ইংরেজিতে লেখা। ভারত ইতিহাস ছিল অধর মুখুজ্জের, যার কথা পূর্বে বলেছি। পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করতে হতো নোটবই—উগরে আসতে হতো পরীক্ষার খাতায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিল পাঠ্য—Townshed-এর বই, পরে প্রোথেরো বই হয় পাঠ্য। আজকাল যাকে সমাজশিক্ষা—মাঝে যাকে বলা হতো Civics, সেই ধরনের বই ছিল Lee-Warner সাহেবের Citizen of India, পরে তা বদলে হয় কলকাতার মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষের (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ) বই। ভূগোল ছিল অবশ্য-পাঠ্য। বই ছিল Clarke সাহেবের বিরাট বই General Geography —ছোটবেলায় তো পড়েছি Blockman-এর বই। পরযুগে শান্তিনিকেতনে ভূগোল সম্বন্ধে কত ভাল ভাল ইংরেজি বই দেখেছিলাম, কিন্তু আমাদের ছাত্র-জীবনে সে-সবের স্বাদ পাইনি। বাংলা ভূগোল অজ্ঞাত।

কিন্তু রাজনৈতিক ভূগোল-কথা জানলে তো হবে না, পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি তো জানা দরকার—তাই Gekie সাহেবের Physical Geography পড়তে হতো। Snow কখনো চোখে দেখিনি, সেই snow কিভাবে কাঁচের জানলায় জমে নানারূপে দেখা দিত তা পড়ি। যাই হোক পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানি। আসলে গিকী ছিলেন Geology বা ভূতত্ত্ববিদ্যার মহাপণ্ডিত —এসব তথ্য জানি বড় হয়ে। এসব ছাড়া সপ্তাহে একদিন পড়ানো হতো Huxley-র Science Princes। Huxley হচ্ছেন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত অ্যালডুস হাক্সলির পিতামহ T. H. Huxley—ইনিই বলতে গেলে Darwin-এর বিবর্তনবাদকে জনপ্রিয় করেন। বড় হয়ে T. H. Huxley-র প্রবন্ধ পড়েছিলাম—পৌত্র অ্যালডুস হাক্সলির বই পড়ি—প্রসঙ্গত বলি এর সঙ্গে পরিচয় হয় দিল্লীতে রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে উৎসব-ক্ষেত্রে।

সবই ইংরেজিতে পড়তে হতো। এমন কি সংস্কৃতের প্রশ্ন ইংরেজিতে হতো এবং উত্তরও ইংরেজিতেই লিখতে হতো। এসবের উপরে ছিল ড্রয়িং, তবে তা আবশ্যিক ছিল না। গণিতের সব কিছুই ইংরেজির মাধ্যমে পড়ি। এমনি হতভাগ্য জাতি ছিলাম আমরা।

ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থের নাম ছিল Entrance Course—বোধ হয় থ্যাকার কোম্পানীর, ছাপা হয় বিলাতে। ছোট হরপে মুদ্রিত। মূল গ্রন্থের শেষে Notes থাকতো—সেই নোটে ছাত্রদের কুলাতো না। তারা কিনতো হেয়ার

স্কুলের নামকরা হেড মাস্টার রসময় মিত্রের অর্থপুস্তক। শিক্ষাবিধির বিকৃতির জন্য একটি ভাষা শিখতে যে কী সময় নষ্ট হতো, তা ভাবলে আজ অবাক হতে হয়। অথচ এতো করেও এই আলেয়াকে আয়ত্ত করা সহজ হতো না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের পাঠ্যের মধ্যে কোনো প্রবন্ধে নেপোলিয়নের সেনাপতি মার্শাল নে'র (Ney) উল্লেখ ছিল। গ্রন্থশেষে নোট ছিল—নে-কে নেপোলিয়ন হত্যা করেন। কথাটা আদৌ সত্য নয়। নে-র জীবনে অনেক উত্থান-পতন হয়—কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে নেপোলিয়নের অনুরক্ত। নেপোলিয়ন যখন এল্‌বা নির্বাসন থেকে ফিরে পুনরায় শাসন-দণ্ড গ্রহণ করতে উদ্যত, তখন তৎকালীন ফরাসী বুরবণ রাজা সেনাপতি নে-কে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পূর্বপ্রভু নেপোলিয়নের পক্ষে চলে যান। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যদের অন্যতম নেতারূপে ইংরেজ ও প্রুশিয়ান সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। ওয়াটার্লুর পরাজয়ের পর নূতন শাসনতন্ত্র নে-কে গুলি করে হত্যা করে। নেপোলিয়ন নে-কে হত্যা করেননি। এইসব তথ্য আমি পড়েছিলাম Abbot-এর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ইংরেজি জীবনীতে। এনট্রান্স ক্লাসেই বইটি পড়েছিলাম। তাই জানতাম নে-র জীবন-কথা। নোটে যে ভুল থাকতে পারে তা কল্পনাতীত। মনে পড়ে, একদিন ক্লাসে হেডমাস্টার মশাই পড়াচ্ছেন—আমি বলে ফেললাম ইংরেজীতেই, "স্যর, নোটে বলা হয়েছে মার্শাল নে-কে নেপোলিয়ন হত্যা করেছে, এটা ভুল।" কথাটা শুনে হেডমাস্টার আশু আইচ মশাই 'হোয়াট্—হোয়াট্' বলে চীৎকার করে উঠলেন। আমি পুনরায় বললাম, "নোটে ভুল আছে।" সাহেবের ছাপা বইয়ে ভুল থাকতে পারে ? লাইব্রেরীতে গিয়ে চেম্বার্স-এর বিশ্বকোষ খুলে পড়তে পড়তে আশুবাবু বললেন, "ইয়েস ইয়েস, ইউ আর রাইট।" সেদিন তিনি ভেবেছিলেন—ছেলেটা স্কুলের নাম রাখবে হয়তো। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো না, কেন তা একটু পরেই বলবো।

সেই বৎসর English Selection ছিল পাঠ্যাংশ Scott-এর Tales of Grandfather থেকে Prince Charles march to Derby—কোনো এক রাজকুমারের ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবীর ব্যর্থপ্রয়াস কাহিনী। স্কট থেকে আরও একটি অংশ ছিল—তাঁর Talisman নামে বিখ্যাত উপন্যাস থেকে Saladin-এর বীরত্বকাহিনী। রচনাটির শুরু ছিল—'The burning Sun of Syria' দিয়ে। Robert Southy-র লেখা Nelson-এর জীবনী থেকে Battle of Trafalgar-টি ছিল পাঠ্য। সাউদির নেলসনের জীবনী থেকে ট্রাফালগারের

জলযুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা পড়তে হতো। নৌ-অধ্যক্ষ নেলসন তাঁর জাহাজ 'ভিকট্রি' থেকে পতাকা সংকেত উড়িয়ে লিখে দিলেন—"England expects every man to do his duty." যুদ্ধ চলছে। নেলসন তাঁর ক্যাবিন থেকে আদমিরালের পোশাক পরে বাইরে এলে সহকারীরা তাঁকে নিষেধ করে বলেন, ওভাবে ডেকে বের না হওয়াই উচিত—পাছে শত্রুরা চিনতে পারে। তিনি তা শুনলেন না। শত্রুপক্ষীয় জাহাজের মাস্তলের উপর যে-টাইরলী (Tyrol) অব্যর্থসন্ধানী বন্দুকধারীরা ছিল, তাদের গুলি এসে তাঁকে বিদ্ধ করলো। সেই কাহিনী পড়ি। বড়ই করুণ সে দৃশ্য। কিন্তু তাঁর নির্দেশে পরিচালিত ব্রিটিশ নৌবাহিনী জয়ী হয়েছিল। Southy বহু গ্রন্থের লেখক, ইংরেজ পাঠক এখন তাঁকে ভুলে গেছে। জানি না নেলসনের জীবনী কেউ পাঠ করে কিনা। লণ্ডনে 'ট্রাফালগার স্কোয়ার' এই জলযুদ্ধের বিজয়কাহিনী বহন করছে। 'ভিকট্রি' নামে কাঠের জাহাজখানি বহুকাল সযত্নে রক্ষিত ছিল। কিন্তু মহাকালের স্পর্শে সেও একদিন ধ্বংস হলো। কিন্তু নেলসনের বাণী ইংরেজ জাতির মহামন্ত্র হয়ে আছে—England expects every man to do his duty—প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করুক। ভারত তাকেই বলেছে 'স্বধর্ম পালন'—নিজ নিজ কর্মে ব্রতী থাকো নিষ্ঠার সঙ্গে। অন্যের বৃত্তি অপহরণ করিও না, লোভ করিও না (মা গৃধঃ)। আজ ভারতেরও স্লোগান হওয়া উচিত—India expects every man to do his duty. ভারতবাসীর পক্ষে এর থেকে বড়ো শপথ আর কিছু হতে পারে না। শ্রমিক, করণিক, শিক্ষক, শাসক—সবাই নিজ নিজ কর্তব্য করলে দেশের উন্নতির ব্যাঘাত কে সৃষ্টি করতে পারে? কিন্তু তা তো হয়নি। সবাই নিজের কাজ না করে পরের কাজ সংশোধনের ও সংস্কারের জন্য অতিমাত্রায় উদ্‌গ্রীব।

Southy-র একটি কবিতা The Scholar ঐ ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থে পড়তে হতো। কয়েক পংক্তি মনে আছে:

My days among the dead are passed.
Around me I behold.
Whereever these Casual eyes are cast,
The mighty minds of old,
My never-failing friends are they,
With whom I converse day by day.

রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ 'লাইব্রেরির কথা' এই প্রসঙ্গে

মনে পড়ছে। আমার জীবনে এই কবিতার প্রত্যেক পংক্তি সার্থক হয়েছে—আমারও দিন কাটে আমার গ্রন্থাগারে। এতো আনন্দ কোথাও পাই না।

আরও যে-গদ্যাংশ এই পাঠ্যমধ্যে ছিল, তার একটি Miss Mitford-এর (1787—1855) ইংলণ্ডের গ্রাম সম্বন্ধে একটি রচনার অংশ। একটি অংশ এখনো মনে আছে, গ্রামের চাষীরা শস্য নিয়ে গ্রামে ফিরছেন। শকট 'Groaning under rich burthen.' এই অংশটি কল্পনা করতে খুবই ভালো লাগতো। Samuel Smiles (1812—1904) রচিত Self-help (1859) নামে গ্রন্থ থেকে একটি প্রবন্ধ পড়তে হয়। এই প্রবন্ধের কথা খুব ভালো ভাবেই মনে আছে। কয়েকটা উদ্ধৃতি এখনো আমার মন্ত্র-স্বরূপ। যেমন একটি কবিতা—

Pitch thy behaviour low,
they projects high
Those who aim at the sky
Shoot higher then those
who aim at the tree.

ঠিক উদ্ধৃত করতে পারলাম কিনা জানি না। সব সময় জীবনে বড়ো একটা কিছু করবো এই আশা নিয়ে চলেছি। আর একটি ফরাসী প্রবাদ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত ছিল—Is it not the beginning that is difficult ? একথা অতি সত্য—প্রথম পংক্তি লেখা হলেই জানি প্রবন্ধ হোক, গ্রন্থ হোক শেষ করবই এবং বোধহয় জীবনে তার সাক্ষ্য দিতে পেরেছি। পুরানো দিনের কথা লিখতে লিখতে অনেক বিস্মৃত ঘটনা, বিস্মৃত মুখ স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। তাই ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এতো কথা লিখে ফেললাম।

এবারে অন্য পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পূর্বে বলেছি, সংস্কৃত ছিল অবশ্য-পাঠ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ্য ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। এর আগে নিচের ক্লাসে উপক্রমণিকা পড়ে হাতেখড়ি হয়। যাহোক, সংস্কৃত ভাষা আয়ত্তের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম। কিন্তু ঐ ব্যাকরণ-পিষ্ট ভাষাকে আয়ত্ত করা কী যে কঠিন, তা সাধারণ ছাত্রেরা ভালো ভাবে জানে। এই ভাষা ছাত্ররা যে আয়ত্ত করতে পারে না, তার বড় একটি কারণ পঠনবিধির পুরাতন রীতি। ভাষা শেখাবার আধুনিক ব্যবস্থাপনের অভাবে ছাত্রজীবনের বহু মূল্যবান সময় বৃথাই নষ্ট হয়ে যায়। আজ তাই মনে হয়, পঠনবিধির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন কি,—পরীক্ষার জন্য এতো বিষয় পড়তে হতো, কিন্তু

বাংলা গ্রন্থের নাম তো পেলাম না। আসলে সেকালে আমাদের বাংলা পড়তেই হতো না। এনট্রান্স পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্তে মেয়েরা 'বাংলা' নিতে পারতো। আমাদের ক্লাসের কামিনী প্রামাণিকের দাদা নীরদ এনট্রান্স দেবার সময় বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে 'বাংলা' পরীক্ষা দেন। এই কথা শুনে আমরা কি হাসাহাসি করেছিলাম—শেষকালে মেয়েদের মতো 'বাংলা' নিয়ে পরীক্ষা দেবে! বাংলা চর্চার অবসান হয় থার্ড ক্লাসে। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে 'বাংলা' বাতিল। আগেই বলেছি, সংস্কৃতের অনুবাদাদি ইংরেজিতেই করতে হতো। এই ছিল আমাদের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা।

যাই হোক, এতো সাধের পড়াশুনায় বাধা পড়লো অকস্মাৎ, তার কথা বলা যাক্। জীবনেরও গতি গেল বদলে। বিষয়টা বলবার পূর্বে পুরানো কথা কিছু বলতে হবে।

১৯০৫ সালে ইংরেজ বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করায় তখন যে-আন্দোলন শুরু হয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো ভারতের স্বাধীনতা লাভ। প্রথমে বৃটিশ বস্ত্র, পরে বৃটিশ পণ্যবর্জন আন্দোলন—তারপর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত। সেই স্বাধীনতার অন্যতম রূপ শিক্ষার স্বাধীনতা—ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হলো ১৯০৬ সালের ১৫ই অগস্ট। কারিগরী শিক্ষার জন্য ১৯০৬ সালের জুন মাসে টেকনিক্যাল স্কুল খোলা হল—আজ যেখানে বিজ্ঞান কলেজের বিরাট অট্টালিকা সেই স্থানে। মানবিক শিক্ষার জন্য কলেজ খোলা হলো ১৯১/১ বহুবাজার স্ট্রীটের উপর ছোট এক ভাড়া বাড়িতে। তারপর ১৯০৮ সালের গোড়ায় টেকনিক্যাল স্কুল ও জাতীয় শিক্ষালয় মিলে গিয়ে উঠে এলো ১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে। অরবিন্দ ঘোষ ১৯১/১ বহুবাজারে কলেজ থাকাকালে প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে গোড়ার দিকে যুক্ত ছিলেন, সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দেন এখানে।

কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হলো, যুগপৎ অখণ্ড বঙ্গদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে, এমন কি গণ্ডগ্রামেও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গিরিধিতেও এই স্বদেশী ভাবনা দেখা দিল। তখন গিরিধিতে বহু বাঙালীর বাস—ছোট-নাগপুর, বিহার তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। আমরা রাণাঘাট থেকে ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে গিরিধি আসি; গিরিধি হাইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্তি হই। যথাসময়ে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলাম—সামনেই পূজার পর টেস্ট। কিন্তু

হঠাৎ সব উল্টে গেল।

৭ই অগস্টের সভা। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে বৃটিশ পণ্য বর্জনের স্মরণ দিবস। বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়নি—তাই প্রতিবাদ সভা। স্টেশনের অদূরেই জৈন শ্বেতাম্বরীদের ধর্মশালা। বিরাট প্রাঙ্গণ। সেখানে অপরাহ্ণে সভা—বাবা সভাপতি, ধরণীবাবু উকিল বক্তা ; তিনি কায়থি হিন্দী বা দেহাতী হিন্দী খুবই ভাল বলতে পারতেন। সন্ধ্যার পর বাঙালী দারোগা এসে বাবাকে ও ধরণীবাবুকে থানায় ধরে নিয়ে যায়, তারপর দুই পয়সার জামিনে খালাস পান। পরদিন অর্থাৎ ৮ই অগস্ট যথাসময়ে স্কুলে গেলাম। হেডমাস্টার আশু আইচ ক্লাসে এসে গতকাল যারা অনুপস্থিত ছিলো তাদের বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বললেন। সবাই দাঁড়ালো, কেবল আমি এই অসম্মানকর আদেশ পালন করতে অস্বীকৃত হলাম। হেডমাস্টার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ইংরেজিতে বললেন, গেট আউট। তিনি ভাবতে পারেননি যে আমি বইখাতা নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবো।

যোগ দিলাম গিরিধির জাতীয় শিক্ষালয়ে। ছাত্র হিসাবে। আমাদের বাড়ির সামনে বিরাট বাগান ও অনেকগুলি ঘর—ভিতরে বাইরে। সেই প্রায় পোড়ো বাড়িতে স্কুল বসে। বাংলা পড়াতেন বামনদাসবাবু। জাতীয় শিক্ষালয়ে বাংলা অবশ্য-পাঠ্য ছিল। এটা বলছি এই কারণে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা অবশ্য-পাঠ্য ছিল না। বাংলা বিদ্যার দৌড় থার্ড ক্লাস পর্যন্ত। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ফিফথ্ ও সেভেন্থ স্ট্যাণ্ডার্ডের পরীক্ষা হবে কলকাতায়। গিরিধি থেকে কলকাতা কখনো যাইনি। রাণাঘাট থেকে কয়েকবার কলকাতায় গিয়েছি ছোটবেলায়। কলকাতায় উঠলাম হরিতকী বাগান লেনে। সেখান থেকে যাই ১৬৬নং বৌবাজার স্ট্রীটস্থ জাতীয় বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে। বোধ হয় জুন মাস। দোতলায় হলে পরীক্ষা হচ্ছে। বোধ হয় দ্বিতীয় দিন, বিনয় সরকার আমার কাছে এসে বললেন, "পাস করে কি পড়বে ?" বললাম, "বাবা অসুস্থ। জানি না কলকাতায় এসে পড়াশুনা করা সম্ভব হবে কিনা।" বিনয়বাবু বললেন, "যদি ব্যবস্থা হয় ?" বললাম, "তাহলে নিশ্চয়ই পড়বো।"

পাস করলাম। প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান পেলাম। সেবার ফিফথ্ স্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষার্থী ছিল আটশ'র কিছু বেশি। কলকাতা থেকে বিনয় সরকারের চিঠি পেলাম—"চলে এসো—ব্যবস্থা হয়েছে।" কলকাতায় এলাম, এবার উঠলাম কোরিন্জ চার্চ লেনে সন্তোষ বসুদের বাসা-বাড়িতে। এখন যেখানে বিরাট আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাপিস, তার পাশে ছিল সরু গলি—সেই গলি আর একটা গলির শেষে

বাসা। এখন কলেজে পড়বো। থাকবার ব্যবস্থা বিনয় সরকার করলেন 'মেসে', ১১৭নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি দ্বিতল গৃহের উপরতলায় স্থান হলো আমার। জীবনে এই প্রথম মা-বাবা, ভাই-বোন থেকে দূরে অনাত্মীয় পরিবেশে বাস করতে এলাম। এই মেসবাড়ির পাশেই ছিল পুলিস হসপিটাল—পরে সেখানে বিরাট মারোয়াড়ি হাসপাতাল ওঠে। মেসের একটি দিনের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না আসছে জানলা দিয়ে। আমরা কয়েকজন ছাত্র চুপচাপ বসে আছি—কাছে আছেন আদিত্যদা, দর্শনের ছাত্র। তিনি বললেন, আজ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে মজঃফরপুরে। মনটা সবারই ভারাক্রান্ত—মৃত্যুকালে তার বয়স বোধ হয় ছিল বিশ বৎসর।

কলেজে যাই। ইংরেজি, বাংলা, পালি, সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ছিল আমাদের অবশ্য-পাঠ্য বিষয়। এসব ছাড়া লজিক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়লজি ছিল ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয়। ঐচ্ছিক বিষয়ের ফিজিক্স পড়াতেন জগদিন্দ্রনাথ রায়। ইনি বহুকাল জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাজ করেন। বিজ্ঞান পড়ানো হতো যন্ত্রাদিযোগে। কেমিস্ট্রি পড়াতেন মণীন্দ্র ব্যানার্জি। বায়লজি পড়াতেন বিপিন-চন্দ্র চক্রবর্তী, বেঁটেখাটো মানুষটি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর—পড়াতেন মডেলের সাহায্যে। কলেজে যা পড়ানো হতো তার উপর সকালে পালাক্রমে আমাদের মেসে এসে পড়াতেন কয়জন। বিনয় সরকারের প্ল্যান মতোই এসব হতো। পালি ভাষা শেখার জন্য পাঠ্য ছিল 'ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা'। 'ধম্মপদ' বুদ্ধদেবের নানা সময়ে শিষ্যদের কাছে কথিত গাথার সংগ্রহ। হিন্দুদের কাছে 'গীতা' যেমন, বৌদ্ধদের কাছে 'ধম্মপদ' তেমন। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ পুন্নানন্দ ভিক্ষু। 'ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা' তো পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুস্তক কোথায়? পুন্নানন্দ ভিক্ষু সিংহল থেকে আমাদের বই আনিয়ে দেন। বই সিংহলী লিপিতে লেখা। সিংহলী লিপি শিখে অট্‌ঠকথা বাংলায় লিপ্যন্তর করে চললাম এবং অল্পকালের মধ্যে সিংহলী লিপি পাঠও সহজ হয়ে এলো। পরে সিংহলী কিছুটা শিখে একটি ব্যাকরণ বাংলায় লিখতেও আরম্ভ করি।

পূজার ছুটির পূর্বেই কলকাতা হতে গিরিধি আসতে হয়। পত্র এসেছে বাবার অসুখ বাড়ছে। আদিত্যদাকে বললাম। তিনি তখনই আমাকে দশটি টাকা দিলেন খরচপত্রের জন্য। সেরাত্রেই রওনা হলাম। ভোরবেলায় মধুপুর স্টেশনে নেমে গিরিধি উপস্থিত হলাম। পূজার ছুটিতে পিতার মৃত্যু হলো বিজয়া একাদশীর দিনে। পূজাবকাশের পর আবার কলকাতায় ফিরলাম।

পড়াশুনা করি সাধ্যমতো। তবে সাধ্যটাই কম, কারণ প্রায়ই জ্বরে ভুগি।

যা হোক তার মধ্যেই বিচিত্র কাজে জড়িয়ে পড়ি; অথবা নানা কাজ সৃষ্টি করি। এই সময়ে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করা হলো। পত্রিকার নামকরণ হলো 'পথিক' এবং তার মন্ত্র হলো—"মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক, অমৃত সভার যাত্রী।" রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কলি এটি।

শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠাকালেই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিকদের দ্বারা কলেজে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে। এবার কলেজে দেখলাম আনন্দকুমার স্বামীকে। ইনি সিংহলদেশীয় শিল্পরসিক। একদিন সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখিয়ে ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। যেসব চিত্র প্রদর্শিত হয়, তার মধ্যে জাভা দ্বীপের উপর উপবিষ্ট গণেশ মূর্তির চিত্রটির কথা বিশেষভাবে মনে আছে। এ সভায় আর একজন শিল্পীকে দেখলাম—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর একদিন বক্তৃতা করতে আসেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত অম্বিকাচরণ সেন।

কলেজ থেকে ছাত্ররা নানাস্থানে যেতাম। একদিন গেলাম লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত খৃষ্টানদের কবরস্থানে। সেখানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুদিনে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে সভা। মাইকেলের জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সেখানে। বোধ হয় কেউ আমাদের ফটো তুলেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতনে আসবার পর 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকায় এই গ্রুপ ফটোটিকে আমি দেখতে পাই। পত্রিকায় এই বোধ হয় আমার প্রথম ছবি প্রকাশ।

সবই তো হলো। কিন্তু বিধি বাম রয়ে গেল। শরীর কলকাতায় টিঁকছে না। বারে বারে জ্বরে পড়ছি। মেসবাড়িতে জ্বরে পড়ে থাকা যে কি কষ্টকর তা কাউকেও জানানো যায় না। বন্ধুরা সবাই কলেজে। পাচক সাবু করে চৌকির তলায় রেখে যায়; জ্বর গায়ে উঠে সব কাজ করতে হয়। পূজার ছুটিতে গিরিধিতে গেলাম। দাদা-মা খুবই চিন্তিত আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে। দাদা বললেন, 'আর কলকাতায় যেতে হবে না।' কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করলাম না, ন্যাশনাল কলেজের পাঠ অসমাপ্ত থাকলো, এখন কি হবে এই নিয়ে সবাই চিন্তিত। পূজাবকাশের পর ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পেলাম; এবং বরাবরের মতো ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হলো।

শান্তিনিকেতন

কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে পড়াশুনার উপর যবনিকা পড়ে গেল। কলকাতার মেসে শরীর টিকলো না—ফিরে ফিরেই জ্বর হয়। বোঝা গেল মহানগরী আমায় স্থান দেবে না। পূজার ছুটি হবার পূর্বেই গিরিধি ফিরলাম। স্কুলের শিক্ষার অবসান হয়েছিল এখানে, কলকাতায় কলেজী শিক্ষায় বাধা পড়লো। এক বৎসর পূর্বে পিতার মৃত্যু হয়েছে গিরিধিতে। দাদা এফ. এ. পড়া ছেড়ে সংসারতরণী চালাবার জন্য ফিরে এসেছেন, মাস্টারী করে প্রাইভেট টিউশনি করে সংসার চালাচ্ছেন। আপাততঃ সে আলোচনা থাক।

দাদা খুবই চিন্তিত—ভাইটার কি গতি হবে ভেবে। সেই সময়ে গিরিধির হিমাংশুপ্রকাশ রায়, বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনৈক শিক্ষক ; তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা। তাঁকে দাদা পত্র দেন--আমার একটা স্থান শান্তিনিকেতনে হয় কিনা জানবার জন্য। কবির অনুমতি পাওয়া গেল—'চলে আসুক ছেলেটি।'

পূজাবকাশের পর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলছে ১৯০৯ সালের ১১ নভেম্বর। রাত্রির গাড়িতে রওনা হলাম—সঙ্গে একটি তোরঙ্গ ও বিছানা। সামনে শীতকাল বলে কলকাতায় বৃত্তি-পাওয়া টাকা থেকে ছয় টাকা দামের লাল কম্বলটা নিলাম। মধুপুরে এসে পাঞ্জাব মেল ধরলাম—মেঝের উপর তোরঙ্গ-বিছানাব উপর বসবার জায়গা পেলাম। হিমাংশুবাবু এক কোণে স্থান করে নিলেন। বর্ধমানে শেষরাত্রে এসে লুপ লাইনের ট্রেন ধরে বোলপুর পৌছলাম সকালে। সেইদিন বিদ্যালয় খুলছে।

এবার বোলপুর আশ্রমে এলাম আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে এখানে এসে যে দুইদিন ছিলাম, তার স্মৃতি আজও বহন করছি—আশ্রমের প্রথম স্পর্শ। বোধ হয় ইস্টারের ছুটিতে মা এসেছিলেন তাঁর বাপের কাছে বর্ধমানে। মাতামহ বর্ধমানের জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমি কলকাতা থেকে আসি ; শুনেছিলাম বর্ধমান থেকে মাইল ত্রিশ পরে লুপ লাইনের উপর বোলপুর স্টেশন। এসব তথ্য প্রথম জানি সুজিত চক্রবর্তীর কাছ থেকে। গিরিধিতে তিনি এসেছিলেন বেড়াতে। ইনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, তখন কলেজে পড়েন। সাহিত্যিক-শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর ভাই।

নববর্ষের দিন (১৯০৯ এপ্রিল ১৫) বোলপুর এলাম দুপুরের গাড়িতে—যে

গাড়ি আজও আসে ঐ সময়ে। সেদিনকার বোলপুর স্টেশন কত ছোট ছিল। ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই লুপ লাইনে বোলপুর স্টেশন নির্মিত হয়েছিল—আজ তার রূপান্তর হয়েছে, চেনা যায় না তাকে। স্টেশনে নামলাম—কয়টা যাত্রী। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি কয়েকটা ছই-দেওয়া গোরুর গাড়ি—ভুমকোর মাহাতোরা সে-সবের মালিক। রিক্‌শ, বাস, ট্যাক্সি অজ্ঞাত। জিনিসের মধ্যে ছোট একটা ব্যাগ—সুতরাং হেঁটেই রওনা দিলাম—গোরুর গাড়িতে ভাড়া নেবে তো চার আনা। চার আনা বাজেখরচ করবারও সঙ্গতি নেই। চলেছি বাজারের ভিতর দিয়ে। কয়েকখানা মাটির ঘর। পথের পাশে কলুর ঘানি চলছে—এ দৃশ্য এখন দেখা যায় না শহরের কোথাও আর। একটা তামাকের দোকান—অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ বহুকালের স্মৃতি জাগিয়ে তুললো—বাবা অম্বুরী তামাক খেতেন বাঁধানো হুঁকোয় এবং কখনো গুড়গুড়িতে।

আজ বোলপুরে তামাকের দোকান নেই—এখন পয়সাওয়ালারা সিগারেট, পাইপ, চুরুট খান ও সাধারণ লোকে বিড়ি। এ শিল্পটাই বাংলাদেশ থেকে উঠে যাবার মতো হয়েছে। বেচারা মালদের ছেলেটা টিকে তৈরী করে, খদ্দের পায় না—এখন কলকেতে তামাক দিয়ে টিকের আগুন জ্বালিয়ে ধূমপান করেন না ভদ্রেরা। সেকাল মরে গিয়েছে—সে বোলপুরকেও আজ কেউ চেনে না। মনোহারী বা কাপড়ের দোকান চোখে পড়লো না—পরে জানলাম পুলের ওপারেই পুরাতন বোলপুর। সেখানে দালালদের কাপড়ের দোকান, শোভন আলীর মনোহারী আর পাইনদের ঔষধের দোকান। চায়ের দোকান চোখেই পড়লো না। তখনও বোলপুরে ধানকল হয়নি, রাস্তায় ভিড়ও দেখলাম না। দু-চারখানা গোরুর গাড়ি ধান কি চাল নিয়ে আসছে শহরে—সেদিন ছিল বৃহস্পতিবারের হাট—তাই এই দু-চারখানা গাড়ি যাচ্ছে।

এক-হাঁটু লাল ধুলোর পথ ভেঙে চলেছি। ডানদিকে একটা খৃষ্টানী চার্চ দেখলাম। তারপর সীমাহীন প্রান্তর। ডাকবাংলো তখনও নির্মিত হয়নি—পরে জেনেছিলাম সেটা ছিল সাবেক বোলপুর। বাঁ পাশে ছোট একটা গ্রাম—কয়েকখানা খড়ের চাল মাত্র। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম বিরাট এক বাঁধ। পশ্চিমে তার অগণিত তালের সারি—আজ তালপুকুর পাড়ে একটিও তালগাছ নেই। এই বাঁধের কথা হিমাংশুবাবুর মুখে কত শুনেছি। ছেলেরা সেখানে স্নান করতে আসে—দুখানা নৌকা ছিল—'সোনারতরী' ও 'চিত্রা'। মনে পড়ছে আমরা একসময়ে স্নান করতে গিয়ে একটা ডুবন্ত নৌকাকে ঠেলে তুলেছিলাম। সে বাঁধ এখন নেই, এখন তা চার টুকরো হয়ে গেছে। সে কথা থাক এখন।

আরও খানিকটা যেতেই বাঁ দিকে চোখে পড়লো লাল টালি ছাওয়া একটা বাংলো বাড়ি। শুনে এসেছিলাম এখানে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকেন, জ্ঞানসাগরে ডুবে। বাঁদিকে একটা ভাঙা পথ বেয়ে চললাম আশ্রমের ভিতর—সবই অদ্ভুত ঠেকছে আমার নবীন চোখে। লোকজন চোখে পড়ে না—সেদিন নববর্ষের ছুটি। দেখি এক ভদ্রলোক বিপুলদেহ সাদা পায়জামা পরনে, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি, হনহনিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে গিয়ে শুধোই, 'হিমাংশুবাবু কোথায় থাকেন?' সেই অতিকায় মানুষটি অদূরস্থিত এক ছাত্রকে ডেকে বললেন, 'রমেশ একে হিমাংশুবাবুর কাছে পৌঁছে দাও।' ছেলেটির সঙ্গে পরে পরিচয়—তার বাড়ি কুমিল্লা—এখানে থার্ড ক্লাসের ছাত্র—বেশ বলিষ্ঠ, সপ্রতিভ—অথচ গায়ে-পড়া ভাব নয়। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম—তার অদূরেই একটা এক-কুঠুরীর দোতলা বাড়ি এবং তার পাশেই কয়েকখানা খড়ের ঘর। পরে এসবের সঙ্গে খুবই পরিচয় হয়—এখন শুধু দেখে যাচ্ছি।

ছেলেটির সঙ্গে শালবনের ভিতর দিয়ে চলেছি। একটা গেট—তার উপর ঝাঁকড়া লতা। একটু এগোতেই ছেলেটি বললে, এই ডানদিকের ঘরটা হচ্ছে নাট্যঘর—এখানে আমাদের নাটক হয় মাঝে মাঝে, এর পরেই টালির লম্বা ঘর—এটাই নাকি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সব থেকে পুরাতন ঘর। এখন সেটা পাকা ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। তার পুরাতন রূপ সে হারিয়েছে। এবার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলাম। লাইব্রেরী ল্যাবরেটরির উপর বিরাট দোতলা খড়ের চারচালা। সেখানে হিমাংশুবাবু থাকেন ছাত্রদের সঙ্গে। ছোট সরু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হতো। সিঁড়ির নীচে ছোট একটা খুপরিপানা ঘর, সেটা শুনলাম আলোবাতির ঘর—কয়েক মাস পরে এ ঘরের সঙ্গে খুব ভালরকম পরিচয় হয়। আশ্রমে যখন সেবক হয়ে এলাম তখন আলোবাতি তদারকির ভার পড়ে আমার উপর।

রমেশ আমাকে গাবতলার কুয়োর কাছে নিয়ে গেল; খোলা ইঁদারার ধারে সেকালে সবাই স্নান করতো। স্নান করে রান্নাঘরে খেতে গেলাম, টিকিট কিনতে হলো না—আমি অতিথি। রান্নাঘরের মেঝেতে আহার-স্থান—কুশাসনে বসে সবাই খায়। খাবার ঘরের চাল টিনের, শরের বেড়ার পাঁচিল। খেতে বসলে বাইরে থেকে ফুরফুর করে হাওয়া ও ধুলো আসে। আহার নিরামিষ; এই নিরামিষ আহার সম্বন্ধে পরে হাস্যকর কাহিনী বলবো।

এই দোতলা বাড়িটার ইতিহাস শুনলাম। ১৩০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ১৩৭০ সালে) 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের জন্য এই তিন কামরার গৃহটি নির্মাণ করেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে

কাজটি রূপায়িত হয়নি ; দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ এই গৃহকেই কেন্দ্র করে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্র-সংখ্যা বাড়তে থাকলে এই বাড়িটির উপর খড়ের বিরাট চালাঘর নির্মিত হয়। আমি সেই ঘরেই প্রথমবার এসে উঠেছিলাম। আজকে আমরা ঐ বাড়ির যে রূপ দেখছি, সেটি হয়েছিল ১৯২১ সালে, তখন আমি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক। খড়ের ঘর ভেঙে দোতলা নির্মিত হয়—পিঠাপুরমের রাজার কাছ থেকে দুই হাজার টাকা পেয়ে।

প্রথমবারের কথাই বলছি। দুপুরে খাওয়ার পর গেলাম লাইব্রেরী ঘরে। লাইব্রেরীও বটে, বিধুশেখর শাস্ত্রীর শয়নকক্ষও বটে। ঘরের দেওয়ালের ধারে কাঠের শেল্‌ফে বই আর বই—মাঝখানে দুখানা চৌকি পাতা। সেখানে বিধুশেখর তাঁর পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র সুধাংশুকে নিয়ে শোন। সুধাংশু তখন আশ্রমের কনিষ্ঠতম মানবক, তাই অধ্যাপক সত্যেশ্বর নাগ তাঁর নামকরণ করেন 'দুয়ানি' —সেকালে রৌপ্যমুদ্রার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

শাস্ত্রী মশায়ের ঘরে আমার চোখ পড়লো এশিয়াটিক সোসাইটির পুরাতন জর্নালগুলির উপর। গোড়া থেকে সব রয়েছে। একটা একটা করে খণ্ড নামাচ্ছি ও পাতা উল্‌টোচ্ছি ও পড়ছি মাঝে মাঝে। জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপের অশোক শিলালিপির পাঠোদ্ধার কাহিনী পড়লাম। আমার কাছে উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক মনে হলো। আরও পরে মিশরীয় হায়রাগ্লিফিক ও বাবিলনীয় কুনাইফর্ম লিপি পাঠোদ্ধারের কাহিনী পড়েও এইরকম উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম। এ আনন্দ যে কী, তা অন্যকে বোঝানো যাবে না। আজও দেখছি—সিন্ধু-হারাপ্পা সীল, ক্রীটের লিপি—প্রভৃতির পাঠোদ্ধারের কী প্রয়াস না চলছে! সারাদিন কেটে গেল ঐ ঘরে। তখন কি জানতাম, ঐ গ্রন্থাগার হবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়!

বৈকালে হিমাংশুবাবু আমাকে কবির কাছে নিয়ে গেলেন। তখন আশ্রমে শিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথকে 'কবি' বলেন সবাই—'গুরুদেব' নাম পরে চালু হয়। কবি লাইব্রেরী বাড়ির একটা ঘরে এসে বসেছিলেন—হিমাংশুবাবু কবির কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র শুনে কবি তাঁর সঙ্গে ন্যাশনাল কাউন্সিলের যে এককালে যোগ ছিল সে-কথা বললেন। তারপর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, তিনি এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় যুক্ত নন, তিনি ডন্ সোসাইটি নিয়েই আছেন। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমার মতো এক নগণ্য ছাত্রের সঙ্গে এভাবে কথা বললেন,

তা ভাবতেই পারিনি। মনে পড়লো তাঁকে তিন বৎসর পূর্বে গিরিধিতে দেখেছিলাম শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাসাবাটিতে—গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে কবিকে দেখতে, তখন আমি গিরিধি হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

অপরাহ্নে কালবৈশাখীর ঝড় এলো—'ঈশানের পুঞ্জ মেঘ'। এ দৃশ্য কোথাও দেখিনি। পশ্চিমের সীমাশূন্য প্রান্তর—মনে হচ্ছে দিক্‌চক্রবালের ওপার থেকে 'ভৈরব হরষে' 'গুরুগর্জনে' কালবৈশাখী আসছে। আমি লাইব্রেরী ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে—দেখছি ছাত্ররা হলঘর, নাট্যঘর, উপরের ঘর থেকে পিলপিলিয়ে বের হয়ে ঝড়ের সঙ্গে মাতামাতি করছে। বৃষ্টি এলো। ভিজে, কাদা মেখে ভূত হয়ে গেল—কেউ নিষেধ করলে না। পরে আমিও মেতেছি এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝে, যখন এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করি। আজ চুরাশী বৎসর বয়সের সীমানায় এসে সেই সব উদ্দাম দিনের ছবি মনের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

পরদিন অন্ধকার থাকতে হিমাংশুবাবু ডাকলেন, 'প্রভাত, মন্দিরে যাবে? কবি প্রাতে মন্দিরে উপাসনা করেন।' তাড়াতাড়ি উঠে মুখ হাত ধুয়ে চললাম মন্দিরে—অন্ধকারের মধ্যে। সেকালে বিজলিবাতি অজ্ঞাত এ অঞ্চলে। মন্দিরে গিয়ে দেখি উত্তর দিকে তোরণের নীচে কবি ধ্যানস্থ। সিঁড়ির ধাপের নীচে লণ্ঠনটা মিটমিট করে জ্বলছে। বুঝলাম বেশ অন্ধকার থাকতেই এখানে এসেছেন। কয়েকটি ছাত্র (তখন স্কুলই ছিল) ও কয়েকজন শিক্ষক মাত্র উপস্থিত। 'কয়েক' শব্দ ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম। যখন আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে কর্মীরূপে ঘনিষ্ঠ হলাম, তখন দেখলাম কবির আদর্শ অতি অল্পজনের জীবনে রূপায়িত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো না।

রবীন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ। আমরাও স্থির হয়ে বসে; অনেকক্ষণ পরে কবি কথা বললেন, মনে হলো শব্দগুলি মনের কোন্ গহন থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে আসছে। ভাষণ শেষ হতেই আমরা নীরবে মন্দির ত্যাগ করে চলে এলাম। তখন সকাল হয়ে গেছে—ছেলেরা কলরব করছে।

একটু পরেই দেখি ছেলেরা ঘটি হাতে করে 'মাঠে' গেল। প্রাতঃকৃত্যাদির প্রথম কাজ এই 'মাঠে' যাওয়া—পায়খানায় অসুস্থ ছেলেরা ও শিক্ষকরা যেতেন। তিনটি পায়খানা পাশাপাশি ছিল, আজ যেখানে 'টেলিফোন' (P. B. X) অফিস তার কাছেই। এর পরেই তো সীমাশূন্য মাঠ ও খোয়াই। দেখলাম স্নান সবাই সকালেই করে। গাবতলার কুয়ার পাশে অনেকগুলি চৌবাচ্চায় জল ভরা। প্রাতঃস্নান ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল—কী শীত, কী গ্রীষ্ম সর্বকালেই এটা ছিল বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের সঙ্গে যখন পরে বাস করেছি, দেখ-

তাম ঠাণ্ডা লেগে কারও অসুখ করতো না। রাতে দরজা-জানলা খোলা থাকতো, চোর ডাকাতের ভয়ও ছিল না, ঠাণ্ডা লাগারও ভয় ছিল না শীতকালে।

স্নানান্তে ছেলেরা ব্যক্তিগত উপাসনায় বসতো—মিনিট দশ স্তব্ধভাবে বসে থাকার শিক্ষা। তারপর সমবেত প্রার্থনা। লাইব্রেরীর সামনে সবাই জমায়েত হতো, আমিও দূরে দাঁড়ালাম, ছেলেদের সঙ্গে মনে মনে 'পিতানোঽসি' মন্ত্রটি উচ্চারণ করলাম। সমবেত উপাসনার পর ছেলেরা রান্নাঘরে জলযোগের জন্য গেল—আমিও গেলাম। কি খেয়েছিলাম মনে নেই, বোধহয় চারখানা করে লুচি ও চিনি। ছেলেরা চা খেতো না, পেতোও না, দোকানে গিয়েও খেতে পেতো না। কারণ দোকানই ছিল না শান্তিনিকেতনে। এরপর কয়েক-জন শিক্ষক গেলেন 'শান্তিনিকেতন' বাড়িতে, কবি থাকেন দোতলায়। গিয়ে দেখি প্রাতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি লিখে ফেলছেন। আমরা কেবল প্রণাম করে চলে এলাম—কেউ কোনো কথাবার্তা তুললেন না। সেদিনকার ভাষণটির নাম পরে দেখি 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা'য় বের হয়েছে 'অনন্তের ইচ্ছা' নামে।

তুইদিন থাকলাম। কেউ রান্নাঘরে আহারের জন্য পয়সা চাইলো না। পরে দেখেছি শান্তিনিকেতনে অতিথিশালায় আগন্তুকদেরও পয়সা দিতে হয় না। শুনেছিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে 'ট্রাস্ট' আশ্রমের জন্য করে গিয়েছিলেন, তাতেই অতিথি সৎকারের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা ছিল।

আশ্রমে এবার দেখলাম বিধুশেখর শাস্ত্রীকে। তাঁকে দেখার বিশেষ কারণ ছিল। কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে আমি সাহিত্য বিভাগের ছাত্র। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী ও মারাঠী পড়তে হতো। সে কাহিনী এখানে বিস্তারিত করলাম না। পালি পড়তে গিয়ে মুশকিল হয়েছিল, কারণ পালি ভাষার কোনো বিশেষ লিপি ছিল না—অল্পকাল পূর্বে চারুচন্দ্র বসু 'ধম্মপদ' বাংলা হরপে, বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাপকের কাছে শুনি বোলপুরের বিধুশেখর ভট্টাচার্য 'মিলিন্দ পঞহো' নামে বিখ্যাত পালি গ্রন্থ বাংলা লিপিতে বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করেছেন। বললেন, সান্যাল কোম্পানী ছাপিয়েছে। সেইদিনই বইটা কিনে আনি। এই বইয়ের সম্পাদক ও অনুবাদক জ্ঞানতপস্বী বিধুশেখরকে দেখলাম তাঁর কর্মমন্দিরে।

এই হলো আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম পরিচয়-পর্ব। কবিকে প্রথম দেখেছিলাম গিরিধিতে, বোধ হয় ১৯০৭ সালের গোড়ায়। তারপর কলকাতায় যখন পড়ি, তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মাঘোৎসব দেখতে যাই

১৯০৯ জানুয়ারীতে। ঘটনাটি একটু হাস্যকর।

রবীন্দ্রনাথ বা জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। শুনি জোড়াসাঁকোয় যারা উপাসনায় যায়, তারা রাত্রে সেখানে খেতে পায়। উইলিয়াম্‌স্‌ লেনের মেসে পাচক ঠাকুরকে বললাম, রাতে খাবো না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিকালে তো গেলাম। গিয়ে দেখি টিকিট বা প্রবেশপত্র দেখিয়ে সবাই ঢুকছেন। আমার তো নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, গিরিধিতে পরিচয় হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সুধীন্দ্রনাথের শ্যালকের সঙ্গে—তাঁরা একবার গিরিধি গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক আমাকে দোতলায় রেলিঙের ধারে স্থান করে দিলেন। সেখানে বসে নীচের সব দেখতে পেলাম। সেদিন একটি গান শুনি যা মনে গেঁথে গিয়েছিল—'কোন শুভক্ষণে উদিবে নয়ন, অপরূপ রূপ ইন্দু'—গানের একটি কলি বিশেষভাবে মনকে স্পর্শ করে—'মুখরিয়া দিক্‌ চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী'। সেদিন দেখি বছর আট-দশ বৎসরের একটি ফুটফুটে ছেলে বেদীর পাশে গায়কদের সঙ্গে গান করছে। তিনি পরযুগের সুপরিচিত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপাসনা হয়ে গেল—সবাই বের হয়ে চলে গেলেন, উপরের বারান্দায় কারা ঘুরছেন—সবাই খুব উঁচুদরের মানুষ বুঝলাম। কিন্তু কই খেতে তো কেউ ডাকলে না! এই হলো ঠাকুরবাড়ির প্রথম অভিজ্ঞতা। তারপর এখানে কত এসেছি; কত আপনার জন হয়েছি।

প্রসঙ্গত বলি, মাঘোৎসবে যে গানটির কলি খুব ভাল লেগেছিল—সেইটা আমাদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'পথিক'-এর মধ্যে উদ্ধৃত করি।



১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে এসে এবার উঠলাম লাইব্রেরীর পাশে নূতন একটি ঘরে। গতবার গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে নববর্ষের দিন যখন আসি, তখনও সে ঘরটি তৈরী হয়নি। প্রথম রাতে সেখানেই আশ্রয় পেলাম। আরও কয়েকজন অতিথি আছেন, জানলা-দরজায় টাটকা রঙের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে ঘরের ছাদ ছিল নীচু, কবির ইচ্ছা ছিল তার উপর আর এক তলা তৈরী করেন—হয়ে ওঠেনি। বহুকাল পরে ব্রহ্মবিদ্যালয় বাড়ির পুনর্গঠনকালে যখন তার উপর দোতলা উঠলো, সেই সময়ে ওখানে বড় ঘর তৈরী হয়। কালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তাঁর ছাত্রকর্মীদের সহায়তায় সমস্ত ঘরের চারটি দেওয়াল নূতন ধরনের প্রাচীর-চিত্র এঁকে উজ্জ্বল করে তোলেন। তারপর ক্রমবর্ধমান বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে সে-ঘরের অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়। এখন এই বাড়িতে নানা দপ্তর—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য বিরাট অট্টালিকা নির্মিত

হয়েছে, আমার গ্রন্থাগারিক জীবন কাটে পুরাতন বাড়িতে।

আমি যখন আসি তখনও লাইব্রেরীর বই ছিল ঐ গৃহের ঢাকা বারান্দায়—যাকে পূর্বে ঘর করা হয়েছিল। কয়টাই বা শেল্‌ফ, কয় হাজারই বা বই। তবু দেখলাম নানা ধরনের বই। পূর্বে বলেছি প্রথম ছয় মাস বিনা বেতনে পেট-ভাতায় থাকি, কাজের মধ্যে দুই—পেট ভরে খাওয়াদাওয়া ও মন ভরে পড়া-শোনা। কলেজী বিধিবদ্ধ পড়ার খতম হয়েছে—এখন যা পাই তাই পড়ি, বিষয়ের বাছবিচার নেই। তবে বালক বয়স থেকেই ইতিহাস-ভূগোল পড়ায় টান ছিল—জগৎকে কালে ও স্থানে জানবার কৌতূহল, যার কেন্দ্রে আছে মানুষ। মানুষ তার বিবর্তন, তার আবির্ভাব, তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কত গবেষণাই না করে চলেছে। তা জানবার জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে পড়ছি—ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব। মানুষের মনকে জানতে হবে তার সাহিত্যের মধ্য থেকে—পড়লাম তাদের মহাকাব্য, তাদের নাটক। সফোক্লিসের নাটক কতবার যে পড়েছি বলতে পারি নে। কয় বৎসর পূর্বে আবার পড়ি। কেন? তা বলতে পারিনে। ভালো লাগে ক্লাসিক্স পড়তে। রামায়ণ, মহাভারত ভাল করেই পড়েছিলাম—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত আমাদের ছিল, বাবা কিনেছিলেন। তা অনেক যত্নের সঙ্গে পড়েছিলাম—সেদিন ছিন্ন গ্রন্থের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে মধ্যে মধ্যে আমার মন্তব্য চক্ষে পড়লো। রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতায় অনুবাদ রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আজ লোকে ভুলে গেছে। কী অসাধারণ ছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। অধ্যয়নের কথা বিস্তৃত করতে সংকোচ বোধ করছি—আত্মশ্লাঘার মত দেখাবে, থাক্ সে আলোচনা।

ইতিহাস পড়ি, ঐতিহাসিক গল্প লিখি—প্রকাশিত হলো ঢাকার 'সোপান' নামে শিশু-পত্রিকায়, তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র। আর মধ্যযুগীয় সাধ্বী নারী মাদাম গেঁয়োর আত্মজীবনী দু'খণ্ড পড়ে লিখলাম কয়েকটি প্রবন্ধ, সেগুলিও প্রকাশিত হলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভারত মহিলা' পত্রিকায়। পরে একদিন চোখে পড়লো অমৃতলাল গুপ্তর সাধ্বী নারীদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তথা জীবনী-সংকলন; তাতে মাদাম গেঁয়োর সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল, লেখক তার উপাদান আমার রচনা থেকে পেয়েছিলেন, তা সকৃতজ্ঞচিত্তে জ্ঞাপন করেন—আমি বালক, তিনি জ্ঞানতপস্বী।

* * *

শান্তিনিকেতনে আসবার কয়েক সপ্তাহ পরেই এলো পৌষ উৎসব—৭ই পৌষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার দিন। এই দিনটিকে তিনি

তাঁর দ্বিজত্ব বা নূতন জীবনলাভের প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের কাঁচের মন্দিরে উপাসনা হয়ে আসছে ১৮৯২-এর ৭ই পৌষ থেকে প্রতি বৎসর। আমি যে বৎসর জন্মেছিলাম সেই বৎসরে। রবীন্দ্রনাথ এই মন্দিরে প্রথম ধর্মদেশনা করেন ১৮৯৮ সালে সাতই পৌষ—ভাষণটির নামকরণ করা হয় 'নিরাকার উপাসনা'।

সাতই পৌষের উৎসবের অঙ্গরূপে একটি মেলা বসে। এই সময়ে মেলা বসতো মন্দিরের উত্তরে মাঠে—একদিনের জন্য। তখন বোলপুর থেকে পাকা রাস্তা এসে শেষ হয়েছিল আশ্রমের ফটকের সামনে। তার বাইরে সীমাশূন্য প্রান্তর—কোথায় উত্তরায়ণ, রতনকুটি, আর শ্যামবাটি কেবল ভাঙা পথ চলে গেছে গোয়ালপাড়ার দিকে। একদিনের মেলা—কয়টাই বা দোকান আসতো। মনোহারীর দোকান, হাঁড়ি-কলসীর দোকান, কাঠের দরজা-জানলার দোকান। অবশ্য মিষ্টির দোকানই বেশী তার মধ্যে। সন্ধ্যার পর বাজি পোড়ানো দেখবার জন্য গ্রাম থেকে ভিড় হতো। আতসবাজি তখন সুলভ হয়নি, তাই দূর দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি করে মেয়েছেলেরা আসতো। শেষ বাজিতে দেখানো হতো মন্দিরের আলোময় রূপ—মহর্ষির আকৃতি। অবশ্য তার আগে জাহাজ ও দুর্গের যুদ্ধ দেখানো হয়ে গেছে—দুই পক্ষ থেকেই কামান দাগছে। বাজি পোড়ানো শেষ হতো বিরাট বোমার আওয়াজে,—তারপরই লোকেরা বাড়ি যাবার জন্য কোলাহল শুরু করতো।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন। বহুকাল এই রীতি চলে। তারপরে সন্ধ্যায় জনতা বৃদ্ধি হতে থাকলে কোলাহলের মধ্যে উপসানা নিরর্থক বুঝে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় দুইজন মাইনে করা লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে ধৃত মন্ত্রাদি পাঠ ও ব্রহ্মসংগীত করতেন। এটি মহর্ষি প্রবর্তন করে যান—ভাবখানা এই, ব্রহ্ম মন্দিরে নিত্য ব্রহ্মনাম কীর্তন হবে। নিকটের গ্রামে এদের বাস—শ্যামশরণ ভট্টাচার্য ও রসিক বৈরাগী। এখন সে রীতি উঠে গেছে। শুনেছিলাম পয়সার অভাবে গায়ক-বাদকদের বেতন দেওয়া সম্ভব না-হওয়ায় বিশ্বভারতী-পর্বে মহর্ষির এই রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

এইবার সাতই পৌষের দিন বহুকাল পরে যাত্রা দেখলাম। যাত্রা বসতো দুপুরে। যাত্রার অধিকারী ভক্ত নীলকমল মুখুজ্জে বৃদ্ধ। তিনি সেজেছেন বৃন্দাদূতী। যাত্রার আসর ঘিরে বসে জনতা। আজকাল আবার নাট্যবিশারদরা ভাবছেন শ্রোতা ও অভিনেতার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বা

থিয়েটার সৃষ্টি করেছে—তা অপসারিত করতে হবে, অভিনয়কে আরও intimate করতে হবে। হাস্যকর সীন্ ও বায়োস্কোপ মিশিয়ে দর্শকদের মন ভোলানোর চেষ্টা দেখলে আমার হাসি পায়। দেখেছি সেরকম থিয়েটার। আসলে যাত্রার শ্রোতা—দর্শক কল্পনার খোরাক পায়—সমস্তই নরম করে মুখের মধ্যে দেওয়া হয় না। ভাষা দিয়ে রূপকে ফুটিয়ে তুলছে যাত্রার ডায়ালগ ও গান দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে সংযোগস্থল। নীলকমল মুখুজ্জের কাছে প্রথম শুনলাম ভাগবতের কথা—প্রান্তরে একটি বৃক্ষ, তার কাণ্ড একটি, তার দ্বাদশ শাখা, প্রতি শাখায় পত্র অগণিত। অর্থাৎ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ও শ্লোকসংখ্যা বললেন এইভাবে। বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝালেন—বললেন আমরা ভক্ত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিভক্ত হয়ে আছি—ভক্ত রাধার সহিত মিলন হলেই অদ্বৈতসিদ্ধি। রাধা যেন জীবাত্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চরম মিলনই বৈষ্ণবধর্মের সারকথা।

নীলকমল বৃদ্ধ, রুগ্ন, কৃশ, কিন্তু দূতী সেজে হাততালি দিয়ে যে কয়টি গান করেছিলেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। আজকালকার পরিবেশে এই 'যাত্রা' অচল।

সাতই পৌষের উৎসব কেন্দ্র তার মূলস্থান ছেড়ে পূর্বপল্লী মাঠে এলো ১৯৬১ সালে—কবির জন্মশতবর্ষ উৎসবকালে। বিশ্বভারতী বিপুল বিচিত্র এমন কি বিরুদ্ধ মতাশ্রয়ী লোকে পূর্ণ হয়ে উঠছে—তাই আশ্রম থেকে দূরে মেলার স্থান নির্দিষ্ট হলো।

* * * *

পূজাবকাশের পর আশ্রমে আসি, তারপর ছয় মাস কেটে গেল। কবি বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করছিলেন; দেখেন ছেলেটি সারাদিনই পড়াশুনা করে, ভেবেও থাকবেন ছেলেটাকে গড়েপিঠে মানুষ করা যেতেও পারে। বিদ্যালয়ের কাজেও লাগতে পারে। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে শ্রীশচন্দ্র রায় নামে এক বরিশালবাসী শিক্ষককে বিদায় করার কথা ওঠে। আমাকে তাঁর স্থানে নিয়োগ করলেন আষাঢ় মাস থেকে—বেতন মাসিক পনেরো টাকা। খাওয়াদাওয়া পাই, ধোপা-নাপিত পাই, আলো-বাতি পাই, ঘরভাড়া লাগে না, আসবাবপত্রের ভাড়া লাগে না, প্রভিডেন্ট ফণ্ড ছিল না, ইনকাম ট্যাক্স দেবার মতো বেতন কখনো চোখে দেখিনি। পনের টাকা মাসিক বেতন—আজকার তুলনায় কত হবে?

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি গেলাম গিরিধিতে। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর জীবন-বীমার সামান্য টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল, তাই দিয়ে ভাড়াবাড়িটা কিনে ফেলা হয়েছিল। খোলার বাড়ি হলেও অনেকগুলি ঘর—উঠানটা পাকা মেঝে। রাতে

গরমের জন্য বাইরে শুই—আর দেখি আকাশের এ মুড়া থেকে আর এক মুড়া পর্যন্ত ধূমকেতু। শান্তিনিকেতনের আকাশে তার আবির্ভাব ও অগ্রগতি দেখেছিলাম ল্যাবরেটরির দুরবীন দিয়ে। জগদানন্দ রায় দেখাতেন, বুঝিয়ে দিতেন অনেক রহস্য। মাঝরাতে উঠে দেখি গ্রহতারাগুলো সরে কত দূরে গেল—পূব নূতন কাদের উদয় হলো। আকাশ-রহস্য মানুষকে কি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করছে, তা আধুনিক অ্যাসট্রনমির বইয়ের পাতা ওল্টালেই দেখা যায়। আমার বিদ্যা রবার্ট বল্-এর কয়েকটা বই—বড় হয়ে পড়ি Jeans। হেলির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে ১৯৮৫ সালে, তখন তা দেখবার জন্য থাকবো না। এইভাবেই যুগযুগান্ত থেকে এই ব্যোমচারী ধূমকেতু আপন মনে চলে আসছে। কোথায় যায়, কত দূরে যায়, কেন আবার সেই পথই পরিক্রমণ করে—এ রহস্য বিজ্ঞানীরা সমাধান করবেন, আমরা শুধু সবিস্ময়ে দেখি আর দেখি।

গ্রীষ্মাবকাশের পর এবার এসে স্থান পেলাম নূতন বাড়িতে—তখন সেখানে শিশুবিভাগ, সেই ঘরেই কাজ করেন জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়,—আমার সেই ঘরেই শয়ন অধ্যয়ন সবই। কাজের মধ্যে পড়ানো তো আছেই, তার উপর এই শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব। প্রত্যেক ছাত্রাবাসেই শিক্ষকরা থাকতেন—ছাত্র-তদারকির ভার সকল শিক্ষককেই বহন করতে হতো; এখন শুনি তাদের তদারকের জন্য অশিক্ষক—এই কাজের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত লোক থাকেন।

যে-নূতন বাড়িতে থাকি, সেটা আশ্রমের পুরাতনতম বাড়ি। খড়ের চাল এখনও আছে।

বর্তমান শান্তিনিকেতনের সর্বপুরাতন এই বাড়িটির 'নূতন বাড়ি' নাম নব্য ছাত্র ও শিক্ষকগণ অনেকেই হয়তো জানেন না। পুরাতন দারিদ্র্যের সব চিহ্নই লুপ্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে আরও টাকা দোহন করে আনতে পারলে এই নূতন বাড়ি সত্যই নূতন-কায়া পেতো—তবে তার ইজ্জত চলে যেতো।

নূতন বাড়ির একটু ইতিহাস আছে। এই বাড়ি রবীন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে নির্মাণ করান—আশ্রমের বিশ বিঘা জমির সীমানার বাইরে। আশ্রম সীমানায় আমিষ ভক্ষণ ট্রাস্ট ডীড অনুসারে নিষিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাস করবার জন্য এই বাড়িটা তৈরী করেন। কিন্তু যাঁকে নিয়ে 'সংসার' পাতবেন ভেবেছিলেন, তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক-বৎসরের মধ্যে মারা যান। নূতন বাড়িতে তিনি সংসার পাততে পারেননি। তাঁর স্মৃতি বহন করছে পাশের বাড়ি 'দেহলী' —মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা নামে। নূতন বাড়িটির যথার্থ নাম হওয়া উচিত

'মৃণালিনী কুঠী'। প্রসঙ্গক্রমে বলি, গান্ধীজী এই বাড়িতে এসেছিলেন।

আমি যখন আসি তখন জানতাম মন্দিরের কাছে দ্বিতল গৃহটির নাম 'শান্তি-নিকেতন'। সত্যই ঐ বাড়িটি 'শান্তিনিকেতন' নামেই কাগজে-কলমেও পরিচিত। ছাত্ররা ঐ বাড়িতে গেলে ফিরে এসে বলতো 'শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম'। বর্তমানে বোলপুর রেল স্টেশনের নামের সঙ্গে শান্তিনিকেতন নাম জুড়ে গেছে কবির জন্মশতবর্ষ থেকে। এই শান্তিনিকেতন অট্টালিকায় মহর্ষির আশ্রমের প্রথম পত্তন হয়। এখানে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম'-এর প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সেই সময়ের ছাপ দেওয়া বই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে এখনো আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এগারো বৎসর বয়সে প্রথমে বোলপুরে এসে এই বাড়িতেই ওঠেন। তারপর এ বাড়ির কত পরিবর্তন হলো। বাড়িটি আশ্রমের অতিথিশালা ছিল এককালে। আমি যখন আসি তখন এই বাড়ির একতলার পূবের ঘরে থাকতেন দ্বিপুবাবু বা দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পৌত্র, আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি। পশ্চিমের ঘরে এসে উঠতেন অতিথিরা। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন দোতলায়।

আমার জীবনকালেই শান্তিনিকেতন বাড়ির কতভাবে ব্যবহার করতে দেখলাম। কখনো হোটেল, কখনো ইনটারন্যাশনাল ক্লাব, কখনো বিদ্যাভবন, কখনো অফিস, দর্শন ভবন, ইতিহাস ভবন। মোট কথা মহর্ষি যে উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট করে এই গৃহ উৎসর্গ করেছিলেন তার কথা সবাই গেছেন ভুলে। জানি না কোনো দিন এই গৃহ তার মর্যাদা ফিরে পাবে কিনা। এই বাড়ির নাম হওয়া উচিত ছিল 'মহর্ষি ভবন'। বিশ্বভারতীর প্রথম দর্শনীয় গৃহ ও ব্রহ্মমন্দির দেখিয়ে অতিথিদের উত্তরায়ণ ও 'রবীন্দ্রভবন' দেখানো উচিত।

আশ্রমে এসে দেখলাম ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে অতিথিদের পরিচর্যা করতে হয়। তবে তখন অতিথিই বা কয়জন আসতেন? আর যাঁরা আসতেন হয় ছাত্রদের অভিভাবক, নয় ভক্তজন আশ্রমে নির্জনবাসের জন্য, তখন টুরিস্ট চিত্ত-বিনোদনের স্থান বলে সুনাম (?) অর্জিত হয়নি। কালীমোহনদার কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি যখন প্রথম আশ্রমে আসেন তখন 'শান্তিনিকেতন' গৃহে তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল কবিপুত্র বালক শমীন্দ্র। সেকালে অতিথি-ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সতীশ গাঙ্গুলী মশাই পাকা রসুইয়া, রাঁধতেন অতিথিদের জন্য। অতিথিদের ভোজনকালে উপস্থিত থাকতে হতো সেবকদের। দেখতাম সুখাদ্যগুলি অতিথিরা ভোজন করছেন।

আমাদের রান্নাঘরের নিত্য খাদ্যের স্বাদগন্ধ অপরিবর্তিত থাকতো। তাই

গাঙ্গুলী মশাইয়ের অতিথিদের জন্য বিশেষ ব্যঞ্জনাদির গন্ধ দূর থেকে উপভোগ করতাম, স্বাদ পেতাম না। আমরা বলতাম পাকশালার রসুইয়াদের যেন একটি 'দখল' আছে—দইয়ের স্বাদ বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। আজ পর্যন্ত বোধহয় রান্নাঘরের ভোজ্য সামগ্রীর স্বাদগন্ধের কিছু অদলবদল হয়নি।

সেকালে আশ্রমে সবাই নিরামিষাশী। তবে আমিষও ছিল। সেকালে পেঁয়াজ দিয়ে রান্নাকে বলা হতো 'আমিষ'। সদ্‌ব্রাহ্মণ হরিচরণ, তাঁর ভাগ্নে অমূল্য, হরেন্দ্রনারায়ণ, তাঁর পুত্র হীরেন্দ্রনারায়ণ, বিধুশেখরেব গ্রামের যদু চক্রবর্তী,—এইরূপ কয়জন খেতেন পৃথক ভাবে, অর্থাৎ ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন গাঙ্গুলীমশায়—ব্রাহ্মণরা খুবই খুশী তাঁর রান্নায়। একবার গাঙ্গুলীমশায় যান ছুটিতে—তাঁর বাড়ি ছিল বরিশাল, ফিরতে হলো দেরি। নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণদের খাদ্য আর মুখে রোচে না। গাঙ্গুলীমশায় ফিরে এলে তাঁর বদলি পাচক নরেন্দ্র ঠাকুর গাঙ্গুলীমশায়কে শুধোয়, 'আপনি মাস্টারবাবুদের কি তুক করে গিয়েছিলেন, আমার রান্না আর মুখে উঠতো না; কেবলই বলতেন গাঙ্গুলীর মতো রান্না হয় না।' গাঙ্গুলীমশায় বললেন, 'ওঁরা নিরামিষ খান, পেঁয়াজ তো খাবেন না, তাই পেঁয়াজের রস দিতাম। পেঁয়াজ না পড়লে নিরামিষ তরকারীর স্বাদ হয়?' ব্রাহ্মণরা নিরামিষ অর্থাৎ পেঁয়াজ ছাড়া রান্না খাচ্ছেন বলে খুশী ছিলেন। আমরাই না হয় মাছ মাংস ডিম খেতাম না, আশ্রমে বাস করি বলে। কিন্তু পাচক ভৃত্যেরা তো ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করবার জন্য এখানে আসেনি। তারা মাছ কিনে এনে গোপনে ঝোলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে নিতো। একদিন জানাজানি হয়ে গেল—নিরামিষ ঝোলের মধ্যে মাছের কাঁটা মুড়ো আবিষ্কৃত হলো।

আমাদের মধ্যে বিধুশেখর ছিলেন স্বপাকী ব্রাহ্মণ। আশ্রমের সরকারী ভাণ্ডার থেকে তাঁর জন্য আতপ চাল, গব্য ঘৃত [সেকালে পাওয়া যেতো], সোনা-মুগের ডাল প্রভৃতি সরবরাহ হয়। রাধু ভৃত্য বোধ হয় সদ্‌গোপ সুতরাং জল চলনীয়। শাস্ত্রীমশায়ের রান্নার সব ব্যবস্থা করে বোগনায় জল দিয়ে চাল ছেড়ে এসে তাঁকে খবর দিত। তিনি তখন লাইব্রেরী থেকে খাতাপত্র গুটিয়ে বের হয়ে যেতেন 'স্বপাক' রন্ধনের জন্য। আমরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ আদায় করতাম, অমৃত লাগতো। এই 'অমৃত' খাবার জন্য সব থেকে লালায়িত ছিলেন নগেন্দ্র আইচ। রোগা, ডিসপেপটিক মানুষ, রান্নাঘরের খাদ্য সয় না—তাই প্রায়ই শাস্ত্রীমশায়ের শরণাগত হতেন, তবে এক-আধজন প্রতিদিনই তাঁর অন্নের ভাগীদার হতেন। সে ঘরোয়া পরিবেশ বহুকাল চলে গেছে।

পনেরো টাকা মাসমাইনে পাই বলেছি পূর্বেই। আজকের একজন শিক্ষকের যা আধাদিনের বেতন। কিন্তু তখন খরচ কি ছিল? 'When Adam delv'd and Eve span who was then a gentleman'—সিনেমা, ক্যান্টিন অজ্ঞাত, মিষ্টির দোকান বোলপুরে ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সবের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না। সাতই পৌষের দিন দেখতাম দ্বিপুবাবুর বারান্দায় তারা ময়রার মেঠাই এসেছে বারকোশ ভরা; সে-সব উপভোগ করতেন মানী লোকেরা, আমি সে-সবের বাইরে ছিলাম। চায়ের দোকান ছিল না। শরৎবাবু চা খেতেন, আমরা কয়কজন তাঁকে ঘিরে বসতাম সকালে বিকালে, ভাগও পেতাম। খেতে পাই পেট ভরে চারবার, খরচ লাগে না। দাঁত মাজার খড়ি পাই গাবতলার কুয়োর কাছে, পেস্ট ব্রাশ অজ্ঞাত। কুয়োতলাতেই স্নানের জন্য সর্ষের তেল থাকে। রাতে ডিট্‌জ লণ্ঠন পাই—কেরোসিন তেল বোঝাই করে দিয়ে যায় গ্রামের রবি আঁকুড়ি। পড়ানো ও ছেলেদের দেখাশোনা ছাড়া আমার বাড়তি কাজ হলো আলো-বাতির তদারকি। মাঝে মাঝে রবি অসুস্থ হয়ে পড়লে ছাত্রদের নিয়ে আমাকেই ঘরে ঘরে আলো-বাতি দেবার ব্যবস্থা করতে হতো। ছাত্রদের সাহায্য করতেই হতো,—নইলে তো সাঁঝের বেলায় তাদের ঘর অন্ধকার থাকবে।

শান্তিনিকেতনে এসে দেখলাম শিক্ষকদের কোনো-না-কোনো কাজ করতে হয়—শ্রমদান করে আশ্রমে থাকতে হয়। রান্নাঘরের কাজ দেখতেন শরৎবাবু। তিনিই ভোরবেলায় জল তোলার সেবকদের ডেকে তোলেন—টাটকা জল গাবতলার কুয়ো থেকে তুলে চৌবাচ্চা ভরে দেবে। এই গাবতলার কুয়ো আজ অদৃশ্য। রান্নাঘরের ভৃত্য পাচকদেরও তিনি ঘুম ভাঙান—ছেলেদের সময়মত জলখাবার সকালে দিতে হবে। তারপর রান্নার ব্যবস্থায় হাত লাগাতে হবে। সময়মত ঘড়ি ধরে তাদের খাওয়া দিতে হয়। শরৎকুমার রান্নাঘরের হিসাবও রাখতেন। ক্লাসে পড়াতেন, পেছিয়ে পড়াদের বিশেষভাবে পড়াতেন—অবশ্য এর জন্য উপরি টাকা অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করা হতো না।

এর উপর শরৎকুমার বই লিখতেন, প্রবাসীর জন্য 'সংকলন'ও করতেন। জগদানন্দ রায়কে দেখতাম তরিতরকারীর বাগান তদারক করতে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র ভাণ্ডারের ভার নিয়ে আছেন। মনে পড়ছে একটি দরিদ্র মুসলমান নিয়মিত মাসোহারা পেতেন তাঁর পুত্রের জন্য—সে ছেলে কোনো বিদ্যালয়ে পড়তো।

কয়েক বৎসর পরে খুব ভালো একটা 'অনারারি' চাকরি পেলাম—সেটা স্বাস্থ্য

বিভাগ বা মেথরদের কাজকর্ম তদারকি। সে কাজ বহুদশক করেছিলাম। মেথরদের বেতন দিতে গিয়ে শুনি তাদের ঐ টাকার মোটা অংশ যায় কাবুলীদের কাছ থেকে ধার করা টাকার সুদ দিতে। আমি কাবুলীদের ডেকে পাঠাই ; তারা এলে বললাম, 'আসল টাকা আমি মাসে মাসে দেবো, সুদ পাবে না—এতে রাজী হও তো আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবে।' এই প্রস্তাবে তারা খুশী হলো। ছাপানো রসিদ বই থেকে মেথরদের নামে-নামে টিপ দেওয়া কাগজ ছিঁড়ে আমায় দিয়ে দিল। অবশ্য মূল টাকা তাদের বহুকাল উঠে গেছে সুদে সুদে—সুতরাং এখন এটুকু ভদ্রতা করতে তাদের বাধলো না। তারা কখনো আসল শোধ করবার জন্য তাগিদ করতো না, সুদটা চাই মাসে মাসে। তখন থেকে কাবুলীদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখন তাদের কেউ নেই কিন্তু তাদের ধারায় এখন যারা ব্যবসা করছে তাদের অনেককেই চিনি। তাদের তেজারতী ব্যবসার কথা শুনি তাদের কাছ থেকে—এই শহরে কত লক্ষ টাকা খাটছে তা কেউ জানে না। তেজারতী আইন, জমিবন্ধকী আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় কেউ কাউকে টাকা ধার দেয়না—সরাসরি জমি বিক্রী করো, গয়না বিক্রী করে টাকা নাও। খালি হাতে টাকা পাওয়া যায় এই কাবুলীদের কাছে। সারা দেশে এদের জাল পাতা। জানি না এদের টাকার উৎস কোথায় ?

শান্তিনিকেতনে প্রথমে এসে যেটা সব থেকে ভালো লেগেছিল, সেটা হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ। ক্লাসের পড়ানো তো শিক্ষকদের অবশ্য কর্তব্য, তার বাইরে আছে খেলা, অভিনয়, অতিথি সেবা, সভা-সমিতি, তর্ক-সভা প্রভৃতি কাজ। ছাত্রদের তর্ক-সভার জন্য মহড়া দিয়ে তৈরী করাচ্ছেন সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। Elocution Course বোধ হয় সন্তোষচন্দ্র নিয়ে থাকবেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে—তাই বক্তৃতা দেবার সময়ে কি ভাবে দাঁড়াতে হবে, rebut কি ভাবে করতে হবে ইত্যাদি উপদেশ দিতেন। আমরা যে স্কুলে পড়ে এসেছি সেখানে ছেলেদের অভিনয় করতে দেখিনি। প্রাইজের দিন কয়েকজন আবৃত্তি করতো—ছোটখাটো ইংরেজী অভিনয় হতো, এখানে এসে দেখি ছাত্ররা প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পড়ে শোনান "ব্যঙ্গকৌতুক" থেকে 'বিনি পয়সার ভোজ' ও 'নূতন অবতার'। প্রথমটি একক অভিনয় monologue, দ্বিতীয়টিও দুই ব্যক্তির স্বগতোক্তি। 'বিনি পয়সার ভোজে' মালি যখন কড়া তামাক সেজে এনে দিল—দু টান দিয়ে সে কি কাশি। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করে দেখালেন।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে ছাত্ররা 'মালিনী' নাটক অভিনয় করে। রানী ও রাজ-

কন্যা মালিনী দুই নারী চরিত্রের রূপদান করেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এযুগে এসব হতে পারে না। নারীচরিত্রে খাঁটি মেয়ে না হলে কী অভিনেতা কী দর্শক কারও মন ওঠে না। কলকাতায় থিয়েটারে মেয়েরাই নারীভূমিকা গ্রহণ করে আসছে বহুকাল থেকে। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'বীণা থিয়েটার'-এ বালকদের নারীভূমিকায় নামান। সে থিয়েটার চলেনি। আজকাল দেখি ভ্রাম্যমান পেশাদার যাত্রায় মেয়ের পার্ট খাঁটি মেয়েরাই করছে। অথচ মনে আছে, রাণা-ঘাটে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় বিদ্যা যে সেজেছিল সে ছেলে। শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম সাতই পৌষ উৎসবে যাত্রা দেখি। সেখানে বৃদ্ধ নীলকমল মুখুজ্যে দূতী সেজে গান করছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ঐ পেশা গ্রহণ করেন। তিনিও নারীর ভূমিকায় নামতেন।

মেয়েরাই একবার অভিনয় করে শান্তিনিকেতনে। অভিনেত্রীরা মেয়ে, দর্শকও মেয়েরা। শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলার মাঝের ঘরে অভিনয় হয় লক্ষীর পরীক্ষা। আমার ছোট দুই বোন 'কিনি বিনির' দলে। এমনই পর্দা যে আমিও দেখতে পাইনি। সেকালের শান্তিনিকেতনে মেয়েদের অবস্থার কথা বললে একালের মেয়েরা চমকে উঠবেন। যদৃচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা অজ্ঞাত। দ্বিপুবাবু বসে থাকতেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার একতলার উত্তরের বারান্দায়। তাঁর ভয়ে কেউ ওদিক মাড়াতো না। একদিনের পৌষ মেলা বসত শান্তি-নিকেতনের ফটকের সামনেই—সেখানে যাওয়া নিষেধ। তবে সন্ধ্যার পর বাজি পোড়ানো দেখাবার ব্যবস্থা হতো। তবে তাও খুব অদ্ভুত ভাবে। মহর্ষির আমলের চারচাকার এক বিরাট গো-যান ছিল। বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের তার মধ্যে ভরে সন্তোষচন্দ্রের নেতৃত্বে আমরা কয়জন গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে মন্দিরের পাশে এনে দাঁড় করাই। তারপর গাড়ির জানলা দিয়ে যে যতটা পারে বাজি পোড়ানো দেখে নিত। তখন মন্দিরের অদূরেই বাজি-পোড়ানো হতো। কোনো ঘরবাড়ি ছিল না কাছে। শুনেছি ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা গঙ্গাস্নানে যেতেন পালকি চড়ে। বেয়ারারা পালকিসুদ্ধ ডুবিয়ে মেয়েদের গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতো। পালকি থেকে নেমে ঘাটে দেখা দিতে পারতেন না। প্রাচীন কালের জয়গান করে কোনো নারী সেকালে ফিরতে আর চাইবে? শান্তিনিকেতনের এই গোঁড়ামি ভাঙলো যেদিন কলকাতা থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা কবির ভক্ত হয়ে এখানে আসতে আরম্ভ করলেন। দুপুরবেলা যাত্রা হতো সে-কথা পূর্বেই বলেছি। চিকের আড়ালে প্রথম দিকে তাঁরা বসতেন। একদিন সেই চিকের আবরু গেল সরে।

কথায় কথায় অনেকটা সরে এসেছি অভিনয়ের প্রসঙ্গ থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের টেস্ট হয়ে গিয়েছে। তারা 'মালিনী' মঞ্চস্থ করবে। খুব শক্ত। নানা ঘাত প্রতিঘাত সংঘাত আছে। মহড়া বা রিহার্সাল দেওয়াতেন অজিত-কুমার। আমি 'রাজা'র ভূমিকায় নামি। কথা তাড়াতাড়ি বলতাম বলে ধমক খেতাম অজিতদার কাছে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভাই সরোজচন্দ্র বা ভোলা নিয়েছিল 'সুপ্রিয়'র পার্ট ও জগদানন্দ রায়ের পুত্র ত্রিগুণানন্দ বা পটোল 'ক্ষেমঙ্করে'র ভূমিকায় নামে। রাণী সেজেছিল নরেন্দ্র খাঁ ও মালিনীর অংশে নামেন সুধীরঞ্জন দাশ। আজ আমি ও সুধীরঞ্জন সেদিনের স্মৃতি বহন করে চলেছি। নাটকটি ট্রাজেডি। কিন্তু কে জানতো তিন মাস পরে সত্যই আশ্রমে এক ট্রাজেডি ঘটবে। অথণ্ড বাংলার নানা জেলা থেকে ছাত্র আসতো—রাজপুত্র সাজলো নগেন্দ্র নামে এক ছাত্র। ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, রাজ-পুত্তুরের মতো চেহারা—রাজার সঙ্গে মানিয়েছিল ভালো। দলে ছিল খুলনার কিরণ দাস, মালদহের শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, আগরতলার সোমেন্দ্র দেববর্মা, বরিশালের অতুল সেন, সাহেবগঞ্জের বিশু বসু, ত্রিপুরার গিরিজা চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। আজ তারা কে কোথায় জানিনে—হয়ত অনেকেই ইহলোকে নেই।

সমসাময়িক ঘটনা। ১৯১০ সালের ৮ মে, ১৩১৭ সালের ২৫শে বৈশাখ আশ্রমে ঘরোয়া ভাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হলো—কবি ৫০ বৎসরে পদার্পণ করলেন। আজ পঁচিশে বৈশাখ প্রায় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে—তার সূচনা হলো এই দিনে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে। সেদিনকার একটা ঘটনা মনে পড়লে আজও হাসি পায়। প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ কলেজের ছাত্র, তখন থেকে রবীন্দ্র-ভক্ত—এসেছেন জন্মোৎসবের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তখন ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম চিহ্নিত পুরুষ অর্থাৎ দাগী আসামী। জোড়াসাঁকো থানার পাশ দিয়ে তাঁকে ঘোড়ার গাড়ি করে যেতে দেখলে পুলিস হেঁকে জানিয়ে দিত কোন্ 'নম্বর' যাচ্ছেন! সেটা তাদের কোড্ বা সংকেত-ধ্বনি। সে সময় প্রায়ই আশ্রমে পুলিসের গুপ্তচর আসতো। উৎসবের আভাস পেয়ে এসেছেন এক বৈরাগী—সদ্য-রঙ-করা গেরুয়া পরা। প্রশান্ত ও আমরা কয়জন সেই বৈরাগীকে নিয়ে বৈশাখের ঠিক দুপুরে খালিপায়ে আশ্রম ও চারপাশের মাঠ পরিক্রমা করলাম। বেচারাকে থামতে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না—আমরা রিলে করছি। ব্যাপার আরও কি গড়াতে পারে আন্দাজ করে বৈরাগী সরে পড়লেন। আজ মনে হয়, হয়তো সন্দেহ করে লোকটার প্রতি উৎপাত করেছিলাম।

জন্মোৎসবের দিনই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক

অভিনীত হলো আমাদের সেকালের খড়ের চালের নাট্যঘরে। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি। ধনঞ্জয় বৈরাগী সাজেন অজিতকুমার, প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে রূপদান করেন জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়—চলনে-বলনে প্রতাপেরই মতো। উদয়াদিত্য সাজেন নগেন আইচ। কালীমোহন ঘোষ—রামমোহন মাল। বসন্ত রায়—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। শরৎকুমার রায়—মন্ত্রী। কালিদাস বসু—মুক্তিয়ার খাঁ। রমাই ভাঁড়—হীরালাল সেন। পর্তুগীজ সেনাপতি ফার্ণানডিজ—চুনীলাল মুখুজ্যে। আমি ছোট পার্ট পাই—রাজশ্যালক। মাধবপুরের দলে ছিলেন সন্তোষ মিত্র, অক্ষয় রায়, অনঙ্গ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই।

হীরালাল সেন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভদ্রলোক খুলনা সেনহাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক। কি কুক্ষণে 'হুংকার' নামে কবিতার বই লিখে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি না নিয়েই তাঁকে উৎসর্গ করেন। কবিতাগুলির গুণাগুণ জানি না—বই দেখিনি, পুলিস বাজেয়াপ্ত করে সব বই। আর ভদ্রলোককে হুংকার দেবার জন্য ছয় মাস শ্রীঘরে বাস করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নাম জাড়ত থাকায় তাঁকে খুলনার আদালতে সাক্ষী দেবার জন্য যেতে হয়েছিল। হীরালাল সেন জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন চাকুরি নেই, কারণ জাতীয় বিদ্যালয়ই উঠে গেছে বেচারার ছুটি স্ত্রী, কেন জানিনে। মোট কথা তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ-ধরনের বহু 'অবাঞ্ছিত'দের কবি আশ্রয় দেন তাঁর আশ্রম বিদ্যালয়ে। কিন্তু একদিন এই জন্যেই গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টি পড়েছিল বিদ্যালয়ের উপর। সেকথা যথাস্থানে বলবো।

প্রায়শ্চিত্তের অভিনয় আবার হয় পূজার ছুটির পূর্বে। অজিতকুমার বিলাত গেছেন বৃত্তি পেয়ে। তাই এবার কবি ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় নামলেন—কবিকে এই প্রথম দেখলাম অভিনয়-মঞ্চে। রবি-বাউলের নৃত্য দেখতে এবং গান শুনতে পেয়ে ধন্য হলাম।

১৯১০ সালের জুন মাসে বা ১৩১৭ সালের আষাঢ়ের প্রথমে বিদ্যালয় খুললে এলাম শান্তিনিকেতনে চাকুরি নিয়ে। এক সপ্তাহ পরে বীথিকার পাশে শালতলায় কবি আমায় একান্তে ডেকে বললেন, 'প্রভাত, তোমায় গিরিডি যেতে হবে আজকেই।' একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পুত্র, আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কলেজে অধ্যয়নরত, হঠাৎ গৃহত্যাগী হয়েছে। ছেলেটি কবির খুবই প্রিয়, আমার সমবয়সী এবং বন্ধুশ্রেণীর। কবি বললেন, 'সে পশ্চিমে গিয়েছে এ খবর পেয়েছি, কিন্তু পাটনায় যায়নি [যদুনাথ সরকার]—পত্রে জানলাম। খুব সম্ভব তোমাদের বাড়ি গেছে।' আমায় দশ টাকার একটা নোট দিলেন।

গিরিধি গিয়ে দেখি কবির অনুমান ঠিক—শ্রীমান দিব্য বহাল তবিয়তে আছেন আমাদের বাড়িতে। ভাবতেই পারেননি যে আমি তাঁকে পাকড়াও করার সমন নিয়ে খোদ কবির কাছ থেকে এসেছি। সুতরাং চলতে হলো বোলপুর। এবার সঙ্গে চললেন মা, ছোট ভাই সু, ছোট দুই বোন কাতু ও কল্যাণী। যাদের কেন আনলাম সে ইতিহাসটা বলা দরকার।

এবার গ্রীষ্মাবকাশে গিরিধিতে এসে দেখেছিলাম মোহিতচন্দ্র সেনের বিধবা পত্নী সুশীলা সেন তাঁর দুই কন্যা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আছেন। সুশীলা দেবী শান্তিনিকেতনে মেয়ে বোর্ডিং-এর ভার নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটির আগে পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। মেয়ে বোর্ডিং-এ কয়টিই বা মেয়ে, কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল তারই মধ্যে। মেয়েদের আত্মীয় কুটুম্ব শিক্ষকরা যখন-তখন বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির হতেন; কোনো code of conduct না থাকায় জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনায় কবি সুশীলা দেবীকে সরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে আমাদের পারিবারিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। দাদা গিরিধির বাইরে কোনো গ্রাম্য জমিদার বা টিকায়িতের বাড়িতে গৃহশিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন। আমি ছুটির মধ্যে কবিকে লিখি সাংসারিক সমস্যার কথা। কবির সহৃদয় পত্র পড়বার মতো। তবে জানালেন যদি আমার মা বালিকা বোর্ডিং-এর ভার নিতে পারেন তবে ভালো হয়। তদনুযায়ী মা ও ভাইবোনদের নিয়ে বোলপুর এলাম ১৩১৭ সালের আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে। ভাইবোনদের নিয়ে মা নূতন বাড়িতে উঠলেন। আমি শুলাম শালতলার নব নির্মিত 'বীথিকা' ঘরে। খড়ের ঘর, মাটির দেওয়াল। সিমেন্টের মেঝে তখনও শুকোয়নি। এখন সে বাড়ির চিহ্নও নেই।

মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী তাঁর দুটি কন্যা নিয়ে গিরিধিতে আমাদের বাড়িতে গ্রীষ্মকালে কেন আশ্রয় নেন তার একটু ইতিহাস আছে। সুশীলা দেবী যখন মেয়ে বোর্ডিং-এর পরিচালিকা, তখন আমি থাকতাম নূতন বাড়ির একটা ছোট্ট ঘরে। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায়ই খোঁজখবর নিতেন। মাঘোৎসব থেকে ফিরে এসে সেখানকার কথা বলতেন। নূতন গান—'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' গানটির কথা বলেন। মোট কথা আমার প্রতি তাঁর একটা টান ছিল। তারও কারণ ছিল। আমার পিতা ও মোহিত চন্দ্র সেন ছিলেন আবাল্যের বন্ধু—সে কথা পূর্বেই বলেছি।

মা-ভাইবোনদের নিয়ে পলাতক ছাত্রটিকে সঙ্গে করে যেদিন আশ্রমে ফিরলাম, তার পরের দিন রাত্রে এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেল ক্ষুদ্র আশ্রম পরিবারে। বীথিকার নূতন ঘরে শুয়েছি—শেষরাতে সাহেবগঞ্জের বিশু বসু এসে ডাকছে,

'প্রভাতদা উঠুন, ভোলা মারা গেছে।' চমকে উঠলাম, ভোলা মারা গেছে! এই তো ছুটির পূর্বে সবাই মিলে মালিনী নাটক অভিনয় করেছিলাম।

লাইব্রেরীর পাশে যে একটা নিচু ছাদের ঘর ছিল, যেখানে প্রথম এসে উঠি আমি—সেখানে তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস। তারা অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে, তাই তাদের ছাত্রাবাস থেকে একটু দূরেই ঘর দেওয়া হয়। ঘরে ঢুকে দেখি হরিচরণ ডাক্তার বসে আছেন। তিনি বোলপুরের সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার—আশ্রমের ডাক্তারও বটে। তখন আবাসিক চিকিৎসক-পদ সৃষ্টি হয়নি। হরিচরণ ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখছেন কি? হয়ে গেছে!' তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গিই ছিল ঐরূপ। দূরে সন্তোষচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে আছেন।

সেই রাতেই বড় ছেলেরা ভোলার দেহ নিয়ে চলে গেল—সঙ্গে আমিও ছিলাম। ষোল বছরের ছেলে—দেখেছিলাম কি সাহিত্যিক প্রতিভা তার মধ্যে। ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হতো পরীক্ষা পাসের জন্য। কিন্তু তার বাইরে অজিতকুমারের কাছে তারা পড়তো এমার্সনের গদ্যপ্রবন্ধ, সেক্স-পীয়রের হ্যামলেট নাটক, শেলীর কবিতা। আমিও সেখানে ছাত্ররূপেই বসতাম। দেখতাম ভোলাকে সেখানে বোদ্ধারূপে। সেই ভোলা চলে গেল।

ভোলার দেহ দাহ করে ফিরলাম—তখনো সকাল হয়নি। ছাত্ররা পরে তাদের বন্ধুর চিতাভস্মের উপর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ নির্মাণ করে। অদূরেই ছিল সতীশচন্দ্র রায়ের চিতার চিহ্ন। আজ সেস্থানে কোন চিহ্ন নেই—কত বাড়ি হয়েছে, গলিঘুঁজিতে আকীর্ণ। অতীতের সেই স্থানগুলি আজ বিলুপ্ত। কিন্তু স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা যায় না তো! যখনই ফিরে ফিরে চাই অতীতের দিকে, তখন কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে তারা ভেসে আসে জানিনে। রূপ নেয় লেখনীর মুখে কি ভাবে—সে রহস্যের কথা কেউ বলতে পারে না।

মা বোর্ডিং-এর মেয়েদের দেখাশোনা করেন, বোন দুটি তাঁর কাছে থাকে; ছোট ভাই 'সু' থাকে ছাত্রাবাসে। মা কেবল মেয়েদেরই দেখেন না, ছোট ছেলেদের অনেক আবদার সহ্য করতেন। তারা কোথা থেকে পাকা তাল এনে হাজির করে; মা তোলা উনুনে তাদের জন্য গরম গরম তালের বড়া করে দেন। কোনো ছেলে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে তুলে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। তখন তো ছোট আশ্রম, একটা পরিবারের মতো।

সমসাময়িক এক শিশুছাত্র—এখন বৃদ্ধ উদ্বাস্তু, আমাকে পুরাতন স্মৃতিকথা

লিখে পাঠান। তখন সে আশ্রমে এসেছে নূতন। সকলের সঙ্গে উপাসনায় বসেছে। কিন্তু ভয়ানক পায়খানা পেয়েছে। কাপড় নষ্ট করে বসে আছে চুপ-চাপ। অন্যেরা চলে গেছে সমবেত মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাকে মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে মা কাছে যেতেই সব বুঝতে পারলেন। সে লিখছে যে, তারপর মা তাকে উঠিয়ে পরিষ্কার করে কাপড় কেচে ঘরে পৌঁছিয়ে দিলেন।

মা কাছে এলেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর হার্টের ব্যথা উঠতো। একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন কি কাজে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই বুকের ব্যথাটা দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ মাকে বিছানায় শুইয়ে রাখলেন দুই দিন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সেবার দিকটার কথা বড় কেউ জানে না। অথচ ইনি হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের কাছে বসতে পারতেন না, হাসপাতালটার জমাট বাঁধা বেদনা তাঁর কাছে অসহ্য লাগতো।

পূজার ছুটি আগত। স্থির হয়েছে বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হবে, মা বোনদের নিয়ে গিরিডি ফিরে গেলেন। ১৩১৭ সালের ১১ই শ্রাবণ বিকালে শান্তিনিকেতনে দ্বিতলে গিয়ে কবিকে প্রণাম করে বললাম, "আজ আমার জন্মদিন, আঠারো বৎসর পূর্ণ হলো।" কবি বললেন, "আগে বলনি কেন? বৌমাকে বলতাম কিছু মিষ্টিমুখের জন্য।" কিন্তু সেদিন বুধবারের সান্ধ্য উপাসনায় কবি আমাকে অমর করে গেলেন। বললেন, "আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, আজ আমার জন্মদিন, আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।" ভাষণটি শান্তিনিকেতনে উপদেশমালার 'পূর্ণ' শীর্ষক।

আশ্রমের মধ্যে হাস্য-রসিকতা, দুষ্টুমির যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কয়েকটা উদাহরণ লেখবার জন্য লেখনী নিসপিস করছে। তাই লেখনীকে ছেড়ে দিচ্ছি সেই অতীতের স্মৃতিচারণে।

হীরালাল সেন রসিক ছিলেন—তাঁর রমাই ভাঁড়ের অভিনয় আমরা খুবই উপভোগ করি। কিন্তু 'এপ্রিল ফুল' বা পয়লা এপ্রিলের রসিকতায় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। তখন বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীদের কর্মতৎপরতার যুগ চলছে। হীরালাল সেন তাঁর বাইরের এক বন্ধুকে আই. বি. সাজিয়ে সন্ধ্যার পর শিক্ষকদের উপর হামলা শুরু করান। মনে পড়ছে চুনীলাল মুখুজ্জেকে সব থেকে ভয় পাইয়ে দেন, অথচ সে বেচারার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্বন্ধই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পুলিসী গুপ্তচর ঘোরাঘুরি করছে জানতে পেরে কতকগুলি পত্র প্রবন্ধ

নষ্ট করে ফেলেন শুনলাম। পরে যখন জানা গেল হীরালালের এই রসিকতা, তখন অনেকেই বিরক্ত হন। আজ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা ও রচনা নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা জানতে পারলেন না সে রাতে কার পত্র বা কবির কি রচনা নষ্ট হয়েছিল।

আমায় লোকে শুধোয়, 'দাড়ি কতকাল রাখছেন।' অনেকেই মনে করেন বৃদ্ধ বয়সে অনেকের মতো আমি বুঝি দাড়ি রাখছি। আমি তাঁদের বলি আমার দাড়ির বয়স ষাট বৎসর। আমার কচি দাড়ির প্রতি সবারই চোখ। রথীবাবু, দিনুবাবুরা বলতেন, 'প্রভাত, আমরা তোমায় শেভিং সেট্ উপহার দেবো, দাড়ি কামাও।' এপ্রিল ফুল রাতে পাশের ঘরের দেওয়াল টপকে বন্ধু জীবনময় রায় এসে কানের কাছে ক্যাঁচ করে শব্দ করে একগোছা দাড়ি কেটে দে চম্পট। বসন্ত উৎসবে আবীর মাখাবার লক্ষ্য ছিল আমার দাড়ি গোঁফ এবং মাথার কোঁকড়া লম্বা চুল। একদিন কবিরও দৃষ্টি পড়ল। কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয় হবে। আমি জীবন সর্দার। বিচিত্রা বাড়ির দোতলার হলে রয়েছেন কবি—আর চারদিকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব—গগনঠাকুর, অবনঠাকুর আরও সব কারা। আমার ডাক পড়লো। কবি বললেন, 'জীবন সর্দার চিরনবীনতার প্রতীক। তোমাকে দাড়ি গোঁফ কামাতে হবে।' আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলি, 'রথীবাবু বলেন দাড়িতে বেশ মানায় আমাকে।' কে শোনে আমার কথা? কর্তা হাঁক পাড়লেন, 'ভর্তুলাল'। ভর্তুলাল পুরাতন দারোয়ান। হাজির হলো। হুকুম হলো, 'নৌ বোলাও', অর্থাৎ নাপিত ডাকো। নাপিত এলো। বিচিত্রার বারান্দায় নাপিতের হাতে আমার মুণ্ড সমর্পণ করলাম। গুম্ফশ্মশ্রুহীন হয়ে কবির সামনে যেতেই বলে উঠলেন, 'আঃ, মেঘমুক্ত প্রভাত।' আমি তো আর বলতে পারলাম না, 'মেঘমুক্ত রবি দেখা দিক একবার।'

ছাত্রদের অন্তরালে শিক্ষকরা নানা রকমের হাসি-তামাসা করতেন। ওংকারানন্দ নামে 'ঢাকার বাঙাল' ড্রয়িং শিক্ষক—গেরুয়া পরতেন, জপতপও করতেন। মুকুল দে, মণি গুপ্ত প্রভৃতির ছবিতে হাতেখড়ি হয় এঁর কাছেই। খোলা কথা বুদ্ধি একটু ভোতা, হাসি-ঠাট্টা বুঝতে বেশ সময় লাগে। তাঁকে নিয়ে একবার একটু রূঢ় রকমের কৌতুক করা হয়েছিল। তাঁকে বলা হলো একটি মেয়ে তাঁর বৈরাগ্যের রূপে মুগ্ধ হয়েছে, একবার তাঁকে দেখতে চায় বীরবেশে। বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদে তাঁকে সাহেবী পোশাক পরিয়ে সেই কল্পিত কন্যার কল্পিত গৃহের সামনে ঘণ্টাকয়েক পায়চারি করানো হলো। তারপর অজিত-বাবু তাঁকে বললেন সেই কন্যা পারুল বনে জ্যোৎস্না রাতে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে

চান। তখন শান্তিনিকেতনের কাছে রেলের সেতু ছিল—আমরা পারুলডাঙার বনে প্রায়ই যেতাম বেড়াতে। চণ্ডী সিং পুরাতন ছাত্র, কলকাতায় কলেজে পড়ে, এসেছে বেড়াতে। তাকে মেয়ে সাজিয়ে পারুল বনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওংকারানন্দ বীরবেশে এসে অনর্গল কথা বলছেন তাঁর কল্পলতার সঙ্গে; চণ্ডী মাঝে মাঝে হাতের গয়নার টুংটাং শব্দ করেও দুই-একটা কথা বলে। অজিতবাবু অনেকক্ষণ হাসি চেপেছিলেন, তারপর হঠাৎ বোমা ফাটার মতো হেসে উঠতেই ওংকারানন্দ বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা—চঁণ্ডীটা এঁমন পাঁজি হঁয়েছেঁ। কঁলকাঁতায় গিয়ে বঁকে গেঁছে।' এই ষড়যন্ত্রে দিনুবাবুর স্ত্রী কমলাদিকে টানতে হয়েছিল, শাড়ি গয়না তিনিই সরবরাহ করেন।

এপ্রিল ফুলের তামাসা কেবল আমাদের মধ্যে সীমিত ছিল না—ছাত্রদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়। জ্যোৎস্না সেন ত্রিপুরা জেলার এক ছাত্র, খুব ভালো-মানুষ। বসন্ত কলকাতার ছেলে, দুষ্টুর সেরা। সে জ্যোৎস্নাকে বলল, 'আজ শরৎবাবুকে এপ্রিল ফুল করব।' একটা রসের হাঁড়িতে গোবর জল ভরে সুন্দর ভাবে কলসীর মুখ এ টে জ্যোৎস্নাকে বলল, 'চলো, শরৎবাবুকে বলি দেশ থেকে গুড় এসেছে।' বেচারা জ্যোৎস্না গুড়ের কলসী মাথায় করে চলেছে। বসন্ত পিছনে। হঠাৎ একটা ডাণ্ডা দিয়ে মারলো কলসীর উপর—কলসী ভেঙে গোবর জল জ্যোৎস্নার মাথা মুখে পড়ে ছড়িয়ে। বসন্ত তৎক্ষণে পগার পার। জ্যোৎস্না কথাটি না বলে ছুটে গাবতলার কুয়োয় গিয়ে জল তুলে স্নান করে এলো।

'শারোদোৎসব' প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন নি। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে অভিনয় করে—সে অভিনয় আমি দেখি নি। দ্বিতীয়বার কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামেন। ছেলেরাই স্টেজ সাজিয়েছে, পদ্ম এনেছে রাশি রাশি, কাশ ফুল তুলে কাদার ডাব করে তার উপর পুঁতেছে। পাতায় ফুলে নাট্যঘরের মঞ্চ ভরে উঠেছে। তখন ছেলেরাই গান করতো, তারাই নাচত স্বাভাবিক ভাবে। তারাই ফুট লাইট যোগাড় করে আনে শান্তিনিকেতন বাড়ি থেকে—দ্বিপুবাবুর কাছ থেকে চেয়ে। এককালে আশ্রমে—বিদ্যালয় পর্বেরও পূর্বে—'শান্তিনিকেতন' গৃহ ও মন্দিরের কাছাকাছি কয়েকটা ল্যাম্প পোস্ট ছিলো—তাতে এই বাতিগুলো জ্বালানো হতো। সেই বাতিগুলো দ্বিপুবাবু রাখেন শান্তিনিকেতন বাড়ির সিঁড়ির নীচের ঘরে। ছেলেরা জানতো এর সন্ধান। তারা সেগুলো এনে ফুট লাইট করে। ড্রপসীন তৈরী করেন ছাত্র মুকুল দে—শিবের তাণ্ডবের ছবি এঁকে। ভিতরে কোনো সীন থাকতো না—

স্ক্রীন দিয়ে পট পরিবর্তন সূচিত হতো। এখন মানুষের মন এরকম দৃশ্যপটহীন অভিনয়ে ভরে না—এখন সমস্তটা বাস্তব করে দেখাতে হবে।

কবির বিলাত যাবার পূর্বে 'রাজা' নাটক অভিনীত হয়। 'রাজা' নাটক নিয়ে সাহিত্যিকরা অনেক আলোচনা করেছেন, আজও তার নিবৃত্তি হয় নি—হওয়া সম্ভবও নয়—নূতন সাহিত্যিকরা নব নব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন চিরকালই। আমাদের পাবলিক রঙ্গমঞ্চে 'রাজা' অভিনয় হয় বলে জানি নে। বিলাতে ইংরাজী The King of the Dark Chamber ও Post office শৌখীন রঙ্গমঞ্চে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। আমাদের পুরাতন নাট্যঘরে রাজা মঞ্চস্থ হলো দুবার—১৩১৭ সালের ৫ই চৈত্র ও দ্বিতীয়বার কবির ৫০তম জন্মোৎসবের দিন। এই সময়ে আমাদের সৌভাগ্য হলো কবির কাছ থেকে 'জীবনস্মৃতি'র খসড়া শোনা; সঙ্গে সঙ্গে চলতো সাহিত্যের আলোচনা। এসব আলোচনায় যোগ দেবার শক্তি বুদ্ধি আমার ছিল না—অংশগ্রহণ করতেন অজিতকুমার, ক্ষিতিমোহন প্রভৃতি। তবে কবির মুখে 'গোরা' পাঠ ও আলোচনা শুনি অনেকদিন ধরে। সেই সময়ে একটা কাহিনী কবি বলেন। কোনো মহিলা পত্রযোগে কবিকে লেখেন, "মহাশয়, গত তিন বৎসর প্রবাসী কিনিয়া আপনার গোরা পড়িয়াছি, এতই লিখিলেন, শেষকালে গোরার সহিত সুচরিতার বিবাহটা দিতে পারলেন না?" বেচারা পাঠিকার মনে বড়ই লেগেছিল।

কবি মাঝে মাঝে নূতন বই বা তাঁর কোনো প্রিয় বই আমাদের পড়ে শোনাতেন—এই সময়ে শোনান The creed of Buddha নামে একটি বই; লেখকের নাম ছিল না, গ্রন্থকারের নামের স্থানে ছিল The author of the creed of christ; পরে জানি এঁর নাম Edmond Holmes। Holmes-এর বই খুব ভালোবাসতেন কবি। এঁর লেখা 'What is and what might be' এবং 'In defence of what is and what might be' নামে দুখানি শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ কিনে নিজে পড়েন ও আমাদের পড়বার জন্য উৎসাহিত করেন। আমার জীবনে শিক্ষা-বিষয়ক যে কয়খানি গ্রন্থ মনে দাগ কেটেছে তার প্রথমটি হচ্ছে হার্বার্ট স্পেন্সারের Education, Holmes-এর বই এবং আরও পরে Democracy and Education—দার্শনিক জন ডিউই-এর লেখা গ্রন্থ। The creed of Buddha কবি পড়তেন, ব্যাখ্যা করতেন, আলোচনা করতেন। বুদ্ধতত্ত্বের মূল কথা অন্য ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হওয়ায় বইটা খুবই ভাল লাগত। কবি যেন মূলতত্ত্বে প্রবেশ করে সব বোঝাতেন।

অনেক রচনার প্রথম শ্রোতা হতাম আমরা; গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর,

অচলায়তন প্রভৃতি পাঠ শুনি। রবীন্দ্রনাথ তো পড়তেন না—মনে হতো যেন আবৃত্তি অভিনয় করে চলেছেন। এইসব অনাহূত সভায় রবাহূত অনেকেই আসতেন। অধ্যাপক, শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতির শ্রেণীকরণ তখনও হয় নি। অধ্যাপক সভায় সবাই আসতেন, সেখানে সকল বিষয়ের আলোচনা হতো। বসতাম সতরঞ্চে গোল টেবিলে বসার মতো—রবীন্দ্রনাথও বসতেন সবার সঙ্গে। বোধ হয় অর্থাভাব ছিল বলে, সাম্যভাবটা দেখা যেতো। তারপর যেই সেই 'অশুচি' পদার্থের স্পর্শ পেলাম—সেই necessary evil ধীরে ধীরে সব বানচাল করে দিল। টাকার অভাব ছিল, দারুণ দারিদ্র্য—এ কথা অস্বীকার করবো না। সে সব কাহিনী আজ কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। তবে অর্থাভাব থাকলেও গবর্মেণ্টের দ্বারস্থ হই নি। সেকালের বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক স্টার্ক সাহেব এসেছিলেন বোলপুর বিদ্যালয় দেখবার জন্য। আশ্রমে এসে কত ভাবে ইঙ্গিত করলেন সাহায্য দানের ; জগদানন্দ রায় ও আমি ছিলাম তাঁর বিদায়-কালে। তাঁকে বলা হলো কোনো অভাব নেই, কিন্তু কথাটা সত্য নয়—কয়েকদিন পূর্বে বাজারে ধার এতো জমে ছিল যে নিত্যবাবুর লটকোনার দোকানের মুহুরী সহবৎ গাড়োয়ানকে মাল না দিয়ে বিদায় করে দেয়। ভাগ্যে নিত্যবাবু ছিলেন দ্বিপুবাবুর ক্লাবের সদস্য—তাঁর মধ্যস্থতায় খাদ্যসামগ্রী আবার আসে, আমরা খেতে পাই।

বিলাত থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির রয়্যালটির প্রথম যে কিস্তি পান সেই নব্বই পাউণ্ড পাঠিয়ে দেন বাজার দেনা শোধ করবার জন্য।

মাইনে যখন হলো, তখন এই ব্যাঙের আধুলি থেকে সঞ্চয় করার পরামর্শ দিলেন শরৎবাবু। তিনি শিক্ষক ও বোম্বায়ের ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্টরূপে কাজ করেন। তাঁর পরামর্শে এক হাজার টাকার বীমা করলাম বিশ কি পঁচিশ বৎসরের জন্য। ঠিক হলো মাসিক কিস্তি দেবো। কিন্তু ১৫ টাকা বেতনও ঠিক সময় মতো সবটা একসঙ্গে পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ার রাজেনদা হিসাবরক্ষক, খাজাঞ্চী, আমাদের ব্যাঙ্কও বটে। বীমা দেবার শেষ দিন ধর্না দিয়ে ন টাকা দশ আনা নিই—নানা তহবিলের মোড়ক থেকে খুঁজে পেতে বীমার মাসিক দেয় তো আদায় হলো ; কিন্তু আরও দু আনা দরকার, মনি-অর্ডার করতে হবে। এই ছিল ধনভাণ্ডারের অবস্থা। এই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছি, পড়াশুনা করেছি, ছাত্রদের পড়িয়েছি—প্রাইভেট টিউশন করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করি নি—ছেলেদের পরিচর্যা করেছি, আশ্রমের যে কাজের জন্য আহ্বান আসতো, হাস্যমুখে করতাম—ফালতু কাজ বলে 'উপরি'

আদায়ের কথা কল্পনাতেও আসতো না। কিন্তু কাল বদলে গেছে।

১৯১০ সালে পূজার পর এসে দেখি খ্রীষ্টমাসে এলাহাবাদের কংগ্রেস ও প্রদর্শনীতে অনেকেই যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। এই প্রস্তাবের পাণ্ডা নেপালচন্দ্র রায়—বহুকাল এলাহাবাদে ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে কিছু না বললে শান্তিনিকেতনের কথাই অপূর্ণ থাকবে।

১৯১০ সালের জুন মাসে বিদ্যালয় খোলার কয়েকদিন পরে, আমার চাকরি পাবার পর নেপালবাবু এলেন ম্যাট্রিক ছাত্রদের পরীক্ষাসাগর পার করবার কাণ্ডারী হয়ে। তিনি ছিলেন এলাহাবাদে অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের হেডমাস্টার। সে কাজ ছাড়তে হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের গভর্ণরের আদেশে। তাঁর অপরাধ—তিনি ছিলেন দেশভক্ত, ভারতীয়দের আত্মসম্মান রাখবার জন্য বৃটিশ সরকারের সকল প্রকার স্বৈরাচারকে রুখতে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মতো ব্রহ্মবাদীর কচিৎ দেখা মিলতো—জীবনের বাক্যে ও কর্মে ব্রহ্মজ্ঞানী। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেস্টার বৃত্তিলাভ করে বিদেশে যাচ্ছেন—তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্য কবি যোগ্য ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন।

কবি জন্মদিনের প্রথম উৎসব শান্তিনিকেতনে নিষ্পন্ন হবার পর বিদ্যালয় গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতায় অজিতকুমারের বিবাহ-সভায় নেপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হলো। কবি তাঁকে বলেন অজিতের জায়গায় কয়েক মাস আশ্রমে এসে ম্যাট্রিক ছাত্রদের অধ্যাপনার ভার গ্রহণের জন্য। নেপালবাবু এলাহাবাদ ত্যাগের পর কলকাতায় এসে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে আইন পরীক্ষায় পাস করেছেন—ইচ্ছা, স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবেন—কিন্তু দৈবের লিখন ছিল অ-দৃশ্য কালিতে লেখা—সেই কয় মাসের জন্য আসাটা দীর্ঘ হতে হতে বৎসরের পর বৎসরান্তে চলতে চলতে বহু বৎসর চলে গিয়েছিল। এমন আত্মভোলা মানুষ দেখা যায় কম—অথচ দেশ-সেবায় তাঁর মন ছিল অটল। সকল কাজেই উৎসাহ—ছাত্রদের সঙ্গে ফুটবল খেলা, বেফারীগিরি করা, তাদের ভ্রমণসঙ্গী হওয়া, সবার সঙ্গে অভিনয় করা—কোনোটাতেই আপত্তি ছিল না। এলাহাবাদে বাঙালী ছাত্র তথা যুব সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর তিনি হন চক্ষুশূল।

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেবার এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের

অধিবেশন, তার সঙ্গে বসেছে একটি একজিবিশন বা প্রদর্শনী। নেপালবাবুর খুব উৎসাহ—পৌষ উৎসবের পরেই সেখানে যাবেন; আমরা কয়েকজন মেতে উঠলাম। আমি বয়োকনিষ্ঠ বলে আমার উৎসাহটাই বেশি—মধুপুরের পশ্চিমে উত্তর ভারত তখনও দেখি নি—তাই দেশ দেখবো, নূতন মানুষের পরিচয় পাবো—এই ভাবনা থেকে আমি সঙ্গী হবো বললাম। ক্ষিতিমোহনবাবু, জগদানন্দবাবু প্রভৃতি অনেকেই যাবার জন্য নেচেছিলেন। এমন সময়ে কে রটনা করে দিল—উত্তর ভারতে প্লেগ হচ্ছে। যেমন গুজবদেবী কান থেকে কানান্তরে কথাটা ফিসফিসিয়ে প্রচার করে দিলেন—সবারই এলাহাবাদে যাওয়ার উৎসাহ-বহ্নি নির্বাপিত হলো। কেবল আমি বললাম, 'আমি যাবই'।

গরমের কোট প্যাণ্ট ছিল; যোগাড় করলাম সন্তোষ মজুমদারের আমেরিকা-ফেরত ওভার-কোট। মাথায় চড়ালাম পাগড়ি—এই পাগড়ি পরার কারণ ছিল। কালটা ১৯১০। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের রুদ্রহস্তের খেলা বাংলার মধ্যে সীমিত নেই—সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিককার পুলিসের কড়া দৃষ্টি বাঙালী যুবকদের উপর। তাই এই অপরূপ বেশ গ্রহণ করে এলাহাবাদ রওনা হলাম।

সেকালে রেল-ভ্রমণের কতকগুলি সুবিধা ছিল। উইক্-এণ্ড, পূজা ও খৃষ্টমাস, ঈস্টার কনসেশন টিকিট পাওয়া যেতো এক যাত্রার ভাড়ার উপর সামান্য কিছু দিলেই এই পাওয়া যেতো সুবিধাটা। এখনকার লোকে হাসবেন—বোলপুর থেকে কলকাতা যাওয়া-আসার উইক্-এণ্ড ভাড়ার কথা শুনে। শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই রিটার্ন টিকিটের মেয়াদ—ভাড়া ছিল দুই টাকা চার আনা—পরে দুই টাকাও হয়! এখন?

খৃষ্টমাসের কনসেশন টিকিট কিনে রওনা দিলাম। বর্ধমানে বোধ হয় বোম্বাই মেলই ধরেছিলাম—এলাহাবাদ পৌছলাম বিকাল থাকতে। সেকালে ট্যাক্সি, বাস, রিক্শ অজ্ঞাত। স্টেশনে নেমে টাঙ্গা পেলাম। তারপর শুরু হলো নেপালবাবুর পুরাতন বন্ধুর বাসার সন্ধান। মহল্লার পর মহল্লায় চলেছি—বাঙালী, অবাঙালী, যাকে পাই শুধুই 'অমুক সরকারের বাড়িটা বলতে পারেন?' জবাব দেন না বেশির ভাগ পথিক। কেউ বলেন হিন্দীতে আমার কথা বুঝলেন না, যদিও আমি হিন্দীতেই প্রশ্ন করেছিলাম। নেপালবাবুর ভুলো মনের কথা তখনো বেশি প্রকাশ পায় নি, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার মশায়ের বাড়ি খোঁজার হয়রানি চললো। টাঙাওয়ালা বকাবকি শুরু করলো—তখন তাকে বলি, 'দরিয়াগঞ্জ চলো। বোস সাহেবের মোকাম জানো?' সে বললে, 'উনকো মোকাম প্রয়াগকা

চিড়িয়া ভী জানতে। পহেলে কেঁও নাহী কহা, হামারাভী হয়রানি, আপকো ভী।'

বারান্দায় উঠে দেখি লোক গিস্‌গিস করছে। একজন এগিয়ে এলেন আমার দিকে—একটি উনিশ বছরের ছোকরা, মাথায় পাগড়ি, কোট প্যাণ্ট পরা—কোন দেশীয়। পরিচয় দিলাম ও নেপালবাবুর পত্রখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, "প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুরে এই ঠিকানায় সরকার মশায়ের সন্ধান পেলাম না। আমায় একটু আশ্রয় দিতে হবে। আমি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কর্মী।"

হঠাৎ দেখি এক সৌম্যমূর্তি ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন—বোধ হয় নেপালবাবুর নাম শুনতে পেয়েছিলেন। রামানন্দবাবু আমাকে চিনতেন না, তবে তাঁর কাছে তো অনেক পত্রিকা আসতো—দেখে থাকবেন ঢাকার 'সোপান' নামে শিশুদের পত্রিকা ও মহিলাদের পত্রিকা 'ভারত মহিলা'—যাতে আমার কয়েকটা রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। দুই-একটা প্রশ্ন করে বুঝলেন, আমি সত্যই শান্তিনিকেতন-বাসী। আমায় শুধুলেন, নেপালবাবুদের আসার কথা ছিল না? আমি বললাম, 'হাঁ। কিন্তু কে রটনা করেছিল এলাহাবাদে প্লেগ—তাই সব পণ্ড হয়ে গেল।' রামানন্দবাবু একটু হাসলেন—আর কিছু বললেন না।

এমন সময় মেজর বি. ডি. বোস এসে বললেন, 'You will be the eightieth guest—you are welcome'। ইনি মিলিটারী ডাক্তার ছিলেন। আই. এম. এস.—কিন্তু বৃটিশ কোনো অশিক্ষিত ডাক্তারকে তাঁর উপরে প্রমোশন দিলে, তিনি সরকারী কাজ ছেড়ে দেন। তারপর ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন—তাঁর ও কর্ণেল কীর্তিকারের Indian Medicinal Plants নামে গ্রন্থ গবেষণার অমর কীর্তি। মেজর বসু সম্পাদিত Rise of British Power in India বহু তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ।

পরদিন প্রাতে একটা খোলা ছাদে চায়ের আসরে সবায় সঙ্গে হাজির হলাম। চা ঢেলে দিচ্ছেন শ্রীশচন্দ্র বসু, হাইকোর্টের জনৈক বিচারক। তাঁর মতো আইনজ্ঞ পণ্ডিত আমার মতো অর্বাচীনকে চা ঢেলে দিচ্ছেন—অতিথি সৎকারের আদর্শ।

কংগ্রেসে গেলাম, গ্যালারিতে সীট্। মঞ্চের উপর সভাপতি ওয়েডার্‌ বার্ন—আরও দেখলাম গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে—ঠিক ছবিতে যেমন দেখতাম—মাথায় মারাঠা টুপি, গলায় বেড় দেওয়া চাদর। বক্তৃতা করলেন, শুনতে পেলাম না—সে-কালে তো মাইক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি—তাই বক্তাদের গলার জোরে

আসর জমাতে হতো। এই মঞ্চ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল থেকে আগত মণিলাল ডক্টর নামে জনৈক প্রবাসী ভারতীয় বক্তৃতা করলেন--শুনতে পেলাম। ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশার কথা, ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কথা কানে এলো। গান্ধী সম্বন্ধে সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে সবারই জ্ঞান বোধ হয় আমারই মতন। তবে এখন জানি—রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের কথা জেনে তাঁর নাটক 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর অপরূপ চরিত্রাঙ্কন করেছিলেন।

মঞ্চ থেকে জিতেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের সব কথা শুনতে পেলাম গ্যালারিতে বসে। ইনি সুরেন্দ্রনাথের রিপন কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক। আগামী বৎসর ১৯১১ সালে ভারত-সম্রাট বৃটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ সস্ত্রীক ভারতে আসছেন—তাঁকে কংগ্রেস থেকে অভ্যর্থনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন জিতেন্দ্রলাল। কী ওজস্বিনী ভাষা—ইংরজি যেন খই ফুটছে তাঁর মুখে। জিতেনবাবুকে জানতাম কলকাতায় —১৪নং হ্যারিসন রোডের মেসেও গিয়েছি—পরযুগে তাঁকে জেলাবোর্ডের সভাপতি রূপে দেখেছিলাম; কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি আজ বিস্মৃত। কেন —সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

বক্তৃতা শুনছি, হঠাৎ মাথার উপর গোঁ গোঁ শব্দ। সকল দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টি গেল সেই দিকে। লম্বা ফালি ফালি চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ব্লেরিও-র (Bleriot) আকাশ-যন্ত্র উড়ে গেল। ব্লেরোয়া ফরাসী বৈমানিক—গত বৎসর ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেন। সেকালে এরোপ্লেনে দুই পাখনা ছিল না—চার পাখনা—এদের বলতো বাইপ্লেন—আজকাল এসব উঠে গেছে—মিউজিয়ামে দেখা যেতে পারে। তখন এই আকাশ-যন্ত্র যে একদিন মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে, তা কেউ ভাবতে পারে নি। দুই বৎসর পরে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে য়ুরোপীয়রা এই আকাশ-যন্ত্রকে বোমা ফেলার কাজে ব্যবহৃত করে।

দ্বিতীয় দিন সারা দুপুরটা কাটে প্রদর্শনী মেলায়। পূর্বে কখনো এ ধরনের প্রদর্শনী দেখি নি। এই মেলার একটি অংশে ছিল ভারত চিত্রকলার নমুনা—কাংড়া, কুলু, রাজস্থান, পার্শিয়ান চিত্র। বাংলা দেশের চিত্রকলা তখন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে—তারও নমুনা দেখা গেল। মনে পড়ছে ১৯০৮ সালে কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজের হলে (১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীটস্থ) এক সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠন স্লাইড দেখিয়ে আনন্দ কুমারস্বামী ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা আমাদের দেখান—সভাপতি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁকে সেই প্রথম দেখি—তবে

চেহারার মধ্যে ঠাকুরবাড়ির বৈশিষ্ট্য ছিল না বলে, তাঁর কথা ভুলেই যাই। আনন্দ কুমারস্বামী প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে জাভা দ্বীপের নরকপালোপরি উপবিষ্ট গণেশ মূর্তি। অপরূপ! আর একদিন কোনারকে দেখেছিলাম নৃত্যোন্মত্ত গণেশ। কী অদ্ভুত, কী অপরূপ ভঙ্গী!

এখানকার প্রদর্শনীতে একটা প্রকাণ্ড বই দেখলাম—কাপড়ের 'পাড়ে'র নমুনা আছে তার পাতায় পাতায়। শুনলাম ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় যখন ভারতীয় শাড়ি-কাপড়ের 'পাড়ে'র খ্যাতি ছিল, সেই সময়ে জনৈক বৃটিশ শিল্প-রসিক এই রকম তিনখানি খাতা তৈরী করেন। একটা খাতা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃটিশ ম্যুজিয়ামে, দ্বিতীয়টি ল্যাংকাশায়ার কাপড়-কলের মালিকদের হস্তে সমর্পিত হয়। তৃতীয়টি কেমন করে ভারতে থেকে যায়। মেজর বি. ডি. বসু সেই কপির সন্ধান পেয়ে প্রদর্শনীতে আনেন। সে-যুগে তাঁতিরা তাঁতের ভিতরে নানা রকমের 'পাড়' তুলতে পারতো—জ্যাকার্ড, ডবিন প্রভৃতি যন্ত্র তখন অজ্ঞাত। সেই কলা বোধ হয় লোপ পেয়েছে—এখন তো কলের সাহায্যে সবই হয়।

প্রদর্শনীতে তৃতীয় দিন কাটালাম 'শিক্ষা' বিভাগে। শিক্ষকতায় হাতে-খড়ি হয়েছে এই তো কয় মাস। নিজেকে তৈরী করবার জন্য শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে কয়খানি শিক্ষণ-বিষয়ক বই ছিল ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছিলাম। এখানে দেখলাম ইংলণ্ডের Croydon Public School থেকে ছাত্রদের লিখিত কয়েকখানা এক্সারসাইজ বুক। একটা নমুনা খুব ভালো লাগলো—টুকে এনে শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করি। খাতার সামনাসামনি দুটো পাতায় চারটে ঘর—একটাতে আকাশের কথা—সকালে উঠে আকাশ কেমন ছিল, পরে কি পরিবর্তন হয় তা ছাত্ররা লিপিবদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় ঘরে জীবজন্তু বা প্রাণীজগতের কি দেখেছে। তৃতীয় ঘরে গাছপালার কথা। চতুর্থ ঘরে এ সব ছাড়া যা কিছু ছাত্রদের মনকে আকৃষ্ট করেছে, তাই লিখেছে। এই সব দেখে এইটুকু বুঝলাম যে শিশুকাল থেকে তাদের চোখ কান বুদ্ধি বিবেচনার চর্চা বই-এর পাতার মধ্যে সীমিত হয় না। দৃশ্যমান জগৎকে তারা দেখতে জানে বলে তারা জগৎ জয় করেছিল। **Roxburgh, Carey, Hooker, Brandis** বাংলা তথা ভারতে উদ্ভিদজগতের তথ্য সংগ্রহ করেছেন—ভারতীয়দের দান কতটুকু তার মধ্যে? ১৯১০ সালে যে কন্‌গ্রেস দেখতে যাই, সেটা ১৯০৫ বা ১৯০৬ সালের কন্‌গ্রেস থেকে অনেকটা সরে এসেছিল। ১৯০৫ সালে বারানসীর কন্‌গ্রেসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সভাপতিরূপে বঙ্গ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তোলেন। আর ১৯০৬ সালের কলকাতার কন্‌গ্রেসে দাদাভাই নৌরজী

ঘোষণা করেছিলেন Swaraj is our birthright! তারপর শুরু হলো 'স্বরাজ' শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ—যার পরিণাম হলো সুরতের কন্‌গ্রেসে জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি। হৈ-হুল্লোরের মধ্যে সভা ভাঙার পালা। তারপর কন্‌গ্রেস থেকে চরমপন্থী বা সেকালে যাদের বলা হতো এক্‌সট্রিমিস্ট—তাদের প্রবেশ হলো নিষেধ। তবুও সামান্য ছিদ্র কেটে জিতেন বাঁড়ুজ্যে প্রবেশ করে: সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর ভাবী ভারত-সফর কালে কন্‌গ্রেস থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন।

* * * *

১৯১১ সালের জানুয়ারি মাস। শেষদিকে কলকাতায় মাঘোৎসব। ষাট বৎসর পূর্বে এই উৎসবে যাঁরা কলকাতায় যেতেন তাঁরা দু'দিন ছুটি পেতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে, আমরা অর্থাভাবে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের চরণাশ্রয় পেলাম। বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দান করার প্রথম বলি হলো এখানকার বীজমন্ত্র—'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্'। ওটা বিশেষ হিন্দুগন্ধী বলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের অছিরা ঐ মন্ত্রটিকে বর্জন করতে বললেন। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তখন—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার মূলে কুঠারাঘাত করলেন; তারপর একদিন তাঁদেরই এক ভাইস-চ্যানসেলর ঘোষণা করলেন 'সাম্প্রদায়িক' ধর্মকে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করতে পারেন না। বন্ধ হলো মাঘোৎসবের ছুটি। ব্রাহ্মসমাজ গৃহের পত্তন হয়েছিল কলকাতায় ঐদিনে রামমোহন রায় কর্তৃক; দিনটাকে উৎসবের রূপদান করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সেই থেকে ব্রাহ্মরা ঐ দিনটিকে মেনে আসছেন। আমরা যে কলকাতায় যেতাম—তার ছিল জোড়া আকর্ষণ। এগারই মাঘের প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপাসনায় যোগদান, দ্বিতীয় হচ্ছে—সেইদিন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে—যাকে এখন 'মহর্ষি-ভবন' বলা হয়—সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শ্রবণ। মনে পড়ছে, সমাজ পাড়ায় বিনোদ রায়ের বাড়ির একতলায় মেঝেতে আমরা সবাই রাতে শুই—সারারাত শুনি ব্রাহ্মছেলেদের মন্দির সাজাবার কর্মব্যস্ততা। ভোর রাতে উঠেই স্নানাদি সেরে মন্দিরে স্থান করতে যেতে হতো; একটু বেলা হলে তিল ধারণের স্থান পাওয়া যেতো না। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপাসনায় সবাইকে মুগ্ধ করতো—তার কারণ তাঁর জীবনটাই ধর্ম। যে লোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.তে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন—সেকালে তার জীবনে উন্নতির কত পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে-পথ না ধরে মানব-সমাজ সেবায় আত্মবিসর্জন করলেন—

দারিদ্র্যকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন। তাই তাঁর উপাসনা উপদেশের মধ্য দিয়ে শ্রোতারা যা পেতো, তা ভাষায় প্রকাশ করা যেতো না। সেইটি পাবার জন্য (হলেও তা ক্ষণেকের জন্য) মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকতো। এখন জীবন নেই কোথাও, তাই ধর্মের দীপ সর্বত্রই প্রায় নির্বাপিত—তার স্থান অধিকার করেছে 'ধার্মিকতা' (religiosity) ধর্মের ও ধার্মিকতার ভান। সকল ধর্মেই আজ মানুষ ঈশ্বরকে প্রথম বলি করছে। যাক্ সে কথা। নারায়ণ শব্দের মধ্যে 'নর'-ই রয়েছে—সেই নর-কে অবহেলা করে কল্পিত 'নারায়ণ' পূজা বিফল হয়েছে।

মাঘোৎসবের পরদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হয়—'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'। তখনও রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি হয় নি, তবুও তাঁকে দেখবার জন্য সে কী ভিড়। কবি সে-সন্ধ্যায় কি বলেছিলেন তা ৬৪ বৎসর পরে স্মরণ করে লিখতে পারবো না। সে-সময়ে ধর্ম-গ্রন্থ খুব পড়ছি—বিশেষ করে খৃষ্টান সাধু-সাধ্বীদের জীবন ও বাণী খুবই আকর্ষণ করতো। মাদাম গেঁয়োর কথা তো পূর্বেই বলেছি। তাঁর আত্মজীবনী দুই খণ্ড পড়ি ও বোধ হয় আপ্‌হামের লেখা তাঁর জীবনীও পড়ি। এছাড়া সাধু ফ্রান্সিসের বাণী, সাধ্বী থেরেসার কথামৃত কী মন দিয়ে পড়তাম। ব্রাদার লরেন্স-এর বই কেনবার জন্য মাঘোৎসবের দিন দুপুর বেলায় যাই চৌরঙ্গীতে—বাইবেল সোসাইটিতে। ব্রাদার লরেন্স ছিলেন এক মঠের দীন সেবক। সেবার মধ্য দিয়ে তিনি ভগবানের স্পর্শ পেতেন। প্রসঙ্গত বলি বাংলায় এই বইয়ের অনুবাদ করেন হিমাংশুপ্রকাশ রায়।

শান্তিনিকেতনে সবাই ফিরেছেন সময় মতো। দৈনন্দিন কাজ চলছে। আশ্রমে এলেন আনন্দকুমারস্বামী; পূর্বে বলেছি এঁকে দেখেছিলাম কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে, ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন স্লাইডের ছবি দেখিয়েছিলেন। এবার এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য—বিশেষ করে তাঁর কবিতা বুঝতে। শান্তিনিকেতন দ্বিতলে দুজনে সারাদিন আলোচনা করতেন—কুমারস্বামী কবির কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করলেন প্রথম দিকে অজিতকুমারের সহায়তায়, পরে কবিই স্বয়ং তাঁকে অনুবাদে সহযোগিতা করেন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ষাট বৎসর পূর্বের মডার্ন রিভিউ ইংরেজি পত্রিকার ১৯১১ সালের মার্চ মাসে শিশুকাব্যের দুটি কবিতার অনুবাদ পাবেন দেখতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে এই সিংহলবাসী মনীষীর কী অভিমত তা যদি জানবার জন্য ঔৎসুক্য বোধ করেন, তবে তাঁর Art and Swadeshi গ্রন্থের মধ্যে Poems of Rabindranath Tagore প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে আদিব্রাহ্ম সমাজীয় মতধারায় উপাসনাদি হয়ে আসছিল। গত ১৯১০ সালের পৌষ উৎসবে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন প্রথম উদ্‌যাপিত হয়—রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের সময় যে যীশুখৃষ্টদিন পালিত হয়, তা বুঝি এন্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রভৃতি খৃষ্টানদের আশ্রমে যোগদানের ফল। তাঁরা ১৯১৪ সালে আসেন আশ্রমে। সুতরাং আশ্রমকে তার বিশেষ ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে আনার ইতিহাস এর আগের ঘটনা। বিশ্বের প্রথম প্রেমের ঠাকুর যীশুর কথা যেমন আশ্রম মন্দিরে আলোচিত হলো, তেমনি ১৯১১ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বাংলার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে কবি ভাষণ দান করেন। এখন থেকে স্থির হয় অতঃপর বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, গুরু নানক প্রভৃতিরও দিন আশ্রমে পালিত হবে। এ পর্যন্ত তা পালিত হয়েও আসছে। আজ মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও গীতার বিষয়ে আশ্রমে আলোচনা হওয়া উচিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবিচারের আলোকে। তবেই বিশ্বের সর্বধর্ম আলোচনা সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে তিনি কেবল গান, কবিতা ভাষণাদির মাধ্যমে আপন কথা প্রচার করতেন না, সুবিধা হলেই তাঁর নাটককে অভিনয়ে রূপ দিতেন। শিক্ষাশাস্ত্রী রূপে তিনি জানতেন অভিনয় ছাত্রদের মনোবিকাশ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সহায়ক। খেলায় যেমন নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলবার শিক্ষা হয়, নাট্যাভিনয়ে আর এক ধরনের সংযম শিক্ষার প্রয়োজন হয়। ১৯১১ সালের গোড়ায় কবির নূতন নাটক 'রাজা' প্রকাশিত হয়েছে। এবার তার অভিনয় হলো (৫ই চৈত্র ১৩১৭। ১৯শে মার্চ ১৯১১) সেই নাট্যঘর—যার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র আজ দেখা যায় না—এখন নূতন নাট্যঘর নির্মিত হয়েছে—থাক সে নাট্যঘরের কথা।

এই নাট্যাভিনয় দেখতে এখন থেকে কলকাতার কবিভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়—আজ আশ্রমে নৃত্যনাট্য বা জলসা দেখবার জন্য কত সহস্র লোক যে আসে তা বলা যায় না—University function এখন প্রায় public function হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে একদিন দাঁড়ি টানতে হবে। গ্রামের মধ্যে, জনতার কাছে তাঁরা যদি কবির নাট্যাভিনয় নিয়ে যেতে পারতেন, তবে বুঝতাম রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের কবি ও নাট্যকার রূপে পেশ করে তাঁরা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন। আইভরি টাওয়ারে বাস করা যাবে না, অচলায়তন ভাঙবার কথা কবিই বলেছিলেন,—আজ তাঁর উত্তরসাধকদের কাজ হবে কবিকে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির

পথ'-এর মাঝে বের করে এনে 'সবার সাথে রঙে রং মেশাতে হবে'।

মনে পড়ছে চৈত্রসংক্রান্তির সন্ধ্যায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কবির উপাসনা আর সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরে তাঁর কণ্ঠসংগীত—'জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে'। আজও সেই সুর কানে ধ্বনিত হচ্ছে। আজ আশ্রমের কাছে প্রান্তর আর নেই —স্থানে স্থানে জনবহুল বস্তির আকার ধারণ করেছে।

নূতন বৎসরে অধ্যাপকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠরা কবিকে তাঁর জীবনস্মৃতির খসড়া পাঠ ও কাব্য আলোচনার জন্য ধরে বসলেন। এসব ব্যাপারে আমার অগ্রণী হবার বয়স হয় নি—ক্ষিতিমোহনবাবু, সন্তোষবাবু, অজিতবাবুদেরই উৎসাহের ফলে কবি শান্তিনিকেতন দ্বিতলে মধ্যম-কক্ষে জমিয়ে বসে এইসব আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলেই বোধ হয় অজিতকুমার পরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত পুস্তকখানি লেখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কবির শরীর তখন খুবই খারাপ, অর্শরোগে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। দেখতাম বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বাইরে কোনো প্রকাশ নেই।

পঁচিশে বৈশাখ (১৯১১) কবির পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আশ্রমে যে উৎসব হয়, তাতে এবার কলকাতা থেকে বহু কবিভক্ত আসেন। এখানে দেখলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ও প্রবাসীর চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সত্যেন্দ্রনাথ অজিত-কুমারের সহপাঠী ছিলেন; আর ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। একটা ছবি দেখেছি এক ছাতার নীচে তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে পরেও দেখেছি, কথাবার্তা খুব কমই বলতেন, চারুবাবু বেশ বাকপটু ছিলেন।

এই জন্মোৎসবের পরদিন বোধ হয় সুকুমার রায় (তাতাবাবু—সত্যজিৎ রায়ের পিতা) তাঁর 'অদ্ভুত রামায়ণ' দলবল নিয়ে গান করে শোনান। তাতাবাবুর সেই চোখ গোলগোল করে গান—"রাবণ রাজায় মারো রাবণ রাজায় মারো—তারে উল্‌টো গাধায় তোল্‌, তার কানের কাছে, পিটতে থাকো, চোদ্দ হাজার ঢোল"—দোয়ারে ছিলেন অনেকে, পংক্তিগুলো সব মনে নেই। শান্তিনিকেতনে তখন সবটাতেই ছিল ঘরোয়া পরিবেশ, আজ তার পরিধি বড় হয়েছে, সমস্যাও বেড়ে চলেছে—সমাধান দূরেই সরে সরে যাচ্ছে। সে শান্তিনিকেতনকে কেউ খুঁজে পাবে না, পাওয়া সম্ভবও নয় এবং সেই অতীত যদি স্তব্ধ হয়ে থাকে তো, তবে সেটাকে বর্তমান বহন করতে পারতো কি? নদীতে বহতা আছে বলেই তাকে লোকে বলে স্রোতস্বিনী; আজ তার বহতা বন্ধ হয়ে গেলে সে হতো 'মজা নদীর সোঁতা'। ভাগ্যে মহাকাল অতীতকে ধরে রাখে না।

কবি একদিন বলেছিলেন 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' বাক্যটা

কাব্য নয়, কবিজীবনের অন্তর-কথা। জগৎকে ও জীবনকে দেখবার, জানবার ও বুঝবার আকূতি ছিল শেষ পর্যন্ত।

জন্মোৎসবের পর বিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেলে কবি চলে যান শিলাইদহে, আমিও চলে যাই গিরিধি—বিদ্যালয় খুলবে আষাঢ়ের গোড়ায়। ফিরে এসে শুনি কবি কোথায় বেড়াতে যাবেন ভারতের বাইরে। রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী ভাবছেন সিঙ্গাপুর যাবেন স্টীমারে বেড়াবার জন্য, এই খবর পেয়েই কবির মন মেতে উঠলো। কিন্তু নানা আর্থিক ও সাংসারিক কারণে সেটা ভেস্তে গেল। মনটা গেল দমে। মনের সেই অবস্থায় লিখলেন 'ডাকঘর'—ঘর থেকে বের হবার ডাক। নাটকটার লেখা শেষ করেন ৩১ ভাদ্র ১৩১৮। কিন্তু সেটা তখনও অভিনয়ের মতো হয়নি।

ডাকঘর নাটক লেখার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ডাকঘর খোলার সম্বন্ধ আছে কি? দেখা যাক, আজ শান্তিনিকেতনে ডাকঘর তো বিরাট বাড়ি—কত কর্মী কত কাজ কিন্তু পূর্বে? শান্তিনিকেতনে ডাকঘর ছিল না। ১৯২১ সালে ডাকঘরের সূত্রপাত। শান্তিনিকেতন অট্টালিকার একতলার পশ্চিমদিকে ছোট একটি ঘরে ডাকঘর বসলো—পোস্টমাস্টার হলেন নারায়ণ কাশীনাথ দেবল—শান্তিনিকেতনের ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন—পরীক্ষার ফল বের হয় নি—সেই মধ্যবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতন পরীক্ষাধীন ডাকঘরের ভার পেলেন। বোধহয় অবৈতনিক না—পাঁচ টাকা করে পেতেন। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন শান্তিনিকেতন বাড়ির দ্বিতলে। কবির শরীর খুব খারাপ—অর্শে কষ্ট পাচ্ছেন—কোথাও যাবার জন্য মন ব্যাকুল। নানা দৈবদুর্বিপাকে, অর্থাভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ মন বলছে বের হও, বের হও। সেই রকম মনের অবস্থায় লিখলেন ডাকঘর নাটকটি। এত তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করা স্মৃতিচারণের অঙ্গ হতে পারে না, তাই নিবৃত্ত হয়ে আগের কালে ডাকের ব্যবস্থা কি ছিল সেটাই বলি না কেন।

আমি তো আসি ১৯০৯ সালের শেষপাদে। তারপর ১৯১০ সালে শিক্ষকের কাজ পাই, ছেলেদের দেখাশোনা করতে হয়। বুধবার দিন মধ্যাহ্নে দেখি রান্নাঘরের সেবক যুধিষ্ঠির, ঘরে এসে বললে 'কার চিঠি আছে দিন, আমি বোলপুর যাচ্ছি।' অর্থাৎ বোলপুরের ডাকঘরে যুধিষ্ঠির পোস্ট করে দেবে। সকালে পিওন আসতো—সব ডাক তিনি সমর্পণ করতেন দপ্তরে—সেখান থেকে ছাত্রদের চিঠিপত্র যেতো গৃহাধ্যক্ষকের কাছে—তাঁরা চিঠি খুলে, পড়ে ছাত্রদের দিতেন; পত্র পাঠাবার সময়ে তারা কি লিখছে তা গৃহাধ্যক্ষ দেখে দিতেন। একটা মজার কথা মনে পড়ছে—তখনকার দিনে ছাত্রদের পালাক্রমে রান্নাঘরের

কাজকর্ম, অতিথিসেবা প্রভৃতি কাজ করতে হতো, তাদের বলা হতো ম্যানেজার। ছেলেটি বাড়িতে অভিভাবককে এই খবর দিয়ে পত্র দিয়েছে, 'আমি ম্যানেজার হয়েছি'। বাবা পত্র খুলে পড়ে লিখলেন, 'খুব ভাল কথা। তবে তো আর টাকা পাঠাতে হবে না'।

১৯১১ সালের শেষে—শান্তিনিকেতন পোস্টাপিস সরকারী অনুমোদন পেয়ে স্থাপিত হলো শান্তিনিকেতন বাড়ির উত্তরে—এই যেখানে কিছুকাল পূর্বে শিক্ষা-ভবনের দোকান ছিল—সেই বাড়িতে। প্রথম পোস্টমাস্টার এলেন যতীন বিশ্বাস—সপরিবারে। তিনি ছিলেন নদীয়া জেলার লোক। ম্যালেরিয়ায় ভোগেন—তাই বোধ হয় এখানে বদলি পেলেন। কিছুকাল পরে সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ খোলে—আমি হিসাব খুলি, চার আনা দিয়ে সেকালে শুরু করা যেতো।

বহু দশক পরে পোস্টাপিসের বাড়ি নির্মিত হলো—টিনের ছাদ—ছোট্ট দুটি ঘর। একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে টিনের চাল নিল উড়িয়ে। যাই হোক পরে নূতন বাড়ি হয় এবং নূতনতর বাড়ি হয় আরও পরে—আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। পোস্টাপিসে টেলিগ্রাফ বিভাগ আসে অনেক পরে, ১৯১৩ সালে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবর আসে বোলপুরের ডাকঘরে—কাহিনী অনেকেরই জানা—তখন তো সন্ধ্যা। কিন্তু পরদিন শুরু হলো অভিনন্দন—তারবার্তা, বোলপুর থেকে লোক আসছে আসছেই; তার কিছুকাল পরে ডাকঘরে টেলিগ্রাম এলো।

বলছিলাম কবির ডাকঘর লেখার কথা। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গাজন অনেকখানি হয়ে গেল। এ তো ইতিহাস নয়—এ স্মৃতিচারণ!

পূজার ছুটির পূর্বে ছাত্র-শিক্ষকে মিলে স্থির হলো 'শারদোৎসব' অভিনয় হবে। সেই পুরাতন নাট্যঘরে অভিনয়। কবি সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামলেন। খুব একটা কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটলো। কবি নিজের পার্ট ভুলে মঞ্চ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন—বালকদের গানের দলে ছিল সুরকুমার সেন—সে বুঝতে পারলো বের হয়ে যাচ্ছেন ভুল করে। সে হাত ধরে টেনে এনে বলে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, তোমার সঙ্গে এখনো কথা আছে।' এই ইঙ্গিতে প্রম্‌টার কবিকে তাঁর পার্ট ফিসফিসিয়ে বলে দেওয়াতে অভিনয় স্বাভাবিক ভাবেই চললো। সেকালে মঞ্চ সাজাতো ছেলেরাই। বাঙাল ছেলেরা সারা সকাল পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে আনে, কাশফুল সংগ্রহ করে আনে। নাট্যঘরের মঞ্চ অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। সীন প্রভৃতি এঁকে ছেলেমি করার মনোভাব শান্তিনিকেতনে

কোনোদিনই দেখা যায়নি।

এবারও কলকাতা থেকে অনেক কবি-ভক্ত আসেন। আর পাটনা থে এসেছিলেন পাটনা কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ইনি কবিকে ইংরেজি তর্জমার মাধ্যমে অবাঙালীর কাছে পরিচিত করবার চেষ্টা করছেন কিছুকাল থেকে। যদুনাথ ভোরের গাড়িতে এলেন খালি পায়ে। শোনা গেল বাঙ্কে উঠে শুয়েছিলেন পাটনায়, বোলপুরে নেমে দেখেন তাঁর পাদুকা কোনো নগ্নপদী অপহারক সজুত হয়ে নেমে গেছেন। কিন্তু আশ্রমে এসে কবির কাছ থেকে পুরস্কৃত হলেন—আশ্বিন (১৩১৮) সালের প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর নূতন নাটক 'অচলায়তন' অধ্যাপককে উৎসর্গ করেছেন।

শারদোৎসব অভিনয়ের পরদিন বিদ্যালয়ে পূজার কাল শুরু হলো। কবি কলকাতায় গেলেন। মন তখন বিদেশ যাবার জন্য ব্যাকুল—এখন আর সিঙ্গাপুর নয়, একেবারে য়ুরোপ পাড়ি দেবেন, দিনক্ষণ গাড়ি ঠিক। এদিকে আমার মাথায় ঢুকেছে আমেরিকার কলোরেডো স্টেটের ডেন্‌ভারে গিয়ে শিক্ষা-শিক্ষণ পড়বো। কিন্তু ঢাল নেই, তরবারি নেই নিধিরাম সর্দার! বিদেশে যাবার এই ইচ্ছা কেন হয়েছিল তা আজ বিশ্লেষণ করতে পারি। ন্যাশনাল কলেজের আমার সহপাঠী যতীন্দ্র শেঠ, হীরালাল রায়, নরেন সেন, বিজয় সরকার প্রথম দফায় ও দ্বিতীয় দফায় মালদহের বাণেশ্বর, রাজেন্দ্র, খগেন্দ্র প্রভৃতিও বিনয় সরকারের কৃপায় আমেরিকায় পড়তে গেল। শান্তিনিকেতনে কালীমোহন ঘোষ শিশুদের শিক্ষা-প্রণালী আয়ত্ত করবার অভিলাষ নিয়ে বিলাতে যাচ্ছেন, দেবল যাচ্ছেন, সোমেন্দ্র দেবশর্মা যাচ্ছেন। কালীমোহনদা অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করেছেন। পাথেয়টায় এককালীন মোটা টাকা লাগে; সেটা পেলেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে। এই একটি প্রতিষ্ঠান যা বহু বাঙালী ছাত্রকে বিলেতে যাবার সহায়তা দিয়ে আসছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র। আমার বিদেশযাত্রা হলো না—'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথঃ'। কিন্তু বিদেশে না গেলেও বিদেশকে জানবার সুযোগ পেয়েছি, আমার "বিশ্ববিদ্যালয়ে" বসে—সে বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার; যেখানে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কেটে যায়।

কবি বিদেশ যাবেন। কিন্তু তাঁর যে অনেক দায় ও দায়িত্ব। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ১২৯১ সাল (১৮৮৪ সেপ্টেম্বর) আশ্বিন মাস থেকে অর্থাৎ তাঁর তেইশ বৎসর বয়স থেকে। তারপর দীর্ঘ ২৮ বৎসর কেটে গেছে; এখন বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। বিদেশ যাচ্ছেন—অনেক ভাবনার মধ্যে আদি ব্রাহ্ম-

সমাজের কী হবে সেটাও ভাবছেন। সে সমাজ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিশেষ দায় বলে তাঁরা জানেন, সেইজন্য বাইরের লোকেরও এর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা হ্রাস পেয়ে এসেছে। কবি ভাবছেন এই স্থবির অচল সমাজকে নাড়া দিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলবেন। তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর উৎসাহ খুবই। আর তরুণ ব্রাহ্ম জ্ঞানেন্দ্রনাথের। আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের কাছে যে একমাত্র ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। পুরাতন আশ্রমের অর্থাৎ প্রাক্‌-ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পূর্বে যিনি এখানকার আশ্রমধারী ছিলেন সেই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার দিয়ে কবি পাঠালেন। এ ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একদল যুবক যারা কবির ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাছে আসছিলেন, কবি তাঁদেরও টানলেন। আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বা আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হয়ে আছে ১৮৪৬ সাল থেকে অর্থাৎ গত পঁচাত্তর বৎসর সেই পত্রিকাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন—কবিই এবার পত্রিকার সম্পাদক। এটাতে সুবিধা হলো আমার মত বালখিল্য লেখকদের ; অবশ্য জ্যেষ্ঠরাই ছিলেন আসল স্তম্ভ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে বোলপুর ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের মুখপত্র করার জন্য সমকালীন 'সাহিত্য' পত্রিকা খুবই নিন্দা করে।

কবি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার শিক্ষকদের উপরেই আছে ; এবার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আহ্বান করলেন 'আশ্রম সম্মিলনী' গড়বার জন্য। অধ্যাপনা ছাড়া ছাত্রসংক্রান্ত সকল প্রকার শাসনব্যবস্থা ছাত্রসভার উপর প্রদত্ত হলো। তাদেরই বিচারসভা, তাদেরই সাহিত্যসভা। কবি আরও প্রস্তাব দিলেন ছাত্র-শিক্ষক সভা করতে হবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছাত্রদের দাবী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যাপারে স্থানের জন্য। শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের স্বপ্ন হয়তো কেউ কেউ দেখছিলেন —বাস্তব তখন বহুদূরে। অথচ সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বললেন ছাত্র-শিক্ষক সম্মেলন গড়তে হবে। ষাট বৎসর পরে সর্বদেশে শিক্ষাশাস্ত্রী বা রাজনীতিকরা বলছেন, "তাই তো! ভাবীকালের নাগরিক এই মানবকদের আমাদের কাজের সঙ্গী-সাথী করতে হবে, নূতন দুনিয়ায় নূতন করে ভাবতে হবে এসব কথা।"

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে দরবার হলো—সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী এলেন ভারত সফরে। দিল্লী দরবারে ঘোষিত হলো বঙ্গচ্ছেদ রদ হবে —সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত

হবে। এই ঘটনায় বাংলাদেশের কংগ্রেসী মহল খুবই খুশি। কবি শিলাইদহ থেকে কলকাতায় এসেছেন—কনিষ্ঠা কন্যার সন্তান হয়েছে। সেখানে বোধ হয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী কবিকে ধরে বসলেন যে কবিকে একটি রাজপ্রশস্তি লিখে দিতে হবে। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী কলকাতায় আসছেন বড়দিনের সময়; কংগ্রেসেরও অধিবেশন সেবার কলকাতায় হচ্ছে।

কবিকে ফরমাইস! বহুকাল পূর্বে কোন্ এক সভায় গানের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে গেয়েছিলেন,

'আমায় বোলো ন গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা
মিছে কথা শুধু ছলনা।'

গান হয়ে গেলে সবাই বুঝলেন—কবি তাঁদের কী আঘাত দিয়ে গেলেন। এবারও তাই হলো—যে গানটি লিখে দিলেন, কংগ্রেসে গীত হলে বুদ্ধিমান কংগ্রেসী সমর্থকরা বুঝতে পারলেন, সেটি রাজস্তুতি নয়। সেই গানটি 'জনগণমন অধিনায়ক'। মাঘোৎসবে সেটি 'ব্রহ্মসংগীত' রূপেই গীত হয়—রাজস্তুতি করতে কবি যে অপারক—তা স্পষ্ট করেই তিনি জানিয়ে দিলেন রাজনীতিকদের। আজ সেই গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।

অচিরেই কবি বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। তার কারণ অবশ্য তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। সককারের চোখে অবাঞ্ছিত অনেক শিক্ষকদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। খুলনায় ছিল এক জাতীয় বিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট নীতির অভিঘাতে বাংলাদেশের শহরে পল্লীতে 'জাতীয় বিদ্যালয়' গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো। গজিয়ে ওঠে গিরিডিতেও। আমিও সেখানে পড়েছিলাম। খুলনার সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন—'হুংকার' কাব্য লিখে রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় মাসের জেল হয়। জেল থেকে বের হয়ে এসে দেখেন স্কুল উঠে গেছে—কবি সেই হীরালাল সেনকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক পদ দিয়ে সেখানে আনেন; এসব কথা তো পূর্বেই বলেছি। পুলিস থেকে চাপ পড়তে লাগলো তাকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। অনেক লেখালেখি হয়—কিন্তু শেষকালে পরাভব মেনে হীরালালকে বিদায় করতে হয়।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষণা হয়। কিন্তু তা কাজে পরিণত হয় ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গ-আসাম গভর্নমেন্ট শান্তিনিকেতনের উপর শেষ কামড় দিলেন—ঘোষণা করলেন, ঐ প্রতিষ্ঠান

altogether unsuitable for the education of Government servants। মনে পড়ছে দলে দলে ছাত্ররা চোখের জল ফেলতে ফেলতে আশ্রম ত্যাগ করে গেল। ম্যারিয়ন ফেল্‌প্‌স নামে নিউইয়র্কের জনৈক ব্যবহারজীবী এই সময়ে ভারত সফরে এসেছিলেন—ছাত্রেরা যখন আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সেই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে ছাত্রদের বিদ্যালয়কে এভাবে ভালবাসতে তিনি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেননি।

কালীমোহন ঘোষের উপর পুলিসের চোখ ছিল। তাঁর বাড়ি ছিল চাঁদপুরের কাছে এক গ্রামে—পড়তেন ঢাকা কলেজে; তখন থেকে অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্য—রুদ্রপন্থীদের সঙ্গেও যোগ ছিল। সেসব কথা পুলিসের অজ্ঞাত ছিল না বোধ হয়। কালীমোহন তাঁর কপালে কি আছে আন্দাজ করেই বিলাত চলে গেলেন। নেপালচন্দ্র রায়ও এক নামকরা 'চিহ্নিত' পুরুষ—উত্তর প্রদেশের সরকার চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে তাঁকে এলাহাবাদ-ছাড়া করেন, পূর্বেই সেকথা বলেছি। আমিও বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত, তারপর ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র ছিলাম—সরকারের কোপদৃষ্টি না পড়লেও চোখ ছিল। এ ছাড়া শিক্ষকদের মধ্যে ঢাকা-বরিশালের লোক ছিলেন অনেক ক'জন—ছাত্রদের মধ্যেও তাদের সংখ্যা বেশি। এইসব কারণে সরকার ঘোষণা করলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় সরকারী কর্মচারী বা ভৃত্যদের (servant) পুত্রদের পক্ষে অধ্যয়নের অনুকূল স্থান নয়। ছাত্রসংখ্যা বেশ কমে গেল। ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে, তার উপর শিক্ষকদের মধ্যে থেকে বিধুশেখর শাস্ত্রীও স্বগ্রাম মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে চলে যাওয়াতে (১৩১৮ চৈত্র) কবি খুবই বিব্রত মনে করছেন। বিধুশেখরের মতো পণ্ডিতের অভাব কে পূরণ করবে? কবির বিলাত যেতেই হবে—অর্শের চিকিৎসা একান্ত হয়ে উঠেছে। স্থির হয়েছে ১৯১২ সালের ১৯ মার্চ (৬ চৈত্র ১৩১৮) কলকাতার বন্দর থেকে কবি যাত্রা করবেন—একাই। মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক চিসিৎসক ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র যাচ্ছেন—কবি তাঁকে সঙ্গীরূপে পাবেন এই ভরসা।

আমরা জানি ভোরে কবি চলে গেছেন; এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল, গতরাত্রে আত্মীয়বন্ধুদের নিমন্ত্রণ রক্ষার ফলে সকালে আর মাথা তুলে বসতে পারলেন না—তাঁর এবারেরও যাত্রা পণ্ড হয়ে গেল। শুনলাম কবি শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে চলে গেছেন। বর্ষশেষের দিন হঠাৎ শুনি মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে—এইভাবে ঘণ্টা আর তো কেউ বাজায় না—মন্দিরে উপাসনায় আসবার আহ্বান কবি প্রতি বুধবারে স্বয়ং করতেন। মন্দিরে গিয়ে দেখি হাঁ—কবিই

এসেছেন। পরদিন নববর্ষ (১৩১৯)। কবিই উপাসনা করলেন। বিদ্যালয় বন্ধ হতে দেরি আছে—কবি তাই আশ্রমেই থেকে গেলেন কয়েক দিন। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে এবারও নাটক অভিনয় হলো—'রাজা ও রানী'র অভিনয় ইতিপূর্বে বা ইতঃপরেও বোধ হয় হয়নি আশ্রমে। যথারীতি শিক্ষক-ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন—ক্ষিতিমোহনবাবু—দেবদত্ত, অজিতকুমার—বিক্রমদেব, সন্তোষ মজুমদার—কুমার সেন, সুশীল চক্রবর্তী—ইলা—আর পার্ট কে কি নিয়েছিলেন মনে নেই। রবীন্দ্রনাথ দর্শকদের মধ্যে একটি পাশে চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন।

শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিয়ে কবি কলকাতায় ক'দিন থেকেই চলে গেলেন শিলাইদহ—কলকাতার জনতা ভালো লাগছে না। শিলাইদহে জন্মদিন পালিত হলো—সেদিন ঝড় জল তুফানের আবহাওয়া ছুটেছে। তারপর সেখান থেকে ৭ জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় এসে ১০ জ্যৈষ্ঠ বোম্বাই যাত্রা করলেন—সেখানে ১৪ জ্যৈষ্ঠ স্টীমারে উঠবেন—সঙ্গে যচ্ছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, আর ত্রিপুরার সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা।

১৯১০ সালের সাতই পৌষ। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ইতিহাসে ও রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা যা পূর্বে বা পরে কখনো ঘটেনি—সেটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক শিক্ষকের রবীন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯০৮ সালে বি. এ. পাস করে বিদ্যালয়ের কর্মে লিপ্ত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা অঘোরনাথ বহুকাল পূর্বে মহর্ষির সময়ে আশ্রমের কাজকর্ম দেখতেন—ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল যৌবনে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই সময়ে সেকালের জনশূন্য আশ্রমে বাস করতেন। পড়তেন বোলপুর স্কুলে (তখন তা ছিল বাঁধগড়ার দিকে)। সেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখন ব্রাহ্ম হলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে বা ইতঃপরে কখনো কাকেও 'দীক্ষা' দেননি। অথচ তাঁদের পরিবারে কেউ বিবাহেচ্ছু হলে মহর্ষির ব্যবস্থায় ভাবী জামাতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করতেই হতো—এ সব অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের আহ্বানে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মই ছিলেন।

সেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহ হবে ঢাকায়। বধূর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঢাকার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা। আমাকে সে বিবাহে যেতেই হবে—কারণ বধূ আমাদের পরিচিত। এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের বাড়ি গিয়ে বৌ পছন্দ

করে বিবাহ স্থির করে আসেন। স্থির হলো পূজার ছুটিতে বিবাহ হবে, ঢাকায় এমন সময়ে পূর্ববঙ্গ সফরের সুবিধাও এসে গেল। তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রসংখ্যাই বেশি। শিক্ষকদের মধ্যেও তাঁরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। আমি যখন শিক্ষকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠরূপে কাজ শুরু করি ১৯১০ সালের জুন মাসে, তখন যাঁদের দেখেছিলাম তাঁদের একজনও আজ জীবিত নেই। সেকালে শিক্ষকদের ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রাবাসে বাস করতে হতো—গুরুপল্লী, এনড্রুজ পল্লী, পূর্বপল্লী প্রভৃতির বস্তিনির্মাণ কারও কল্পনাতেও ছিল না। তখন ছাত্রদের সুখ-দুঃখ ও শিক্ষকদের সুখ-দুঃখের ভেদ ছিল না। আনন্দোৎসবে ছাত্র-শিক্ষক সবাই সমভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তারপর যখন 'ছপ্পর ফোড়কে' দিল্লী থেকে ধনের বর্ষণ শুরু হলো, সেদিন থেকে আশ্রমের বর্তমান বিকারগ্রস্ত রূপ নিতে শুরু করে।

পুজোর ছুটিতে পূর্ববঙ্গের ছাত্ররা দেশে ফিরবে—তাদের সঙ্গে করে কে নিয়ে যাবে? ক্ষিতিমোহন সেন হলেন দলের অভিভাবক, আমি হলাম তার 'পেটেল'। ফাইফরমাস খাটা, ছোটাছুটির কাজ করবার ভার স্বভাবতই পড়লো আমার উপর। বয়সটা নবীন, তাই উৎসাহটাও ছিল প্রচণ্ড।

পূর্বে বলেছি, তখন পূর্ববঙ্গের ছাত্রসংখ্যাই আশ্রমে ছিল বেশি—ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, সিলেট—এমন কি কাছাড় আসাম থেকেও ছাত্র আসতো। অভিভাবকদের পক্ষে এখানে এসে তাদের ছেলেদের নিয়ে যেতে হলে অনেক খরচ ও হয়রানি। তাই স্থির হয়, ট্রেনের একটা পুরো বগি রিজার্ভ করে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। তাই হলো। গাড়ি এলো বোলপুর স্টেশনে। প্রায় একশ ছেলে নিয়ে উঠলাম। খাওয়া-দাওয়া সঙ্গে নিলাম—রান্নাঘর থেকে লুচি-তরকারী করে দেন শরৎবাবু। এই একটি প্রাতঃ-স্মরণীয় চরিত্র। শরৎবাবু অঙ্কের শিক্ষক হলেও ইতিহাসে গভীর অনুরাগ ছিল—তাঁর 'শিখগুরু ও শিখজাতি'র ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং শিবাজী ও মারাঠা জাতি সম্বন্ধে লেখেন পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। শরৎবাবু রান্নাঘরে তদারকী করতেন; তাঁরই ব্যবস্থায় ছেলেদের জন্য পথের খাওয়ার মতো লুচি-তরকারী করিয়ে নেওয়া হলো। ট্রেন ছাড়বে সকালে—তাই রাতে উঠে খাবার তৈরি করান, বাসি খাবে ছেলেরা? তা কি হয়? কী দরদ ছিল ছেলেদের সেবায়! হবে না? বরিশালের কালীশ পণ্ডিতের চেলা যে এঁরা!

বোলপুরে চাপলাম আমাদের রিজার্ভ গাড়িতে। যত সহজ করে লিখছি ব্যাপারটা আদৌ অত সহজ নয়—কারণ দলে আছে ছয় বৎসর থেকে যোল

বৎসরের ছাত্র। তাদের সামলাতে হয় আমাকেই—ক্ষিতিমোহনবাবু তো ঠাকুরদা, সব আমার উপর ছেড়েই নিশ্চিন্ত।

বোলপুরে সকালের ট্রেনে আমাদের বগিটা দিল জুড়ে। থামতে থামতে আমাদের গাড়ি চলেছে—অবশ্য সেকালে এতো স্টেশন ছিল না, আর চলতে চলতে যেখানে-সেখানে যাত্রীদের ইচ্ছামতো থামতো না। ব্যাণ্ডেল পৌছোতেই দুপুর গেল পেরিয়ে। আমাদের 'বগি' কেটে দিল। আবার জুড়ে নিল ব্যাণ্ডেল নৈহাটির একটা ট্রেনে। বহু বৎসর পরে গঙ্গাসেতু পার হলাম। আবার বগি কাটলো নৈহাটিতে—ঠেলে নিয়ে গেল সাইডিঙে। তারপর বিকেল যখন সন্ধ্যার মুখে, তখন গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জারে জুড়ে দিল। নিশ্চিন্ত হলাম—একেবারে পরদিন ভোরে নামবো গোয়ালন্দে। ঠাকুরদার গল্প শুনতে শুনতে রাণাঘাটে এসে গেল ট্রেন। নামলাম প্ল্যাটফর্মে। পুরাতন স্মৃতি—জন্মভূমি। ভাবছি কোনো পরিচিত মুখ কি দেখতে পাবো? কতোদিন সন্ধ্যায় এসেছি স্টেশনে দার্জিলিঙ মেল, চিটাগং মেল দেখবার জন্য। দার্জিলিঙের গাড়ি যেতে দেখেছি—ফার্স্ট ক্লাস বোঝাই লালমুখো সাহেব—তাদের দেখে কী ভয়ই করতো। সহপাঠী বন্ধুদের কথা মনে পড়লো—সদা, শিবু, সখা, বঙ্কু কতো মুখ দেখতে পেলাম মনের চোখে—যারা এ জগতে নেই। বহুকাল হলো কেউ গিয়েছে কৈশোরে, কেউ গিয়েছে যৌবনে, কেউবা গেছে বয়সকালে। প্ল্যাটফর্মে কাউকে দেখলাম না। হঠাৎ কানে এলো একটা কুলি আরেকজনকে বলছে—'আরে—ই বগিমে গ্যাস নেহি হ্যায়।' সে যুগে গাড়িতে গ্যাসের আলোই ছিল, পুরনো সময়ের রেড়ির তেলের আলো সরে গিয়ে গ্যাস হয়েছে। 'গ্যাস নেহি হ্যায়' কানে যেতেই চমকে উঠলাম। সারারাত ট্রেন চলবে, প্রায় একশো ছেলে—কয়েকটা খুবই ছোট, আলো না থাকলেও তো মুশকিল। আমি স্টেশনের এক বাবুকে একথা বললাম; তিনি স্রেফ বলে দিলেন—'আমি জানি না, স্টেশন মাস্টারের কাছে যান।' বুঝলাম, কোনোরূপ সহায়তা করা তাঁর কর্তব্য নয়। গেলাম স্টেশন মাস্টারের ঘরে। তখন সেখানে এক ফিরিঙ্গি স্টেশন মাস্টার। বললাম, 'স্কুল চিলড্রেন নিয়ে যাচ্ছি, গাড়িতে গ্যাস নেই।' শোনামাত্রই সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়ি থামাবার হুকুম দিলেন। গাড়ি নড়তে আরম্ভ করেছিল—আমি প্ল্যাটফর্মে। গাড়ি থামলো। স্টেশনের লোক হকচকিয়ে গেল ট্রেন ছেড়েই আবার থামতে দেখে। সাহেবের তাগাদে পাশের গাড়িগুলো থেকে কি সব ব্যবস্থা করা হল, আমাদের বগিতে গ্যাস এলো—জ্বললো আলো। সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

জন্মাবধি ছিলাম এই শহরে পনেরো বৎসর, কিন্তু শহরের উত্তরে কোথাও যাইনি কখনো। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কোথা থেকে সে সব ছবি মনের মধ্যে আসে—জানি না। তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি। শীতকালে পরীক্ষার পর আমি ও আমার এক বন্ধু বিনোদগোপাল চূর্ণী নদীর খেয়া পার হয়ে চললাম সোজা উত্তরে। তখন সেতু তৈরী হয়নি। নূতন রেলপথ তৈরী হচ্ছে, দূরে দিক্‌চক্রবালে দেখা যাচ্ছে উঁচু লাইন; স্থির হলো সেখানেই যাবো। মনে হচ্ছে এখনি পৌঁছে যাবো। কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। অবশেষে উঠলাম রেল-পথের উপর। শীতের মধ্যাহ্ন—চারদিকে মাঠে মাঠে ধান কাটা চলছে। সুন্দর দৃশ্য। চূর্ণী নদীর উপর নূতন রেলসেতু হয়েছে। এই রেলপথ দিয়ে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া যাবে। আমরা দুই বন্ধু মনের আনন্দে চলেছি, সামনে রেলসেতু। দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির! কাঠের স্লিপারগুলোর মধ্যে ফাঁক যে! 'ও বিনোদ, পার হবো কি করে?' নিচের দিকে তাকাই—নদীর অথৈ জল, নৌকা চলছে। ভীষণ ভয়—পা চলে না। শেষকালে বিনোদ আমার একটা হাত ধরে বলে—'নিচের দিকে তাকাবি নে, সামনে তাকিয়ে চল্।' পার হলাম—ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বোলপুরে এইরকম একটা কাহিনী চলতি ছিল জগদানন্দবাবু সম্বন্ধে। জগদানন্দ কৃষ্ণনগরের লোক। পূজোর ছুটির পর আসছেন বোলপুর—নৈহাটি ব্যাণ্ডেল হয়ে রাতের গাড়িতে। ভুল করে নেমে পড়েন ভেদিয়াতে। যখন ভুলটা টের পেলেন তখন ট্রেন ডিস্‌টেন্ট সিগ্‌নেল পেরিয়ে গেছে। কী আর করেন! সারারাত স্টেশনে বসে থেকে ভোরে হেঁটে চলেছেন—সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল না কিছুই। পথে একটা রেলসেতু, যাতে স্লিপারের মধ্যে ফাঁক-ফাঁক থাকায় হাঁ-করা নিচটা দেখে তাঁর কৃষ্ণনগরী ম্যালেরিয়া-পিলে চমকে গেল। নিচে দিয়ে নেমে যেতেও সাহস হচ্ছে না—সেখানে জল যাচ্ছে, কতোখানি জল কে জানে। তারপর পিছল তো নিশ্চয়ই। অগত্যা পুলের ধারে বসে পড়লেন। এমন সময় এক বুড়ী যাচ্ছে হাটে। এক বাবুকে বসে থাকতে দেখে সে অবাক্। জগদানন্দবাবু কারণ বললেন, বুড়ী বললে—'ভয় কি—আমার হাত ধরো।' তারপর ঐ জোয়ান মানুষটার হাত ধরে বুড়ী সেতু পার করে দিল। জগদানন্দবাবু তাঁর দুর্বলতার কথা নিজেই ফাঁস করে দেন বলে আমরা জানতে পারি। আমার দশাও সেইরকম হয়েছিল। ভাগ্যে বন্ধু ছিল। সন্ধ্যের মুখে বাড়ি এসে দেখি বাবার খুব জ্বর, হিক্কা হচ্ছে—সারাদিন বাড়ি ছিলাম না বলে মার কাছে খেলাম বকুনি। বাবার মাথার কাছে বসলাম। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ। সে যুগে ভদ্রদের ধারণা ছিল বন্ধঘর স্বাস্থ্যের পক্ষে

অনুকূল, খোলা হাওয়া ঘরে ঢুকতে দিলেই সর্বনাশ—সর্দি-কাশি, ব্রংকাইটিস, নিমোনিয়া হবে। সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এমনি মূঢ় ছিলেন। এখন ভাবলে দুঃখ হয়। তাছাড়া অন্ধকার ঘর; অসুস্থ রোগীর শ্বাসরোধক গন্ধ ঘরটায় আটকা পড়েছে—সেটা প্রসন্ন মনে সহ্য করাও শক্ত। এইজন্য এখন অসুস্থ হলে কাউকে কাছে বসে সেবা করতে বলি না। মানুষ সেবা করে ধর্মের জন্য আর অর্থের জন্য। নিষ্কাম সেবা করে মা ও পত্নী।

ট্রেন চলছে। শহর পেরিয়ে যেতেই রাতের অন্ধকার নেমে এলো—কিছু দেখা যাচ্ছে না। আড়ংঘাটা, বগুলা, মাঝদিয়া, বানপুর পার হলাম। আজ যাবার পথ রুদ্ধ—গেদে স্টেশন থেকে পাকিস্তান। কাল্পনিক রেখা এঁকে দিলেন র‍্যাডক্লিফ সাহেব বিলাতে বসে। হয়ে গেল দুটো রাজ্য—মেনে নিল মূঢ় ভারতীয়! ইংরেজ ভারত ত্যাগ করলো—শুধু ত্যাগ করলো না, যাবার আগে মরণকামড় দিয়ে গেল। বাঙালীকে দুটো জাতে বিভক্ত করে গেল—তাও আবার ধর্মের জিগির তুলে। পাঞ্জাবকে টুকরো টুকরো করে গেল। ভারতের বুদ্ধি ও শক্তিকে (brain and brawn) ভেঙে দিয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন এসব কথা কারও মনে আসেনি; পূর্ববঙ্গ আসাম পৃথক প্রদেশ ছিল, প্রাদেশিক বা ভাষাভিত্তিক ইতরামি তখন ভদ্রসমাজে কল্পনাতীত। আজ প্রতিবেশীকে ঘৃণা করা, অবিশ্বাস করা হচ্ছে উভয় রাষ্ট্রের জনতার ধর্মবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

গাড়ি থামতে-থামতে চলছে। ভোরবেলায় গোয়ালন্দে পৌঁছলাম। এই দলের মধ্যে আমারই কোনো জ্ঞান ছিল না এতদঞ্চল সম্বন্ধে। প্রথমেই চোখে পড়লো গোয়ালন্দ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নেই। দূরে বালির উপর একটা বোর্ডে লেখা 'গোয়ালন্দ ঘাট'। ভাবলাম এই নাকি বাঙাল দেশের স্টেশন! শুনলাম অনেক টাকা ব্যয় করে পাথর দিয়ে নদীর তীর বাঁধা হয়, স্টেশনও নির্মিত হয়। তারপর ১৮৭৫ সালের ভাদ্র মাসের বন্যায় বাঁধ ভেসে গেল, স্টেশন ভেঙে পদ্মা গহ্বরে টেনে নিল—এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত জলগর্ভে চলে যায়। সেই থেকে এখানে আর পাকা স্টেশন করার চেষ্টা হয়নি। গোয়ালন্দ নামের সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত সেই ছোটবেলা থেকে। শহরে ঝুড়ি ঝুড়ি ইলিশ মাছ আসছে কোথা থেকে? গোয়ালন্দ থেকে। দু'চার পয়সাতেই মাছ পাওয়া যেতো—তিন-চার আনায় তো বিরাট মাছ। তখন মাছ বাজারে ওজনে বিক্রী হতো না।...সেই 'ইলিশ মাছের গোয়ালন্দে' এলে পৌঁছোলাম।

এখান থেকে স্টীমারে চাপতে হবে। ঘাটে অনেক স্টীমার চোঙ দিয়ে ধোঁয়া

ছাড়ছে। বড় বড় ফ্লাট নৌকা পাট বোঝাই—এদের বলে 'গাদা বোট', স্টীমারে টেনে আনে। মাঝে মাঝে ভোঁ-শব্দ হতেই সবাই সচকিত হয়ে ওঠে, ক্ষিতিমোহনবাবু আশ্বাস দেন। গোয়ালন্দে একটা হোটেলে আমরা সবাই খেলাম। জীবনে এই প্রথম হোটেলে খাওয়া। পরে দেশে-বিদেশে অনেক ছোট-বড় হোটেলে খেয়েছি, কিন্তু জীবনের এই প্রথম অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। মাটির মেঝে, দরমার বেড়া, টিনের ছাদ। ভিজে ছেঁড়া ছেঁড়া কুশাসন—বসার চেয়ে উবু হয়ে খাওয়াই ভালো। হোটেলের 'বামুন' যারা রান্না করে, তারাই পরিবেশক। গলায় পৈতা মালার মত ঝুলছে, হাঁটুর উপর কাপড়, আদুল গা, কাঁধে আধময়লা ভিজে গামছা। ভাজি তরকারী হাত দিয়ে থপ্ থপ্ করে দিয়ে যায়। সান্‌কীতে টাটকা ইলিশ মাছ পেলে সব অসুবিধাই মেনে নেওয়া যায়। গল্প শুনতাম—গোয়ালন্দে ট্রেন থামলেই হোটেলের লোকেরা এসে চেঁচায় 'আসুন বাবু আসুন, দু আনায় ভাত-মাছ-তরকারী, পাকা পায়খানা পাবেন। শেষোক্তটা যারা বলতো বুঝতে হবে তাদের হোটেল উঁচুদরের।

ভোঁ ভোঁ শব্দ হতেই শুধুই—'এই স্টীমার নাকি?' সকলেই হেসে ওঠে আমার উদ্বেগ দেখে, এমন কি ছাত্ররাও। ভোঁ শব্দ নিয়ে হোটেলের একটা গল্প আছে। হোটেলে লোকে খেতে বসেছে, ধূর্ত মালিক দেখছেন যাত্রীরা খুব খাচ্ছে। মাছ চাইছে বার বার—হঠাৎ একটা ভোঁ হতেই বলে উঠলেন, "আরে কানাই, নারায়ণগঞ্জ স্টীমার ভোঁ দিচ্ছে নাকি দেখ তো!" আর কে খায় মাছ ভাজা? তুড়তুড়িয়ে উঠে আঁচিয়ে—পয়সা দিয়ে দে ছুট। কানাই বলে, "কর্তা, ওটা তো চাঁদপুরের ভো।" ততক্ষণে লোকগুলো ছুটেছে নারায়ণগঞ্জের স্টীমারের দিকে—ওটা ছাড়তে এখনও আধঘণ্টা তো বটেই। তখন ঘড়ি তো আজকের মতো এতো সুলভ হয়নি, আর হাত-ঘড়ি তো অজ্ঞাত। তাই ট্রেনের হুইসেল ও স্টীমারের ভোঁ দিয়ে সময় নিরূপিত হতো।

হোটেল থেকে বেরোলাম। ভাঙা পাড় দিয়ে নামছি, ভিজে মাটি, কাদার উপর তক্তা পাতা। ক্রমে এসে গেলাম নদীর ধারে; সেখান থেকে স্টীমার পর্যন্ত তক্তা পাতা, দু'পাশে বাঁশ ধরে আছে খালাসিরা। সন্তর্পণে পার হলাম। কিন্তু ছেলেগুলো বেশ চলে গেল—ভয়ডর নেই এতোটুকু। বুঝলাম পূর্ববঙ্গের ছেলে এরা—জলবৃষ্টি, ঝড়ঝাপটার সঙ্গে এদের বড়ই পীরিত। তাই এমন নির্ভয়। বিরাট স্টীমার, মনে হলো ইঞ্জিনটা ফুঁসছে—কী শব্দ! এর আগে স্টীমারে চড়েছি—শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে থাকার সময়। আমি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাঝখানে জায়গা করে নিলাম।

পদ্মার মধ্য দিয়ে চলেছে স্টীমার। কী অপরূপ দৃশ্য! নদীমাতৃকা বঙ্গভূমি। এই দেশের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি', এই দেশকেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 'সুজলা সুফলা', আর জীবনানন্দ একেই বলেছেন 'রূপসী বাংলা', এই তো নজরুলের বাংলাদেশ। স্টীমার থামছে ছোট ছোট বন্দরে। নৌকো করে লোকজন আসে। দূরে দেখা যায় ঘাট—নৌকো বজরা বাঁধা। মনে আছে পানসি করে লোক এলো পাতক্ষীর দুধ প্রভৃতি বিক্রী করতে, খাঁটি দুধের পাতক্ষীর খেলাম সে সময়। 'লৌহজঙ্গ' বেশ বড় বন্দর, পরে নাম হয় তারপাশা। ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন—"এই লৌহজঙ্গের কাছে এক গ্রামে কবি সরোজিনী নাইডুর পিতা অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান; তবে রাক্ষুসে পদ্মার ভাঙনে সে গ্রাম এখন প্রায় লুপ্ত।" কতো ঘাট দেখতে দেখতে চলেছি, পাট বোঝাই নৌকো চলেছে বড় বন্দরে দেবার জন্যে। স্টীমার থেকে দেখা গেল 'রামবাড়ির মঠ'। শুনলাম বিক্রমপুরের বার-ভূঞার অন্যতম কেদার রায় তাঁর মায়ের চিতার উপর এই মন্দির স্থাপন করেন। অনেক দূর থেকেই ওটা দেখা যাচ্ছিল। পরেও পূর্ববঙ্গ বেড়াতে যাই, তখন সে সব পদ্মা গ্রাস করেছে, এখন ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই।

ছেলের দল কিছু হালকা হয়েছিল। গোয়ালন্দে অভিভাবকরা এসে তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। একটা বড় দল চলে গেল চাঁদপুরে। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছোলে অবশিষ্টরা গেল। আমরা চললাম সোনারঙ—ক্ষিতিমোহনবাবুর গ্রাম, এককালে বৈদ্যদের গণ্ডগ্রাম ছিল। সোনারঙ মীরকাদিমের খালের শাখার উপর গ্রাম, তবে ডাকঘর, তার-অফিস, হাইস্কুলও আছে। খালের মধ্য দিয়ে চলেছি নৌকো করে। জিওল গাছ ফুলে ভরা—জলের উপর এসে পড়েছে। সে দৃশ্য এখনো দেখতে পাচ্ছি, ছইহীন নৌকো, এক মাঝি লগি ঠেলে নিয়ে চলেছে। পরে কুশীয়ারা, বরাক নদীতে সারারাত নৌকোয় চড়ে চলেছি।

ক্ষিতিমোহনবাবুদের বাড়িকে বলতো বিশারদ বাড়ি। এঁর পিতা কাশীতে থাকতেন, তিনি কবিরাজী বিদ্যার উপর ভালো হোমিওপ্যাথও ছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর শিক্ষাদীক্ষা সেখানেই হয়েছিল; পিতার কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি কবিরাজীশাস্ত্রে শিক্ষা পান। দেশের বাড়িতে তখন ছিলেন তাঁর ভগ্নী, ভাগ্নেরা আর এক পুরাতন ভৃত্য মংগু। বৃদ্ধ মংগুকে পরে শান্তিনিকেতনে দেখতাম। যে বিক্রমপুর বর্ষার সময়ে জলে ভরে যায়, শুনলাম ডোঙায় করে ছেলেরা স্কুলে যায়—এমন কি একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতেও জল পার হতে হয়, তাই ঘরের পোঁতা বেশ উঁচু। ছাদ টিনেরই বেশি, বিলাত থেকে করোগেট টিন

আসতো তখন, কিন্তু পূর্বে ছনে ছাওয়া হতো। তখন ভারতে করগেট্ টিন তৈরী হতো না—জামসেদপুরের কারখানা সবে শুরু।

সোনারঙের কাছে আউটশাহী গ্রাম। সেখানে আমাদের ছাত্র মণি গুপ্তের বাড়ি। তার জ্যেঠামশায় রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ি গেলাম। বেশ বড় বাড়ি; পাকা বাড়ি। বিক্রমপুরের ভাস্কর্যের নমুনা দেখলাম এঁদের বাড়িতে। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে পড়বার সময়ে ভারতের পুরাতন স্থাপত্য ভাস্কর্যের নমুনা দেখবার জন্য মাঝে মাঝে মুজিয়ামে যেতাম। কানিংহামের একটা বই দেখে ভাস্কর্যে বুদ্ধদেবের জীবনেতিহাস যেভাবে খোদিত হয়েছিল, তা মিলিয়ে দেখেছিলাম। আউটশাহীর এই ছোট সংগ্রহালয়েও অনেক প্রাচীন নমুনা—বৌদ্ধতন্ত্রযুগের মূর্তিই বেশি। সেসব এখন কোথায় জানিনে। কাছের গ্রামের কিশোররা শুনেছে আমি শান্তিনিকেতনে পড়াই। সেখানে 'বাল্যসমিতি' বলে একটা ক্লাব ছিল, তাদের অনুরোধে সেখানে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ভাষণ দিলাম। আমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম 'পাবলিক' ভাষণ। এখানে ভাষণের বিষয় ছিল মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস—বোটা, লেয়ার্ড, রলিনসন, শাঁপোলেন প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকরা কীভাবে উদ্ধার করেছিলেন সে সম্বন্ধে। মেসোপটিমিয়া, মিশরের ইতিহাস সেদিন রূপকথার মতো মনে হতো।

এখানে ভাষণ দেবার পূর্বে মনে পড়ছে, গিরিডির বার লাইব্রেরীতে Education and crime সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। কোলকাতার সেন্ট্রাল কলেজের (বর্তমান নাম ক্ষুদিরাম বসু কলেজ) অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু সেদিন সভাপতি। বার-এর অনেক এবং বাইরেরও কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বড়দের আসবার কারণ আমার প্রতি স্নেহ; তাঁদের বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত ছাত্র প্রবন্ধ পড়ছে, তাও আবার ইংরেজিতে এবং বিষয়টাও গুরুতর। আমি আমেরিকার Horace W. Mann-এর বিরাট রিপোর্ট পড়ে প্রবন্ধটা লিখি। বিংশ শতকের গোড়াতেও লোকের ধারণা ছিল শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে crime বা অপরাধপ্রবণতা কমে—তার প্রমাণ প্রয়োগ ছিল মার্কিন দেশের শিক্ষা কমিশনের ১৯০৬ সালের রিপোর্টে। আমার সেই 'পাণ্ডিত্য'পূর্ণ প্রবন্ধ শুনে সবাই বাহবা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ ভাবি, 'শিক্ষা' প্রসারের সঙ্গে তো অপরাধপ্রবণতা কমেনি। যারা দেশের নামে, ধর্মের নামে জনহত্যা (Genocide) করে, তারা তো সবাই শিক্ষিত লোক—আটিলা, চেংগিস খাঁ ও নাদির শাহর মতো নিরক্ষর নন। কিন্তু দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে আইনের ভয়ে যারা হয়তো ক্রাইম করেন না, তাঁরা দেশের নামে, জাতির নামে, ধর্মের নামে বিশ্বযুদ্ধ

করতেও কুণ্ঠিত হন না, তাঁরা বীররূপে পূজা পান। তথাকথিত শিক্ষাবিধি এ রোগের জীবাণু মারতে পারেনি,—দস্তুর মানুষ জন্তুই থেকে গেল; তার গুণগত পরিবর্তন হলো না—Laws of the jungle-এরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। Cheesman নয় বৎসর জেলে ছিল। সে নিজের পক্ষে ওকালতি করতো, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে এমন ওয়াকিবহাল যে তার মৃত্যু সে নয় বৎসর ঠেকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু 'ক্রাইম' থেকে সে কি নিবৃত্ত হয়েছিল? সে তো অশিক্ষিত ছিল না। কোথা থেকে কোথায় গেছি। এবার ভ্রমণের কথায় আসা যাক।

ফেরবার পালা। ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে হেঁটে রওনা হলাম। পথে পড়লো পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি গ্রাম। বজ্রযোগিনী গ্রাম দিয়ে যাচ্ছি। খুব বড় গ্রাম। লোকে বলে আঠারো পাড়ায় ভাগ, পাড়া তো নয়—এক একটা গ্রাম। বজ্রযোগিনী খুবই প্রাচীন। শুনতাম অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান এ-গ্রাম। শরৎ দাসের বইয়ে অতীশের জীবনী পড়েছি। অতীশ দীপঙ্কর পাল-রাজাদের সময়ে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ হন। সেটা খুব বড় সম্মান। কালে তাঁর নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি তিব্বতেও। তিব্বতের রাজা অতীশকে নিয়ে যাবার জন্য যা করেছিলেন, সে কাহিনী বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তিব্বতে গিয়ে তিনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। সে দেশের লোকে তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতো। আজ যখন সেই সব কথা ভাবছি—মনে হচ্ছে, আজও কি তিব্বতীরা এঁকে মনে রেখেছে? কে জানে! বজ্রযোগিনীর পরে রামপাল পেরিয়ে এলাম মুন্সীগঞ্জে। রামপাল ছিল পালরাজাদের এককালীন রাজধানী। মুন্সীগঞ্জ থেকে এলাম ঢাকা শহরে।

ঢাকায় এসে উঠলাম প্রসন্নচন্দ্র সেনের উয়ারীর বাটিতে। নৃপেন, সুশীল রয়েছে সেখানে, ওরা এসেছিল আমাদের সঙ্গেই। প্রসন্নচন্দ্রের বৃদ্ধ বয়সে শরীরের প্রতি কী যত্ন দেখেছিলাম। ভোরে উঠে দেখি তিনি ব্যায়াম করছেন। তখন ঢাকা বিপ্লবীদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তাই শরীর চর্চায় সকলেই মন দিয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে এসেছি ঢাকা, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তখন ঢাকাতে ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও চট্টগ্রামে ব্রাহ্মসংখ্যা খুব কম ছিল না। নিশিকান্ত বসু, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন ব্রাহ্মকর্মী; হেমেন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী সরযূবালা দত্ত 'বিধবা আশ্রম' পরিচালনা করতেন। সরযূবালা ঢাকার নামকরা পত্রিকা 'ভারতমহিলা'র সম্পাদিকাও ছিলেন। এই সময় হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় হলে তিনি আমার প্রথম পুস্তক 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' প্রকাশ করতে রাজী হন।

হেমেন্দ্রনাথ আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তাই আমার প্রথম গ্রন্থ 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' প্রকাশ করলেন। বইটি ঢাকায় মুদ্রিত হয়। এতে অনেকগুলি ছবি আছে, অবশ্য এ সবই শান্তিনিকেতন লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত। ছবিগুলির হাফটোন বোধ হয় কোলকাতায় ছাপা। ঢাকা ও কোলকাতা তখন তো এপাড়া ওপাড়া। কিছুদিন আগে বইটা হঠাৎ চোখে পড়লো। পড়লাম কয়েক পাতা, বোধ হয় আমার উনিশ বছর বয়সের লেখা বলে মমতাবশেই। কত তথ্যই না বলেছি গল্পচ্ছলে। কেননা তখন আমি ছাত্রদের অতীত যুগের ইতিহাস পড়াতাম। সেদিন যদি এভাবে তৈরী হবার অনুকূল পরিবেশ না পেতাম, তবে কি হতাম তা জানিনা। বলা বাহুল্য কবির আশ্রয় পেয়েছিলাম বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

এই বইয়ের লেখককে ধন্য করেছেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বইটির ভূমিকা লিখে। তিনি লেখেন: "আজ ৪ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষার একটি অঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যজগতে ইহার উল্লেখযোগ্য চর্চা আরম্ভ হয় নাই; লেখক ও পাঠক কেহই এদিকে তাকান না। সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানিকে এই পথে প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমি উৎসাহের উপযুক্ত মনে করি।

...গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, ছেলেদের মন এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীনতম জগতের দিকে আকৃষ্ট করা;...কাহিনীর সাহায্যে মানবচরিত্রের কয়েকটি জ্বলন্ত আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া এবং সভ্যতার পট চিত্রিত করিয়া লেখক নিশ্চয়ই তরুণ পাঠকদিগের মনে কুতূহল জাগাইতে এবং একখানি সুস্পষ্ট ও রঙ্গীন ছবি অঙ্কিত করিতে পারিবেন। হয়ত তাঁহার পাঠকদের মধ্যে কেহ বড় হইয়া এই ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় ব্রতী হইবে।..."

জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহসভা পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে। বিবাহ ও ভোজনাদির পর রাত্রে শুয়েছিলাম প্রসন্নবাবুর বাড়িতে। সেখানকার মশার কথা আজও মনে আছে— এমন বিনিদ্র রজনীর কথা ভোলা যায় কি?

ঢাকা শহর দেখলাম, বিশেষ করে রমনা। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আসাম নূতন প্রদেশের রাজধানী—বহু ইমারত তৈরী হয়েছিল সে সময়। তার মধ্যে দরবার গৃহটার কথা মনে আছে—সেটির স্থাপত্য দেখে খুব ভালো লেগেছিল, পরে সে সব গৃহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত হয়। নূতন ঢাকা দেখিনি— আর দেখাও হবে না; এখন সে দেশ তো বিদেশ। কানাডা, নিউজিল্যাণ্ডে

যাওয়ার থেকে কঠিন ঢাকা যাওয়া। লোকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতো; এখন কোলকাতার হিন্দু ঢাকার প্রতি সহানুভূতিশীল হলে সে হবে ভারতদ্রোহী, আর ঢাকার মুসলমান কোলকাতার লোকের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলে সে হবে ইসলামী স্টেট বিরোধী কাফের। হায় রে ধর্ম! হায় রে জাতীয়তা! এখন রেডিও ছাড়া ঢাকার সঙ্গে যোগ নেই।

কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ছাড়তে হয়েছিল, ম্যালেরিয়া জ্বরের বার বার আক্রমণের ফলে। শান্তিনিকেতনে এসেও মাঝে মাঝে জ্বর হয়।

সবাই বললেন, চেঞ্জে যাও দার্জিলিঙে। বার বার জ্বরে পড়া তো ভাল নয়। অতি সত্য কথা। তবে 'মস্ত' কিন্তু আছে!—'রাজরক্ত সে কি তোরা এনে দিবি?' কিন্তু মানুষ ভাবে যা, বোধ হয় হয়ও তাই। সুযোগ মিললো। কবির দৃষ্টি সবার পরেই। কবি একদিন ডেকে বললেন, মাঘোৎসবের সময় কলকাতা যাবে যখন, তখন ডাক্তার বিধান রায়কে দেখিয়ে এসো। এই বলে নিজেই পত্র লিখে দিলেন। ডাঃ বিধান রায় কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাত থেকে ফিরেছেন, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ডিগ্রি নিয়ে, যা কোনো ভারতীয় ছাত্র ইতিপূর্বে পারেননি—অর্থাৎ চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যায় সব্যসাচী হয়ে। গেলাম তাঁর বাড়িতে —ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে বাড়ি—তখন দোতলা। ভিড় ছিল না, তাই সহজেই দেখা মিললো। দেখলেন, ভাল করে সব শুনলেন, তারপর একটা ঔষধের নাম লিখে দিয়ে বললেন, সপ্তাহে একবার করে মৃদুরেচক নেবে। আর তারপর দুদিন পর পর দশ গ্রেন করে কুইনাইন খাবে। বললেন—পেটটা পরিষ্কার হয়ে গেলে, কুইনাইনের ক্রিয়া তাড়াতাড়ি হবে। যে ঔষধটা লিখে দিলেন, সেটা সেকালের 'ডি. গুপ্ত' 'গোবিন্দ সুধা'র মতো, সত্য ডাক্তারি মহলে চালু হয়েছে। অবশ্য ঔষধটা বিলাতী। আজকাল তো ডাক্তাররা প্রেস্‌ক্রিপশন লেখেন না, কী ঔষধ দিতে হবে তা ঔষধের ভদ্রবেশী হকাররা যে-ছাপা কাগজ দিয়ে গেছেন,—তাই দেখেই ডাক্তাররা সেইগুলি প্রয়োগ করেন। মুহূর্তের মধ্যে রোগীকে দেখতে দেখতেই।

দার্জিলিঙ যাবো স্থির হলো—গ্রীষ্মের ছুটিতে। ব্যবস্থা করে দিলেন ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র—মেয়ো হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক—ব্রাহ্মসমাজের সদস্য, রবীন্দ্রভক্ত। আমাকে চিনতেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে গিরিডিতে পরিচয় হয়। তিনি সস্ত্রীক গিয়েছিলেন গিরিডি বেড়াতে। শেষকালে দার্জিলিঙের স্বাস্থ্যাবাসে (স্যানেটোরিয়াম) 'ফ্রী বেড' পেলাম। কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। দার্জিলিঙে ইডেন স্যানেটোরিয়াম ছিল সাহেবদের জন্য। কিন্তু ভারতীয়দের সেখানে স্থান হতো না। তাই বাঙালী ভদ্রেরা নিজেদের মধ্যে টাকা তুললেন, জমি দিলেন বর্ধমানের মহারাজা

—দার্জিলিঙে তাঁর বিপুল সম্পত্তি ছিল। এক-একটা বাড়ি কয়েকজন ধনী জমিদার মিলে টাকা দিয়ে নির্মাণ করান। তেমনি স্বাস্থ্যাবাসে থাকবার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক দাতা টাকা দিয়ে যান—যার সুদে 'ফ্রী বেড' চলতো।

নিস্তারিণী দেবী নামে কোন সদাশয়া নারী স্যানেটোরিয়ামে দুইটি 'ফ্রী বেডে'র ব্যবস্থা করে যান। এর ব্যবস্থার ভার ছিল ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্রের উপর। তিনিই আমাকে দুই মাসের জন্য 'ফ্রী বেড' পাইয়ে দিলেন– অর্থাৎ দার্জিলিঙে থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না। তাই সেখানে যাওয়া স্থির হলো।

দার্জিলিঙ শীতের দেশ জানতাম; ভেবেছি গরম জামা-কাপড় যা ছিল তাতেই চলবে—শীতকালে গিরিডির শীতের মতো তো হবে। গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হলে এই সম্পূর্ণ অজানা দেশে চললাম। ইতিমধ্যে দূরতম দেশে পশ্চিমে এলাহাবাদ ও পূর্বে ঢাকায় গিয়েছি।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দার্জিলিঙ মেল ছাড়তো এবং সোজা উত্তরে যেতো—আজও দার্জিলিঙ মেল ছাড়ে, তবে তা যায় লুপ লাইন দিয়ে, অর্থাৎ আমাদের বোলপুর হয়ে, ফরাক্কা সেতু পার হয়ে, অনেক ঘুরে, সময়ও লাগে বেশি, ব্যয়ও হয় অনেক। ফরাক্কা সেতু নির্মিত হবার পূর্বে এই দার্জিলিঙ মেল গিয়ে থামতো ফরাক্কা ঘাটে, সেখানে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে ট্রেনে চেপে, মালদহ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছতো নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। আমি যেবার দার্জিলিঙ যাই, সেবার আমাকেও নদী পার হতে হয়, তবে তা গঙ্গা নয়—পদ্মা। তখন দার্জিলিঙ মেল যেতো বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে।

দার্জিলিঙ মেলকে ছোটবেলায় আমাদের রাণাঘাট স্টেশনে আসতে-যেতে দেখতাম। দেখতাম মুগ্ধনেত্রে—সাহেবরা যাচ্ছেন ফার্স্ট ক্লাসে। তখন তো দার্জিলিঙে ছিল লাটসাহেবের গ্রীষ্মাবাস। তিন মাস তিনি ও তাঁর দপ্তরের বড় একটা অংশ যেতো সেখানে। কলকাতার গরম অসহ্য—তখন শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা অজ্ঞাত।

রাণাঘাটে মেল থামলো। প্ল্যাটফর্মে নামলাম, ভাবলাম যদি পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু আমি চলে গেছি, আর আমার সমসাময়িকরা বসে আছে? সেই বিকালে যে বন্ধুদের সঙ্গে স্টেশনে আসতাম মেলগাড়ি দেখতে, তারা কে কোথায় জানি না।

ট্রেন রাত্রির অন্ধকারে চলেছে। আজ রাণাঘাট ছাড়িয়ে গোটা দুই স্টেশন পরেই তো এই রেলপথ আর উত্তরে যায় না। পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার পর থেকে এখানকার রেল উপড়ে ফেলা হল—উত্তরে হলদিবাড়ির সঙ্গে

যোগাযোগ নষ্ট করা হল। পশ্চিম বাংলা উত্তর বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জানি না আবার স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধনের ফলে এই পথ খুলবে কিনা, আবার দার্জিলিঙ মেল সরাসরি সারাব্রিজ পার হয়ে সোজা পূর্বের মতো শিলিগুড়ি (বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি) পর্যন্ত যাবে কিনা—কৃত্রিম ভেদ দূর হবে কি? জানি না।

আমি যে যুগে গিয়েছিলাম, তখন সারাব্রিজ ছিল না। দামুদিয়া ঘাটে রাতে নামতে হল। কুলির মাথায় আমার পেটরা ও বিছানা চাপিয়ে স্টীমারে উঠলাম। ইতিপূর্বে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছি স্টীমারে—দিনমান ছিল—পদ্মার বিচিত্র শোভা দেখতে পেয়েছিলাম। রাত্রির অন্ধকারে পদ্মা পার হতে হচ্ছে—কিছুই দেখতে পেলাম না—যাত্রীদের কলরব, ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ানি পদ্মার সব রোমান্স নষ্ট করে দিল।

ওপারে নামলাম। তখন রাত হয়েছে বেশ। আবার কুলির মাথায় পেটরা বিছানা চাপিয়ে ট্রেনের কাছে গেলাম। কিন্তু এ কী ট্রেন, এত ছোট! জানতাম সারা ঘাটের ওপার থেকে মিটার গেজ রেলপথ ছিল। মিটার গেজ অর্থাৎ লাইন বলতে ৩´—৩´ বা এক মিটারের ব্যবধানে। আর অন্য গাড়ি ব্রড-গেজ-এর লাইন ৫´—৬´ অর্থাৎ মিটার গেজের লাইন ২´—৩´ ছোট। তাই ট্রেনের কামরাও ছোট। তাই বলে বেঞ্চ ছোট নয়, সেগুলো প্রমাণ মানুষের মাপের তৈরী। সেকালে ট্রেনে ভিড় ছিল না আজকালকার মতো; তাই রাতে একটা বেঞ্চে শুতে পেলাম—আজকাল তা কেউ কল্পনা করতে পারে না। দাঁড়াবার জায়গা পেলেই যথেষ্ট। দশ দিন আগে লাইনে দাঁড়িয়ে শোবার বার্থ রিজার্ভ করতে হয়। তারপর রাত ন'টার পর তিনতলা বাঙ্কে কোনো রকমে শুয়ে পড়ো। কিন্তু খবরদার, উঠে বসবার চেষ্টা করো না!

ঘুম ভাঙলো সকালে—বোধ হয় জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়িতে আমাদের ছাত্র নরেন্দ্রপ্রসাদ থাকে। তার দাদা সুরেন্দ্রপ্রসাদ এসেছিলেন ভাইকে দেখতে। সঙ্গে ছিলেন নীলরতন ধর, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখুজ্যে। সবাই ছাত্র তখন। স্থির করলাম ফেরবার সময়ে জলপাইগুড়িতে নামবো। নেমেও ছিলাম। সে কথা পরে আসবে। এখন দার্জিলিঙ চলছি।

শিলিগুড়ি নামলাম—শেষ স্টেশন। তখন ছোট স্টেশন। আর একটা প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে। এ-ট্রেন যে আরও ছোট! আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কামরার কাছে গিয়ে দেখি—দরজা নেই। জানালায় পরদা টাঙানো। সহযাত্রীরা ঐদেশীয়—অর্থাৎ নেপালী, ভুটিয়া, তিব্বতী। বাংলা-

দেশের সমতল ক্ষেত্র থেকে যেমন হঠাৎ হিমালয় উঠে গেছে—কোনো মিল পাওয়া যায় না—তেমনি সমকালীন একবস্ত্রী বাঙালী নরনারীর সঙ্গে পাহাড়ের লোক-দেরও বসনে-ভূষণে, স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে কোনো মিল নেই। মেয়েদের রূপ নেই, তবে স্বাস্থ্য আছে।

ট্রেন ছাড়লো। দু'ফুট রেলপথের উপর খেলার গাড়ির মতো মনে হয়। ইঞ্জিনও দেখতে অদ্ভুত। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ ৫১ মাইল—এই পথের মধ্যে প্রায় সাত হাজার ফুট চড়াই উৎরাই করে যেতে আসতে হয়। যাবার সময় চড়াই পথে, নামবার সময় উৎরাই পথে।

বিস্ময়নেত্রে দেখছি সব—কিছু যেন না হারাই। প্রথম কয় মাইল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ সমতল থেকে ধীরে ধীরে উঠছে। তারপর শুরু হয়েছে পর্বতারোহণ। হাঁটাপথে মানুষ কতকাল যাওয়া-আসা করেছিল—অশ্বই ছিল একমাত্র বাহন। ১৮৭৮ সালে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেলপথ পৌঁছেছিল। তারপর Cart Road দিয়ে গোযান, টাঙ্গা বা এক-ঘোড়া টানাগাড়ি ছিল যাওয়া-আসার জন্য। কিন্তু কেন এই পাহাড়ের মধ্যে দার্জিলিঙ The Queen of hilly stations তৈরী হল—তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

কার্শিয়ং, দার্জিলিঙ প্রভৃতি পার্বত্য অংশ ছিল সিকিমের অন্তর্গত। নেপালের গুর্খারা এককালে এই অঞ্চল সিকিমের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ইংরেজ গুর্খা-দের যুদ্ধে হারিয়ে ১৮১৭ সালে সিকিমের রাজাকে এই সব অঞ্চল ফিরিয়ে দেয়। দার্জিলিঙে ইংরেজ প্রথম আসে ১৮২৯ সালে ও ১৮৩৫-এ সিকিম রাজাকে বছরে ৬ হাজার টাকা খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করে। ইতিমধ্যে সমতলের পাংখাবাড়ি থেকে কার্শিয়ং হয়ে একটা রাস্তা তৈয়ারী হল। কার্শিয়ঙে ছিলাম এই রাস্তার ধারে 'হোমরেস্তি'তে—বহু দূর নেমে গেছি এই পথ দিয়ে—সমতল দেখা যেতো দূরে। মোট কথা ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত নিরূপণের চেষ্টা চলছে সব দিকে, পশ্চিম ভারতে চলছে, উত্তর ভারতে চলছে, পূর্ব ভারতে চলছে, কোথায় Natural boundary ঠিক করা যায়। এই Natural boundary ঠিক করতে পশ্চিমে Durand line হল, উত্তরে হল Mcmohan line—উত্তর-পূর্ব কোণে আসাম থেকে ঠেলতে ঠেলতে মণিপুর, নাগা, অবোর মিশমি, লুশাই (Mijo) ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হতে হতে কবে বর্মার গায়ে গিয়ে ঠেকলো, আর উত্তরে তিব্বতের কিনারে গিয়ে পৌঁছলো। বর্মা গ্রাস হল ; তিব্বতের উপরে ছোবল দিয়ে সুবিধা হল না—ব্রিটিশের Natural boundry আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যাক, দার্জিলিঙ তো খাজনা দিয়ে সিকিমের কাছ

থেকে পেয়েছে ; কিন্তু বছর বছর খাজনা দেওয়া একদিন বন্ধ হল। দু'জন ইংরেজ সিকিমে ঢুকেছিল বোধ হয় গুপ্তচররূপে, সিকিমীরা তাদের হত্যা করে ; এই হত্যা-অপরাধের জন্য বার্ষিক ৬ হাজার টাকা খাজনা দেওয়া বন্ধ হল ১৮৫০ থেকে।

পূর্বে বলেছি শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেলপথ ১৮৭৯ সালের মধ্যে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর যে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ভারতের মধ্যে রেলপথ বিস্তারিত হয়, তারই ফলশ্রুতিরূপে ১৮৮০ সালের মধ্যে এই দু'ফুট গেজের রেলপথ দার্জিলিঙ পৌঁছিয়ে গেল। মোটামুটি সেই দার্জিলিঙ দেখতে চলেছি।

শিলিগুড়ি থেকে কয়েক মাইল প্রায় সমতলের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে, দুই পাশে গভীর অরণ্য ; এ সেই তরাই-এর জঙ্গল, ভূগোলে যার কথা পড়েছি ও ছাত্রদের পড়িয়েছি। ক্রমে সমতলের বাঁধন ছেড়ে গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে পাহাড়ের পথে।

গাড়ি বেঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে, সব স্টেশনেই থামছে, এটা তো মেল ট্রেন নয়। সে ট্রেন কলকাতার ডাক নিয়ে ও ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস যাত্রীদের নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে, সে ট্রেনের ভাড়াও বেশি। আমরা এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রী। তাই সব স্টেশনেই থামছে। আমার কিন্তু বেশ লাগছে ;—সব যে নূতন। পথে একটা জায়গায় যে রেলপথ ছেড়ে এসেছিলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি, সেটা নিচে রয়ে গেছে। প্রায় বৃত্তাকারে পাহাড় ঘুরে এসেছে। আর একটা জায়গায় দেখি, ট্রেন একবার এগিয়ে একটা পথে গিয়ে পিছিয়ে অন্য পথ ধরে উঁচু দিকে উঠছে। রেলপথের পাশে মাঝে মাঝে পাচ্ছি কার্ট রোড, দুই-একটা গরুর গাড়িকেও চলতে দেখি। মার কাছে শুনি তাঁরা গোযান করে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন, দাদামশাই ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তাই যেতে হয় এই পাহাড়ী শহরে, ঘটনাটা নিশ্চয়ই ১৮৮১ সালের পূর্বের। পরে যখন দার্জিলিঙ যাই, তখন এই কার্ট রোডের পরে আর গোযান দেখিনি—তখন সেখানে মোটরযান চলছে। থাক্ সে-কথা।

পাহাড়ের গা-কেটে রেলপথ ; তাই কখনো ডানদিকে কখনো বাঁদিকে গভীর খাদে নেমে গিয়েছে কত নিচে। মাঝে মাঝে কুয়াশা ধোঁয়ার মত পাকিয়ে উঠছে। নীচে চা-বাগান, সবই তখন সাহেবদের। মোটরকার করে তারা নামতো উঠতো। কিন্তু যখন মোটরগাড়ি আবিষ্কৃত হয়নি, তখন তো পায়ে হেঁটে এই চড়াই-উৎরাই পথে আসা-যাওয়া করতে হত। তারপর দার্জিলিঙে গিয়ে Planters Club-এর বাড়িতে উঠে কয়দিন ফূর্তি করে ফিরে আসতো। কী

পরিশ্রম করে সাহেবরা এই চায়ের বাগান গড়ে তোলে—পৃথিবীর বাজারে এক দিন একচেটিয়া স্থান করে নিয়েছিল ভারতের চা।

তিনধরিয়া এসে গেল। বেশ শীত করছে। জানতাম জায়গাটা প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু—সুতরাং ৯ ডিগ্রী ফারেনহিট তো কম হয়েছেই। তাই র‍্যাপার মুড়ে নিলাম। এ-স্থানটা রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুপরিচিত; রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন ১৯১০ সালে গ্রীষ্মকালে, গীতাঞ্জলির কয়েকটি গান এখানে রচিত। প্রথমবার যেবার দার্জিলিঙ যাই, তার পূর্বেই তো গীতাঞ্জলি বের হয়ে গেছে। সে আলোচনা থাক এখন।

তিনধরিয়া ছাড়ার কয়েক মাইল যেতেই শুনলাম পাগলা-ঝোরা আসছে। পাহাড়ীদের পুণ্যস্থান। পাহাড় ভেঙে ঝরনা নেমে আসছে, ট্রেনে বসে তার শীকরকণার স্পর্শ পাচ্ছি। এখানে রেলপথ ঠিক রাখতে প্রতি বৎসর রেল কোম্পানিকে অনেক মেরামত করতে হয়, পাগলা-ঝোরার উন্মত্ততাকে সামলাতেই পারে না। কিন্তু পরে একবার দেখেছি পাগলা-ঝোরায় জল নেই। আজ শুনি দার্জিলিঙে জলাভাব। 'জলের মাঝারে বাস করি তৃষায় শুকায়ে মরি'! হিমালয়ের কোলের মধ্যে বাস করেও সেখানে জলের জন্য হাহাকার। প্রকৃতির এ কি পরিহাস! কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন—

তোমরা কি কেউ শুনবে না গো
পাগলা ঝোরার দুঃখগাথা,
পাগল বলে কর্বে হেলা?
কর্বে হেলা মর্মব্যথা?
জন্ম আমার হিম উরসে
কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি
গঙ্গাদিদির পাগলা ভাই।
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে
রাখলে আমায় বন্দীবেশে;
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু,
আমায় কিনা বাঁধলে শেষে।
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে,
পারিনে তায় ছিঁড়তে বলে,
শীর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমে,

পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।
আগে আমায় চিনত যারা
বলছে শোনো যায় না চেনা।
বাজবে কবে প্রলয় বিষাণ
—মুখে আমার উঠছে ফেনা।
বিকল পায়ের শিকলগুলো
কত দিন সে থাকবে আরো?
রুদ্র তালে নাচব কবে?
তোমরা কেহ বলতে পার?

পাগলা-ঝোরা ছাড়িয়ে মহানদী ছোট রেলস্টেশনে এলাম। স্টেশনের পাশেই জঙ্গলে-ঢাকা মহলদীরাম পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে এই নদী বের হয়েছে, তা সমতলে গিয়ে নাম পেয়েছে 'মহানন্দা'—উত্তরবঙ্গে সুপরিচিত। আসলে মহানদীর লেপচা নাম মহলদি, যার মানে হচ্ছে বাঁকা নদী। এই রেল স্টেশনের সংস্কৃত নাম মহানদী। লিখতে লিখতে মনে পড়ছে 'দামোদর' নদীর নামের উৎপত্তি কথা, শব্দটা স্থানীয় দা-মুণ্ডা—অর্থাৎ মুণ্ডাদের জল। দা-মুণ্ডা থেকে হল দামুদা, তার থেকে দামুদর, দামোদর। সেইরূপ 'মহলদি' হল 'মহানন্দা'। মহানদী রেলস্টেশন পার হয়ে একটি কাটিং বা পাহাড় গভীর করে কেটে দুই পাশের উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথ। সেই বাঁকে আসতেই চোখে পড়লো দূরে সমতল ক্ষেত—যা ছেড়ে এসেছিলাম, সেই দৃশ্য ক্ষণিকের জন্য মন-ভোলানো—আমরা সমতলের মানুষ, তাই কি এই দেখবার ইচ্ছা! কিন্তু সমতলে দাঁড়িয়ে তো কখনও সমতলকে দেখা যায় না, যেমন বিরাট করে দেখতে পেলাম এই হঠাৎ বাঁকের পথে এসে। দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হয়ে গেল। পাহাড়ের নীল ও কুয়াশায় মিশে গেল দিগন্ত।

এসে গেলাম কার্শিয়ং। কয়েক বৎসর পরে এখানে একবার কিছুকাল ছিলামও, সেই স্মৃতিচারণ করব না—যদিও বহু সুখস্মৃতি ছড়িয়ে আছে এ-স্থানের সঙ্গে। শিলিগুড়ি থেকে এতক্ষণে ৩২ মাইল এলাম। দার্জিলিঙ এখনো ২০ মাইল দূরে।. হিমালয় রেলপথের বড় স্টেশন কার্শিয়ং জেলার একটা মহকুমার সদর। ১৮ শতকের শেষ পর্যন্ত কার্শিয়ং ছিল সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত; সিকিমের অর্থ 'নূতন ঘর'; মনে হয় তিব্বত থেকে একদল লোক এসে এখানে নূতন ঘর বাঁধে। তারপর গুর্খাদের সিকিম জয়ের প্রচেষ্টাকে ইংরেজরা ব্যর্থ করে

দেয় ১৮১৭ সালে, তারপর ইংরেজ উদারভাবে সিকিমকে এ সব স্থান ফিরিয়ে দেয়। তারপর ১৮৩৫ সালে সিকিমের রাজা ৫।৬ মাইল চওড়া পার্বত্যভূমি ইংরেজ সরকারকে দান করে, তার মধ্যে ছিল কার্সিয়ং, ছোট এক গ্রাম।

কার্সিয়ং স্টেশন বেশ বড়। আমাদের আগে দার্জিলিঙ মেল চলে গেছে—সাহেবরা এখানে দুপুরের লাঞ্চ বোধ হয় খেয়ে গেছেন। আমাদের মতো তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রীরা সে খাদ্যরস থেকে বঞ্চিত। কেবল প্ল্যাটফর্মে ইতস্তত ছড়ানো খাদ্য উচ্ছিষ্ট দেখতে পাচ্ছি—উর্দি পরা খানসামারা দ্রুতহস্তে বাসনপত্র সরাচ্ছে আর মেথর ঝাড়ু দিয়ে সাফাই করছে।

কার্সিয়ং স্টেশনে ট্রেন ঢুকেছিল। আবার বের হয়ে অন্য পথ ধরে দার্জিলিঙ যাত্রা করলো। পথে পড়লো ঘুম স্টেশন। এ জায়গাটা দার্জিলিঙ থেকে উঁচু—তাই শীতও বেশি, কুয়াশাও বেশি। ট্রেনের কাছে এলো 'ঘুম' বুড়ী—এ ছিল প্রবাদগত ঘুম ডাইনী। বৃদ্ধার অনেক গয়নাগাঁটি অঙ্গে। পরে শুনি তার মৃত্যুর পর বিছানার তলায় অনেক টাকা পাওয়া যায়। মনে পড়ছে প্রবাসীতে ঘুম বুড়ীর কাহিনী কে লিখেছিলেন। ছবিও দেখেছিলাম। সুতরাং স্টেশনের পাশে বুড়ীকে দেখেই বুঝলাম এই তো 'ঘুম' বুড়ী।

দার্জিলিঙ এসে গেল। কার্ট রোড দিয়ে ট্রেন চলেছে। ইতিমধ্যে আমার যা কিছু গরম পোশাক ছিল তা পরা হয়ে গেছে। কিন্তু সহযাত্রীরা প্রায় সেই একই পোশাকে জড়িয়ে আছে, কেউ কেউ মাফলার জাতীয় র‍্যাপার জড়িয়েছে। কিন্তু তাদের আঙুল চলছে, মোজা বা সোয়েটার বোনে। শীতের দেশে মোজা সোয়েটার ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য আজকাল এটা প্রায় সর্বদেশের মধ্যবিত্তদেরও একটা 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছে ; বাসে, ট্রেনে এমন কি সভা-সমিতিতেও তাদের আঙুল চলছে, আর চলছে অনর্গল বাক্যের বুদ্বুদ।

দার্জিলিঙ খুব ছোট স্টেশন দেখে মনে হল। আমার মালপত্র খালাস করা হল। সামান্য ট্রাঙ্ক ও বেডিং ব্রেকভ্যানে দিতে হয়েছিল শিলিগুড়িতে। দার্জিলিঙে পাহাড়ী কুলি এলো মাল নিতে—তবে এরা মেয়ে কুলি। কী চেহারা এক-একজনের। ভারতীয় কুলিদের মতো এরা মাল মাথায় তুলে নেয় না, মাথায় দড়ির ফেটি বাঁধা, তাতেই বেঁধে নেয় মালপত্র, যার ভারটা গিয়ে পড়ে পিঠ ও কোমরের ওপর। চেরাপুঞ্জীতে 'থাপা' দেখেছিলাম—এ রকমেরই তারা চেয়ার পর্যন্ত পিঠে নিয়ে মাথায় ফেটিতে বেঁধে মানুষকে তোলে সমতল থেকে। কুলিরা মালপত্র নিয়ে চললো স্যানেটোরিয়ামে—স্টেশনের কাছেই, তবে অনেকটা নিচে—বেশ কয়েকটা পাকদণ্ডী ঘুরে নামতে হয়। ওপর থেকে

দেখা যাচ্ছে বহুদূর বিস্তারিত অনেকগুলি ঘরবাড়ি নিয়ে লুইস জুবিলি স্যানেটো-রিয়াম। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের রজত জয়ন্তী বা 'জুবিলি' বৎসরে স্যানেটোরিয়ামটি হয়। পৌঁছলাম—পথের পাশেই অফিস। সেখানে আমার স্ত্রী বেডের কাগজপত্র পেশ করলে, আমাকে আমার থাকবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। স্থান হল একতলায়, পাশেই স্নানাগার। গরম জল দিয়ে গেল ওয়ার্ডের কান্‌চা বা ছোকরা। আমি কোথায় খাব জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলাম যে 'জেনারেল'। অর্থাৎ ছত্রিশ জাত যেখানে খায় সেখানে খাব। আমাদের আহারের স্থান ঐ বাড়িতেই ছিল। ব্যবস্থাটা পাশ্চাত্য ধরনের। সাধারণ ভোজনাগার অনেকটা দূরে—সেখানকার কথায় পরে আসছি। খাওয়ার ঘরে গেলাম আমরা তিন-চারজন মাত্র, এই জাত-পাত-তোড়া টেবিলে আহার করছি—বাবুর্চি সেবক—দেখাশোনা করছেন একজন নেপালী কর্মচারী। হিন্দুদের ভোজনাগার এক দিন দেখতে যাই। বাড়িটা আবাসিক ঘরগুলি থেকে পৃথক। শীতে বর্ষায় আহার করতে যেতে হয় চারবার করে সেখানে। ভিতরে ঢুকে দেখি দেওয়ালে সাইনবোর্ডে লেখা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বিচিত্র জাতির পৃথক ভোজন স্থান, পরস্পরের স্পর্শ বাঁচিয়ে বসতে হয়। স্যানেটোরিয়ামের এক-একটা বাড়ি এক-একজন ধনীর দানে নির্মিত। ভোজনশালার জন্য যিনি অর্থ দেন, তিনি বর্ণাশ্রমের উগ্র সমর্থক ছিলেন। কবুল করতে এখন আর কি? এককালে আমরাও তো এসব মানতাম। মনে পড়ছে যে সদ্‌গোপকন্যা শিশুকাল থেকে আমাকে মানুষ করেছিল, ভাত মেখে 'কাকের ডিম' 'বকের ডিম' বলে বলে খাওয়াতো, পৈতা হবার পর আমাদের কাছে সে হল অস্পৃশ্য। কায়স্থ ছেলে কার্তিক সমবয়সী খেলার সাথী। পৈতার পর রান্নাঘরের পিঁড়েয় বসে খাচ্ছি, কার্তিক দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে যে খুঁটিতে হেলান দিয়ে আহার করছি সেটা ছুঁয়ে ফেলেছে। স্পর্শদোষ হল—অন্নত্যাগ করে উঠে যেতে হয়েছিল। বুঝলাম "জাত" রক্ষার জন্য আমি যা করতাম আজ এঁরাও তাই করছেন, তাঁদের বিশ্বাস ছোঁয়াছুঁয়ির ওপর হিন্দুদের বুনিয়াদ। ধর্মসংস্কারকগণ, সমাজসংস্কারক সবাই তো বলে আসছেন ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করো; কিন্তু "ভবি ভোলবার নয়"। জাত মানলে অনেক সুবিধা। আবার তফসীলী সম্প্রদায় বা হরিজন নামে যে একটা উৎকট শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল তাও সমান অবাস্তব। তবে সে নাম থাকলে সরকারী অনেক সুবিধা সুযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তফসীল বা উপজাতীয় পদবী নিয়ে ভালই আছে। কিন্তু তফসীলী বা হরিজনরা কি একটা জাত? ডোম, হাড়ি, বাউরি—সবই তো পৃথক পৃথক একক।

স্যানেটোরিয়ামে আছি আরামে আনন্দে। কাজের মধ্যে বেড়ানো ও আড্ডা দেওয়া; তবে ভোজনের নির্দিষ্ট সময়ে আসতেই হয় সবাইকে। শিশিরবাবু ডাক্তার। তিনি এখানকার কর্তা। তিনি বলতেন এটা স্বাস্থ্যনিবাস, হোটেল নয়। স্বাস্থ্যের জন্য এখানে আসা, নিয়ম মেনে চলতেই হবে। মদ্যপান নিষিদ্ধ। একবার কয়েকজন মদ্যপ বোর্ডারকে তিনি এখান থেকে বের করে দিয়েছিলেন বলে শুনেছি। এই ধরনের বিচিত্র লোক আসেন। শিশিরবাবু সবারই বন্ধু, আত্মীয়ের মতো। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠাবান। তাই যখন দুপুরে লুকিয়ে হকাররা কেক প্যাসট্রি প্রভৃতি নিয়ে হাজির হতো, বোর্ডারদের বলে দিলেন এ সব বাজারের জিনিস খাবেন না। আর হকারদেরও নিষেধ করেছিলেন, 'এখানে এসে ঘরে ঘরে ফেরি করবে না।' তবে বাগ বুঝে তারা আসতে ছাড়তো না, আর বোর্ডাররা লুকিয়ে কেক-প্যাসট্রি কিনতোও। স্যানেটোরিয়ামের একটা হল ছিল, সেখানে একটা লাইব্রেরীও ছিল। তাতে দার্জিলিঙ পাহাড় সম্বন্ধে কতকগুলি বই পেলাম। সব থেকে আকর্ষণ করেছিল Hookers Journal, শত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলের বর্ণনা লিখেছিলেন Sir Joseph Dalton Hooker.

দার্জিলিঙ শব্দের অর্থ মূর্খ পণ্ডিতের মতে দুর্জয় লিঙ্গ থেকে হয়েছে। যেমন তাদের মতে গোয়ালন্দমালা আসলে গৌতমালয়, বলিভিয়া বলি রাজার দেশ। এ ধরনের শব্দবিজ্ঞান Sound Philology is not Sound Philology। আসলে শব্দটা হচ্ছে দোর্জে 'বজ্র' থেকে। ঝড়ঝঞ্ঝার দেশ বলেও নাম হতে পারে, 'বজ্র' শব্দের অর্থ বৌদ্ধ মহাযানের অন্যতম যান 'বজ্র' যানের 'বজ্র' হতে পারে। সিকিমের রাজাদের নামের গোড়ায় আছে দোর্জে। এ অঞ্চলের আদি পীঠস্থান বোধ হয় আজকাল যাকে অবজারভেটরী হিল বলা হয় তার ওপরে। যেখানে তিব্বতী লামাদের মঠ ছিল; ইতিহাস বলে হিন্দু গুর্খারা যখন এই অঞ্চল দখল করে, তখন সেই মঠ দেয় ভেঙে। মঠটা ছিল সিকিমের 'দুর্জয়লিঙ্গ' মঠের অনুরূপ। বহুকাল পরে ব্রিটিশরা এখানকার রাজা হলে ভুটিয়া বৌদ্ধরা এখানে ছোট একটা গুম্ফা তৈরী করে। আমরা সেইটা দেখতে যাই।

গিয়ে দেখি গুম্ফার চারদিকে লম্বা লম্বা বাঁশের ডগায় মন্ত্র-ছাপা কাগজ বাঁধা। পুণ্য অর্জন হচ্ছে তাদের—যেমন পুরীতে ধ্বজা বাঁধার জন্য পাণ্ডা ও তাদের সাকরেদরা গ্রামের ভক্তদের পুণ্যলোভ দেখিয়ে পয়সা আদায় করে। গুম্ফার এদিক ওদিক দু-একজন 'লামা' বা তিব্বতীকে দেখছি। হাতে ঘুরছে একটা যন্ত্র, যার গায়ে লেখা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'। বৈষ্ণবরা যেমন ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মালা জপে পুণ্যঅর্জন করেন, অনেকটা সেইরূপ। শুনেছি জলচক্রের

সাহায্যে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ ঘুরতে থাকে—তাতেই নাকি জলচক্রের মালিকের নাম জপের পুণ্য হয়।

অবজারভেটরী হিল থেকে শহরের অনেকখানি দেখা যায়, সন্ধ্যার মুখে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যাস্ত দেখেছি। সে শোভা মনের মধ্যে আঁকা আছে, কাউকে দেখানো যায় না, বোঝানো যায় না। মনে আছে একদিন স্যানেটোরিয়ামে শুতে যাব, হঠাৎ বাইরে সকলে বলছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। লেপ জড়িয়েই বাইরে গেলাম। জ্যোৎস্নায় দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সে কি অপূর্ব দৃশ্য। সূর্যাস্তে দেখেছিলাম রঙের খেলা, এখন তুষারের ওপর চন্দ্রশোভা।

বেড়াতেও যাই—একদিন এদিকে, একদিন ওদিকে। ক্যালকাটা রোড সম্বন্ধে একটি ভয় দার্জিলিঙ-ভ্রমণবিলাসীদের ছিল, কম লোকই সেদিকে যেতেন, সত্যই dismal। এই পথের ওপর খ্রীষ্টান বালক-বালিকাদের একটা আবাসিক বিদ্যালয় ছিল—স্থানটির নাম আলুবাড়ি। বোধ হয় ১৯০১ সালে ভূকম্পে সেই আবাসিক বিদ্যালয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভেঙে পড়ে। সে ঘটনার ছবি দেখেছি—ব্রিটিশ সৈন্যরা ভগ্নস্তূপ সরাচ্ছে। সেই ঘটনার পর থেকে ক্যালকাটা রোড প্রায় পরিত্যক্ত হয়। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ 'দুরাশা' গল্পে ও পরশুরাম 'গড্ডা-লিকা'র গল্পে এই সড়কটিকে অমর করে রেখেছেন। আমি মাঝে মাঝে গিয়েছি—বেঞ্চে বসে উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠে আসতে দেখেছি। ঐ পথ ধরে এক দিন জলাপাহাড় ঘুরে 'ঘুম' স্টেশনে গিয়ে উঠি।

'ঘুমে' দেখি তিব্বতী মন্দির। লামারা মন্দির-প্রাচীর চিত্রিত করেছেন। বুঝলাম এটা তাঁদের ধর্মের অন্তর্গত কর্ম—মন্দিরে শোভাবর্ধন। অজন্তায় যাঁরা চিত্রিত করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন বৌদ্ধশিল্পী। ঘুমের মন্দিরে দেখলাম তিব্বতী পুঁথির স্তূপ। আর দেখলাম লেখা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'। এই রাহস্যিক শব্দ কয়টির অর্থ হঠাৎ একদিন যেন স্ফুটিত হল। সে আলোচনা থাক।

দার্জিলিঙে অপরাহ্নে সমস্ত ভ্রমণবিলাসীরা মিলিত হতেন ম্যালে—অর্থাৎ এই পাহাড়ী শহরের এস্প্লানেডে—অনেক রাস্তা এখানে এসে মিশেছে। মন্দিরের চারদিকে বেঞ্চ পাতা, বসে গল্প ও আড্ডার প্রশস্ত স্থান। প্রায়ই দেখি একজন খ্রীষ্টান পাদরীকে। তাঁর লম্বা শ্মশ্রুতে পাক ধরেছে। তিনি এসে বাংলা ভাষায় গান করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন—তাঁর গানের ভাষা—'আমি যীশুর ভকৃট, আমি পান করি তাঁর রকৃট' ইত্যাদি। মেমসাহেবরা তাকে দেখে মুচকি হেসে পাশ কাটাতেন, আমরা মজা দেখতাম। একদিন একটা গোরা সার্জেন্ট এসে সেই ধর্ম-পাগল পাদরীকে বলে দিল, এভাবে বক্তৃতা এখানে করবে না। কিন্তু তার কথা

না শুনে পরদিন আবার এসে গান ও বক্তৃতা শুরু করতেই একজন জোয়ান সার্জেন্ট এসে বৃদ্ধের গলার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। এতক্ষণ কৌতুকবোধ হচ্ছিল, কিন্তু যখন সার্জেন্ট টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল, মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা ধর্মপাগল! তবে এ তো মুখে গান গেয়ে বলে, 'আমি পান করি তাঁর রক্ত'। কিন্তু যখন কাগজে দেখি বাপ-মা নিজের সন্তানকে বলি দিয়েছে ধর্মের নামে—তখন বলতে ইচ্ছা করে, 'ভগবান—তুমি বলো যে তুমি নেই, তোমাকে পূজা করে কোনো লাভ নেই—সব মিথ্যা সব মিথ্যা। তোমার অস্তিত্বের বুজরুকি বন্ধ করো।'

দার্জিলিঙে দর্শনীয় স্থান সবই দেখছি। একদিন দেখি স্বাস্থ্যাবাসে খুব উত্তেজনা— একদল শেষরাতে টাইগার হিলে যাবেন। ভোরে এভারেস্টে সূর্যোদয় দেখবেন। শুনলাম অনেক হাঙ্গামা, অনেক খরচ। ঘোড়ায় করে যেতে হবে অনেকটা। অত পয়সা আমার নেই—তাই 'মনে রয়ে গেল মনের আশা', এভারেস্ট দেখা হল না। তারপর অভিযাত্রীরা ফিরে এসে বললেন, এভারেস্ট তার মুখের মেঘাবরণ খোলেননি—বৃথায় অপেক্ষা করে তাঁরা ফিরে এসেছেন। এখন স্থান মোটর-পথ হয়ে গিয়েছে। সহজেই লোকে যায় আসে।

কিন্তু এভারেস্টকে তো মানুষ আর দূর থেকে দেখছে না, এখন তো তার মাথার ওপর চেপে নিশান পুঁতে আসছে। পূর্বে দূর থেকে গাণিতিক জরিপ করে এই গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা মাপা হয়েছিল। মেপেছিলেন রাধানাথ শিকদার।

এ-কাহিনী শুনি মেজর বি. ডি. বসুর কাছ থেকে। গত বৎসর এলাহাবাদের কংগ্রেস ও প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এলাহাবাদে তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। এবার দার্জিলিঙে এসেছেন বেড়াতে। তাঁর সঙ্গে পথে একদিন দেখা। তারপর থেকে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে বেড়াতাম। কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন। আমি অল্পবয়স্ক বলে অশ্রদ্ধা তো করতেনই না, আমাকে 'আপনি' করে কথা বলতেন। আমি আপত্তি করলে বলতেন, 'Brahmin aristocrat, সম্মান দেখাতে হয়।' এঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা জানতাম, পরে আরও জানতে পারি। Major Basu ও কীর্তিকার দুইজনে মিলে Indian medicinal plants সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন, প্রথম দুই খণ্ড পাঠ্যাংশ আর দুই খণ্ড ছিল চিত্রপূর্ণ। ইতিহাসে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। বহু অধ্যয়নের ফল-স্বরূপ প্রকাশিত হয় Rise of East India Company in Bengal—বিরাট বই। মোট কথা, এই মহাপণ্ডিতের সঙ্গে প্রাতে বেড়াবার সময়ে বহু কথা শুনতাম। একদিন বললেন, এই যে গিরিশৃঙ্গের নামকরণ হয়েছে জরিপ

বিভাগের সাহেব অধ্যক্ষ এভারেস্টের নামে, আসলে এই জরিপ কাজের জন্য দায়ী ছিলেন রাধানাথ শিকদার। আমরা যাকে এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ বলি, এভারেস্টের দেশী নাম 'চোমাকংকরা' আর তিব্বতী নাম 'কাংরু রুমপছিপ' (অতি পবিত্র তুষার), যার দুর্গমতা আরোহণ নিয়ে এত কথা শুনে আসছি, সেইটি জর্জ এভারেস্ট-এর (১৭৯০-১৮৬৬) নামানুসারে হয়েছে। ইনি ছিলেন সারভেয়ার জেনারেল অব ইণ্ডিয়া। ব্রিটিশরা ভারতের কুমারিকা অন্তরীপ থেকে হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত তাদের উচ্চতা নিম্নতা সমতলতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাপন কাজ শুরু করে। তখন হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গগুলির নামকরণ হয়নি—Peak এক দুই ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হতো। এভারেস্টকে বলা হতো P. X. V.। অনেকে ভুল করে এভারেস্টকে 'গৌরীশঙ্কর' বলেন, আসলে গৌরীশৃঙ্গ এভারেস্ট থেকে ৪০ মাইল দূরে। তাকে বলা হয় পীক P. X. X. বা বিশ নম্বর। উচ্চতার মাপন করা হয় দূর থেকে বৈজ্ঞানিক ত্রিকোণমিতিক মাপনের সাহায্যে। চার পাঁচ ছয়টি স্থান থেকে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতার মাপ চলে। একে বলে কমপুটিশন। রাধানাথ শিকদার এই বিভাগের প্রধান ছিলেন। দেরাদুনে ছিল অফিস। পরে হেড অফিস কলকাতায় তিনি আসেন। তার আগে তিনি কমপিউটারের পদ থেকে ওপরে উঠে যান। পীক ১৫-এর নূতন নামকরণ হয় ১৮৫২ সালে এভারেস্ট সাহেবের অবসর গ্রহণের ৯ বৎসর পরে (১৮৪৩)। রাধানাথ এই গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা মেপেছিলেন, এই কথাটা বোধ হয় এলাহাবাদে মেজর বামনদাস বসু তোলেন এবং তাঁরই প্রেরণায় মডার্ন রিভিউ, প্রবাসীতে যোগেশচন্দ্র বাগল প্রবন্ধ লিখে রাধানাথকে আবিষ্কারক বলেন; কিন্তু তাঁরও সন্দেহ ছিল। শ্রীসুকুমার বসু তাঁর রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত 'হিমালয়' গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ গ্রন্থ পড়লে হিমালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

দার্জিলিঙে আর একজনের ভ্রমণসহায় হই, তিনি প্রকাশচন্দ্র রায়, বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা। ইনি নববিধান সমাজের অতি নিষ্ঠাবান ভক্ত। তিনি বেড়াতে এসেছিলেন দার্জিলিঙে। তাঁকে দেখেছি গিরিধিতে একবার খ্রীষ্ট উৎসবের সময়। সেকালের বিখ্যাত জুয়েলার অমৃত ঘোষের বাড়িতে উঠেছিলেন। সেখানে উপাসনায় যেতাম, দেখতাম প্রকাশচন্দ্র যেন কোন অদৃশ্য দেবতার সঙ্গে কথা বলছেন। সে তো মামুলী উপাসনা নয়। একদিন সকালে ম্যালে তাঁর সঙ্গে বেড়াচ্ছি, বললেন, 'বাসায় গিয়ে স্নান করবো।' আমি শুধোলাম, এত সকালে স্নান করবেন? এখন তো বেশ ঠাণ্ডা। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখো বাড়িতে একটি স্নানাগার, সকলেই বেলা হলে স্নান করতে যান। আমি বৃদ্ধ

মানুষ, আমি যদি তখন ভিড় করি, তবে অন্যদের অসুবিধা হবে। তাই সকালেই স্নান করি।' এই সামান্য কথাটি মনের মধ্যে গেঁথে গেল, অন্যের অসুবিধা হয় এমন কিছু করতে নেই। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে রামমোহন রচিত 'তুহ্ ফত্-উল-মুওয়াহিদ্দিন্' গ্রন্থে হাফিজের উক্তি—'কারো অনিষ্টের চেষ্টা করো না, আর যা খুশি তাই করো'।

প্রথমবার যেবার দার্জিলিঙ যাই, সেবার যাই কার্ট রোডের নিচে শরৎচন্দ্র দাসের বাড়িতে। দ্বিতীয়বার সে বাড়ি ধ্বসে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। লোকে বলতো পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কেন এই মহাপণ্ডিতের প্রতি লোকের এ মনোভাব তা তবে বলি। দার্জিলিঙ তিব্বতের সঙ্গে শরৎচন্দ্র দাসের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান চট্টগ্রাম, এঁর ভ্রাতা নবীনচন্দ্র কালিদাসের কবিতার অনুবাদ করে যশস্বী হন। শরৎচন্দ্র দার্জিলিঙে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের তিব্বতী ভাষার শিক্ষকের কাছ থেকে তিব্বতী ভাষা শিখলেন খুব ভাল করে। সেকালে (আজকালও) তিব্বত ছিল নিষিদ্ধ দেশ—forbidden land। কোন বিদেশী, বিশেষ করে ব্রিটিশ ও তাদের আশ্রিত লোকদের প্রবেশ নিষেধ, ফলে ভারতীয়দের পক্ষেও সে দেশ নিষিদ্ধ। সরকারী বিদ্যালয়ের তিব্বতী শিক্ষকের সহায়তায় শরৎচন্দ্র তিব্বতে প্রবেশ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশ সরকারকে দেন; আর নিজেও জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করে আনেন, তিব্বতী পুঁথি সংগ্রহ করে। তিব্বত ছিল বৌদ্ধ লামাদের রাজ্য, দালাই লামা থাকেন লাহ্সায় পোতল দুর্গপ্রাসাদে আর পঞ্চম লামা থাকেন গিয়াংছে, তাঁর প্রাসাদ তাসিলাম্পো। অনেকটা ইংলণ্ডের Archbishop of Canterbery ও Arch of York-এর মতো। দুইজনে আর্চ-বিশপ হলেও, কেনটারবেরির স্থান উচ্চে, তেমনি ক্ষমতা দালাই লামার। হাজার হাজার অলস লামা এই পোতলে ও তাসিলাম্পে বাস করতো। জনতার শোষিত ধনে তারা হত পুষ্ট। যাই হোক, শরৎচন্দ্র বহু তথ্য সংগ্রহ করে আনেন যা ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক ব্যাপারে কাজে লাগে। কিন্তু তাঁর অক্ষয় কীর্তি তিব্বতী ভাষার অভিধান। শরৎচন্দ্রের বাড়ি দেখতে যাই সেই জন্য।

আর একদিন বেড়াতে বেড়াতে যাই শোমেদ কোরশির (Csoma Korosi) সমাধিস্থান দেখতে।

কবরটি কেন দেখতে গেলাম তা বন্ধুরা জানতেন না। বললাম, এই হাঙ্গেরিয়ান ভ্রমণকারী ভাষাবিদ মধ্য এশিয়া পার হয়ে তিব্বতে আসেন ও সেখানে এক বৌদ্ধ মঠে চার বৎসর (১৮২৭-৩০) কাল থেকে তিব্বতী ভাষা খুবই ভাল

করে শিক্ষা করেন। তিনি এসেছিলেন হাঙ্গেরিয়ান বা ম্যাজিয়ার জাতির আদি নিবাস কোথায় তার উৎস সন্ধানে। কারণ ম্যাজিয়ার বা হাঙ্গেরিয়ানরা তো ঠিক য়ুরোপীয় নয়, তাদের ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয় নয়। তাই তাদের আদি নিবাস সন্ধান-প্রয়াস! তিব্বত ছিল না-জানা দেশ, তাই পণ্ডিতরা ভাবতেন ওখানে অনেক রহস্য আছে। কিন্তু তিব্বতে এসে ভাষা, বৌদ্ধধর্ম ভাল করে অবগত হলেন। তিনি তিব্বত থেকে বহু পুঁথিপত্র নিয়ে দার্জিলিঙ হয়ে কলকাতায় আসেন সেই রেলপথহীন যুগে। কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ পেলেন এবং গবেষণার পরিবেশ পেলেন। তিনি ১৮৩৪ সালে তিব্বতী ইংরাজিতে অভিধান ও তিব্বতী ব্যাকরণ লেখেন। এ ছাড়া তিব্বতী বৌদ্ধ ত্রিপিটক যাকে কাংজুর ও তাংজুর বলে, তার মধ্যে শাস্ত্রীয় অংশ বা কেঙজুরের একটি সংক্ষিপ্ত সূচী ইংরেজীতে প্রকাশ করেন 'Asiatic Research' পত্রিকায়। বহু বৎসর কেঙজুর সম্বন্ধে জ্ঞান সীমিত ছিল এই গ্রন্থের মধ্যে, ফ্রান্সের Musue Guimet-এর Annales-এ Korosi এই বিরাট বিশ্লেষণটি অনূদিত হয়, অবশ্য কিছু সংযোগ অনুবাদক করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে হাঙ্গেরিয়ান সরকার তাঁকে একটা পেনসন দেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি বহু গ্রন্থ ক্রয় করেন। সে সব এখন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। কোরোসি আর একবার তিব্বতে যাবার জন্য কলকাতা থেকে যাত্রা করে এই দার্জিলিঙে আসেন কিন্তু সেখানে যাওয়া হ'ল না, এখানেই কলেরায় মারা গেলেন ৩০ মার্চ ১৮৪২ সালে।

দার্জিলিঙে আমাদের সন্ধ্যার সময় কাটতো কার্ট রোডের ওপর অবস্থিত ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের বাড়িতে। হেমলতা দেবী ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা —মহারাণী স্কুলের প্রাণস্বরূপা। ছোট বসবার ঘরটিতে সন্ধ্যার পর গান আলোচনাদি আপনি জমে উঠতো। এই বাড়িটি ছিল শিক্ষিত বাঙালীদের যেন ক্লাব।

স্যানেটোরিয়ামে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গান-বাজনা-জলসা হতো—নানা স্থান থেকে লোক আসতেন। তাঁদের মধ্যে গানের রসজ্ঞও থাকতেন। মনে আছে গান হচ্ছে, তবলা বাজাচ্ছেন মৈমনসিংহের কেশব চৌধুরী। মুদ্রাদোষ-হীন, আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গী। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল পূর্বে দুই ওস্তাদ আসেন গান শেখাবার জন্য। হয়তো তাঁরা গুণী, কিন্তু যখন তানপুরা নিয়ে একটা হাঁটু এগিয়ে দিয়ে আর একটা আধমোড়া পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে বিকট মুখ-ব্যাদান করে 'ভরবাতে উঠি আলবেলি' গান করতেন, তখন গান শুনবো না তাঁর অঙ্গভঙ্গি দেখে হাস্য সংবরণ করবো—এটিই হতো প্রশ্ন। ভাগ্যক্রমে তাঁরা থাকেন

নি আশ্রমে।

দার্জিলিঙ থেকে ফেরবার সময় পথে জলপাইগুড়িতে নামলাম। পূর্বেই বলেছি, পাহাড়ে যাবার সময়ে স্থির করেছিলাম ফেরবার পথে নামবো। শুনেছি বাংলা দেশের মধ্যে মফঃস্বলে এমন ধনী শহর আর ছিল না—সেখানকার সবাই চায়ের কারবারের অংশীদার। আর তখন চায়ের অংশের বিরাট লাভ। কিন্তু শহরের মাঝ দিয়ে কী নোংরা নদী বয়ে যাচ্ছে—কচুরিপানায় ভরা! নদীর ধারে ধারে ঘুরতে ঘুরতে মনে হলো—বাঁধ যদি কোনদিন ভাঙে, তবে শহরের কি দশা হবে! কদিন থাকলাম নরেন্দ্রের বাড়িতে—তিস্তার তীর পর্যন্ত চলে এলাম—ধু ধু করছে বালুর চর। শুনি বর্ষাকালে এই তিস্তায় প্রলয়ঙ্করী বান আসে। পরে ১৯৬১ সালে জলপাইগুড়ি ভাল করে দেখেছিলাম। তখন সেখানে যাই সম্মানিত অতিথি হয়ে। থাক সে কথা। পাহাড় থেকে দুই মাস পরে ফিরলাম। সেই সারা-দামুদিয়া পার হয়ে। তবে এবার সকালে এলাম। তাই অনেক কিছু দেখতে পেলাম। সেতু নির্মাণের আয়োজন চলছে। স্তূপীকৃত পাথর এসেছে, পদ্মার পাড় বাঁধতে হবে।

১৯৩৫-এ যেবার দার্জিলিঙ গেলাম, সেবার শিয়ালদহে উঠে সোজা গিয়ে নামলাম শিলিগুড়ি। বিশ বৎসর পূর্বে যখন যাই, তখন পদ্মার ব্রিজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। নাম হয়েছে বড়লাট হার্ডিঞ্জের নামে—তাঁরই সময়ে বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়ে দুই বঙ্গ জোড়া লেগেছিল। তবে ১৯৩৫ সালের দার্জিলিঙ ভ্রমণের বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখানে যেতে হতো রীতিমতো পাসপোর্ট করে। সিউড়িতে ম্যাজিস্ট্রেটের ছাপ দেওয়া পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হল—এমন কি ছবি তুলিয়েও আঁটতে হয়েছিল। এত ব্যাপার কেন? তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। তখন সন্ত্রাসবাদ শমিত হয়নি। কে বা কারা লেবঙের মিলিটারি কুচকাওয়াজের সময় ছোট লাটবাহাদুরের ওপর বোমা ছোঁড়ে। ফলে বাঙালীরা তো পাহাড়ীদের কাছ থেকে কী মারটা খেলো—নির্বিশেষে! সরকারী ফতোয়া হল, দার্জিলিঙ যেতে হলে বাঙালীর পাসপোর্ট চাই। শিলিগুড়িতে নামলাম, কিন্তু কেউ পাসপোর্ট দেখতে চাইল না। একজন পশ্চিমা সাদা পোশাক পরা লোককে দেখে মনে হল ইনি পুলিসের লোক। তাঁকে শুধোলাম, পাসপোর্ট দেখবেন না? তিনি হেসে বললেন, আপকো খুন ঠাণ্ডা হো গিয়া।

স্যানেটেরিয়াম খালি। তাই এক ঘরে শুই, এক ঘরে বইপত্র ছড়িয়ে লেখাপড়া করি, লিখছি পৃথিবীর ইতিহাস—সঙ্গে এনেছিলাম অনেক বই। সে বই

বহু বৎসর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের অপরাংশে অর্থাৎ আধুনিক জগতের কথা লেখা পাণ্ডুলিপি ছাপতে গিয়েছে।

দার্জিলিঙ থেকে ফিরছি। এবার অন্য পথে চললাম। পার্বতীপুরে নেমে নামলাম দিনাজপুরে। দিনাজপুরে নামলাম কেন—তার কারণটা বলি। আমার ভগ্নীপতি হীরালালের সুন্দরদা বা প্রফুল্লবাবুর বাড়ি সেখানে। তিনি জেলা বোর্ডের ওভারসিয়ার, কিন্তু সেটা তাঁর পরিচয় নয়—ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, আর শহরের সকল রকম হিতসাধন কর্মের ছিলেন নেতা। তাই সবারই ছিলেন প্রিয়। তিনি একাই ছিলেন—পরিবার তো বোলপুরে আমাদের বাড়ির পাশেই ঘর করে আছেন। দিনাজপুরে এক বেলার মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরে দেখলাম—বুঝলাম মরণমুখী জনপদ! পাশে মরা নদী। শহরে বড় বড় বাড়ি প্রায় জনশূন্য—ম্যালেরিয়ায় লোক উজাড়, নয় পলাতক। প্রফুল্লবাবু সেইজন্য স্ত্রী-কন্যাদের বোলপুরে আমার তত্ত্বাবধানে এক বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাংলাদেশ দিনাজপুর কেমন হয়েছে জানি না।

দিনাজপুর থেকে চললাম কাটিহার হয়ে মনিহারিতে। মনিহারিতে থাকেন প্রফুল্লবাবুর কন্যা ও জামাতা—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরমোহনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে—সুদুর ছোটবেলা থেকে বোলপুরে মানুষ। তার বিয়েতে যেতে পারিনি, তাই এবার তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে দেখতে এলাম। সত্যচরণ বাবুর পুত্র বলাইচাঁদ 'বনফুল' নামে সাহিত্যজগতে সুপরিচিত আজ। তখন তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক—ভাগলপুরের ডাক্তার। প্রফুল্লবাবুর জামাইও ডাক্তার জেলা বোর্ডের। এঁরা চাষবাস করেন। সর্বত্র এক দিনের সফর।

ফিরতে হল মনিহারী ঘাট স্টেশনে এসে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে সকরিগলি ঘাটে নেমে লুপ লাইনের ট্রেন ধরে।

পথে দৌরাত্ম্য করা বোধ হয় আমার স্বভাব—দৌরাত্ম্য বলা যায় না, আইন-সঙ্গতভাবে রেলপথযাত্রীরূপে কতকগুলি মৌলিক অধিকার নিশ্চয়ই আছে, কাটিহার স্টেশন থেকে যে গাড়ি মনিহারি ঘাটে আসবে সে ট্রেন এল, দেখি ট্রেনের ভিতর সাফ হয়নি বোধ হয় যুগকাল। হৈচৈ আরম্ভ করি, ট্রেন-এগজামিনার এলেন জমাদার নিয়ে—ঘর সাফ করিয়ে তাঁকে রেহাই দিলাম। রেলযাত্রীরা ন্যায়-সঙ্গত দাবি করতে পারেন, তবে তাই বলে যেখানে সেখানে চেন টেনে ট্রেন থেকে নামবার অধিকার তাঁদের নেই বা বিনা ভাড়ায় গাড়িতে চড়তে দিতে পারা যায় না।

পুনরায় পূর্ববঙ্গে

আর একবার পূর্ববঙ্গ সফরে যাই—তবে এবার ঢাকা নয়—এবার চলেছি চাঁদপুর ও চট্টগ্রামের দিকে। মনে পড়ছে ছোটবেলায় রাণাঘাট স্টেশন দিয়ে যেতো দার্জিলিঙ মেল ও চিটাগাং মেল। সেকালে দুই ট্রেনই সিধে যেতে পারতো না—দার্জিলিং মেলকে থামতে হতো সারাঘাটে—পদ্মা পার হয়ে দামুদিয়া স্টেশনে অন্য গাড়িতে উঠতে হতো। চিটাগাং মেলও গোয়ালন্দে গিয়ে থামতো, তারপর সেখান থেকে স্টীমারে চাঁদপুর বন্দরে নেমে চিটাগাং মেল ধরতে হতো। এবার গোয়ালন্দ থেকে পদ্মা ধরে যাবার সময়ে রাজাগড়ির মঠ দেখতে পেলাম না, যা গত কয়েক বৎসর পূর্বে দেখেছিলাম—পদ্মা তাকে গ্রাস করেছে।

চাঁদপুর বিরাট বন্দর ; বহু জায়গায় স্টীমার যায়, পাটের বড় কারবারের ক্ষেত্র। ত্রিপুরা জেলার (কুমিল্লা) মহকুমা শহর। চাঁদপুরে এসে উঠি আমাদের এক ছাত্রের বাড়ি—প্রতাপ তার নাম। খুব দুষ্টু বলে অভিভাবকরা তাকে শান্তিনিকেতনে রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতনের নাম ছিল বাইরে 'রিফর্মেটারী'—তার কারণ, সাধারণ চঞ্চল ছেলেমেয়ে অভিভাবকদের কাছে 'বদমায়েশ'। "মশায়, সারাদিন হৈ-চৈ করে, পড়ায় বসে না, তাই তো এখানে দিচ্ছি।"—একথা প্রায়ই শুনতাম। প্রতাপের দাদা সম্ভবতঃ স্টীমার কোম্পানী কিংবা পাট অফিসে কাজ করতেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হলে জানতে পারলাম, প্রতাপের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। তারা খুব খুশি। বাইরের ঘরে শোবার ব্যবস্থা হলো—টিনের ছাদ, চাঁচের দেওয়াল কাদা দিয়ে ছিটের বেড়া করে চুনকাম করা। একদিন দুপুরে শুনি বাড়ির ভেতর মেয়েরা গান করছে। শুনলাম তার বৌদিদি বিয়ের পর দ্বিতীয়বার এসেছেন তাই এ 'দ্বিরাগমন' উৎসব। এটা একেবারে মেয়েলী উৎসব—মেয়েরা বৌকে ঘিরে গান করে, এবং শুনেছি নাচেও সব। বধূ প্রথম রজঃস্বলা হলেও তাকে নিয়ে এ উৎসব হয়, তখন যেসব গান হয় তা শ্লীলতা রক্ষা করে না। এ কি tribal যুগের কথা স্মরণ করায় ?

চাঁদপুরের কাছে বাবুরহাট ; খুব বড় গ্রাম। সেখানে পরিচিত ছিলেন যজ্ঞেশ্বর মজুমদার—পরে হন ভায়রাভাই। ইনি কলকাতায় থাকতেন বিনোদবাবুর বাড়িতে—ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। বিনোদদার বাড়িতেই যজ্ঞেশ্বরকে দেখি—থাকতেন ছেলের মতো। 'উপাসনা'-শীল, ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এই যজ্ঞেশ্বর বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর বিশ্বাসকে অটুট রেখেছেন। একদিন বাবুরহাটে তাঁদের বাড়ি যাই—পূর্ববঙ্গের মজুমদারদের অবস্থা ভালোই ছিল—পাকা বাড়ি, পুকুর, বাগান, খেত-খামার সবই দেখলাম। চারদিকে মাঠ ধু ধু করছে। সেই মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচা পথ বেয়ে কিছুদূর গেলে বাবুরহাট হাইস্কুল। সেখানকার প্রধান শিক্ষক সারদাপ্রসন্ন দত্ত ছিলেন সেকালের নামজাদা শিক্ষক—জামতাড়া স্কুলের কেশব-হাজারী, আসানসোলের হরিদাস গোস্বামীর মতো। স্কুল দেখলাম—দেখালেন সারদাবাবু। টিনের ঘর অনেকগুলি। শুনলাম গ্রাম্য দলাদলিতে একবার স্কুল পুড়ে যায়। এ রকম ঘটনা নাকি প্রায়ই হতো পূর্ববঙ্গে, কিছুকাল পূর্বে কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয় কে বা কারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাবুরহাট স্কুলে ছাত্রদের কাছে কিছু বলতে হয়েছিল। কি বলেছিলাম ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভবত: শান্তিনিকেতনে জীবনধারার চিত্র দিয়েছিলাম। এই সারদাপ্রসন্নের পুত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বভারতীতে ইংরেজীর অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বর্তমানে অনেকের নিকটই সু-পরিচিত।

চাঁদপুরে এলাম। কালীমোহনদা তখন সেখানে এসেছেন ঢাকা থেকে। উঠেছেন তাঁর শ্বশুর দীননাথবাবুর বাড়িতে। চাঁদপুরের নেতা হরদয়াল নাগের সঙ্গে দেখা করি। হরদয়াল দেশসেবক, চিরদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হয়েছিলাম।

কালীমোহনদা বললেন—"প্রভাত, যাবে আমাদের বাড়ি?—বাজাপ্তি?" বললাম—"ঘুরতেই তো বের হয়েছি, যাবো না কেন?" চাঁদপুরের থেকে স্টীমারে চড়ে নরসিংডি বলে গ্রামের ঘাটে নামলাম। সেটা একটা বড় গঞ্জ—মেঘনার উপর। মেঘনার রূপ দেখলাম এতোদিনে; গঙ্গা দেখেছি, পদ্মা দেখেছি, মেঘনা দেখলাম—এতো জল কোথা থেকে আসছে! কী বিশাল! তার উপর দিয়ে ছোট ছোট পানসি নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে পাল তুলে। নদীঘাটের স্টেশনে নেমে জলকাদার পথ পেরিয়ে কালীমোহনদাদের বাড়ি পৌঁছলাম। তাঁর মা, বিধবা ভগ্নী এবং আরো কারা ছিলেন মনে নেই। কালীমোহনদার মা-র বাঙাল কথা অর্ধেক বুঝতাম না, তবু এটুকু বুঝলাম যে আমার মা ও দাদা গিরিধিতে কালীমোহনদাকে তাঁর অসুখের সময় সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তার জন্য কতো কী বললেন—"ওই কালীই একমাত্র সম্বল—বড় ছেলে তো মরেই গেছে কতোকাল" ইত্যাদি।

কালীমোহনদার সঙ্গে কী ভাবে পরিচয় হলো তা এখানে বলে রাখি। তখন

আমরা গিরিধিতে থাকি। পুজোর ছুটিতে সেখানে আছি। একদিন সন্ধ্যায় গলায় মাফলার জড়ানো ক্ষীণকায় সুন্দর এক যুবক একটা খালি কুঁজো হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন—"একটু খাবার জল দিতে পারেন?" মা দরজা খুলে দেখেন একটি শীর্ণকায় যুবক দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায়। মা দাদাকে জল দিয়ে আসতে বললেন। তার পরদিন তার খোঁজখবর নেওয়া হ'লো। সামনের একটা পোড়ো বাড়িতে উঠেছে। মা দাদাকে বললেন—"ওখানে থাকলে তো ঠাণ্ডায় মারা যাবে। কে দেখবে ওখানে। তুমি ওকে এখানে এনে রাখো।" তাই হলো। কালীমোহনদা এসে ওঠেন আমাদের বাড়ি। তখন দাদা স্কুলের নিচের মহলের শিক্ষক, সারাদিন ছেলে পড়িয়ে টাকা রোজগার করেন, তাতেই সংসার চলে, তার মধ্যেও একটি অসুস্থ ছেলেকে আশ্রয় দিতে বাধেনি আমাদের। এখানে থাকতে থাকতে কালীমোহনদার শরীর ভালো হয়। এবং গিরিধি ব্রাহ্ম-সমাজে ডাঃ বিপিনচন্দ্র রায়ের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমাদের বাড়ি থেকেই সব ব্যবস্থা হয়। বুঝলাম সেই সব পুরানো কথাই তাঁর মা বলে গেছেন বাঙাল ভাষায়।

বাজাপুর গ্রাম ছোট। তার পাশে বড় গ্রাম হরিনা; সেখানে বেড়াতে যাই। এক ধনী জোতদারের বাড়িতে উঠি—খুব আপ্যায়ন করলেন। বিরাট খড়ের চালওয়ালা বাড়ি, তবে এ খড় ধানের বিচালি নয়, ছন্ দিয়ে ছাওয়া। ছন্-ঘাস এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে আসছে নদীর চরে; তাছাড়া ছনের ঘর করার রেওয়াজও যাচ্ছে কমে। এই ঘরের ভিতরে চালে দেখি শীতলপাটির আস্তরণ—বারান্দায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে সুন্দর করা হয়েছে, কাঠের খুঁটি কুঁদে কাটা প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় তক্তপোষ পাতা, তার উপর শীতলপাটি বিছানো—কী সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ সে-পাটির। গৃহস্বামী পরম বৈষ্ণব। জপ করছেন মালা ঘুরিয়ে, কিন্তু দৃষ্টি পড়ে আছে সব দিকে—কোথায় গরু ঢুকছে, কে এলো, কে গেল—সব খবর রাখছেন তিনি। একজনকে দেখেই মালা জপতে-জপতে সুদের টাকা পাননি বলে লোকটাকে হেনস্তা করছেন আছোলা ভাষায়। এ ধরনের লোক গ্রামকে শাসন ও শোষণ দুই করতো; কালে শাসনটা গিয়ে পড়ে থানার দারোগার উপর, আর শোষণ যন্ত্রটা সহস্রবাহু হয়ে বিস্তারলাভ করে চলে—যার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা পূর্ববঙ্গছাড়া হয়েছিল।

এই গ্রামে প্যারীবাবুর বাড়ি। ইনিও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। তাঁরা সাধারণ গৃহস্থ, তাঁদের ঘরদুয়ারও দেখে এলাম। ত্রিপুরার এসব গ্রাম আর আমাদের বীরভূমের গ্রাম—কতো তফাত এই দুয়ের মধ্যে। শস্যশ্যামল দেশ পূর্ববঙ্গ।

এ দেশের রূপ দেখেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'সোনার বাংলা' গান—সত্যই স্বর্ণভূমি পূর্ববঙ্গ।

চাঁদপুর থেকে আসাম স্টীমারে চলেছি সিলেট। এই স্টীমারকে বলতো 'কাছাড় ডেসপ্যাচ'—মেঘনা, কুশিয়াড়া, সুরমা নদী বেয়ে যেতো শিলচর পর্যন্ত। বলা বাহুল্য ডেকযাত্রী আমি—রাত কাটলো এখানেই। সকালবেলায় দেখি ভৈরব বাজারে স্টীমার থেমেছে। কী বড় গঞ্জ! কতো জিনিস উঠছে নামছে। বস্তা বস্তা লঙ্কা নামছে। ডেকের উপর বসেও লঙ্কার তীব্র ঝাঁঝ পেয়ে তার প্রতিক্রিয়ায় যা হবার তা বহুক্ষণ ঘটে চলে। এসব আসছে চট্টগ্রাম থেকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে স্টীমার থেমে রইল। ওপারে আশুগঞ্জ। এখন আশুগঞ্জ ভৈরব বাজারের মধ্যে সেতু নির্মিত হয়েছে।

পরদিন পৌঁছলাম মারকুলি; পথে আজমিরিগঞ্জ পার হলাম। আরও কত বন্দর-স্টেশন! মারকুলিতে নামতে হয়। স্টীমার সুরমা নদী বেয়ে চলে গেল করিমগঞ্জ শিলচরের দিকে। মারকুলি ছোট ঘাট। গ্রাম আছে দূরে—কারা সেখানে বাস করে জানিনে। তবে সবই বাঙালী—হয় হিন্দু, নয় মুসলমান। এতোকাল তারা পাকিস্তানী বলে আত্মপরিচয় দিতো, এখন বলছে বাঙালী। মারকুলির একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম। ছনের ঘর, ছনের বেড়া, মাটির মেঝে। সীমানায় বাখারি দিয়ে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মালিক। দু-একটা ফুলের গাছ দিয়েছিলেন এককালে। যাত্রী খুব কম। পরিচয় হতে সময় লাগলো না, বিশেষভাবে আমারই বয়সী একটি ছেলের সঙ্গে। সে সুনামগঞ্জে যাবে। সুনামগঞ্জের নাম জানতাম। হিমাংশুবাবুর পিতা কৃষ্ণদয়ালবাবু এখানকার উকিল ছিলেন। সুনামগঞ্জের ছেলেটির সঙ্গে নদীতে স্নান করলাম—একলা ঐ রাক্ষুসে নদীতে কখনোই নামতাম না, তা-ছাড়া সাঁতারও জানিনে। কাপড়টা বেড়ায় মেলে দিয়ে একটা চাদর লুঙ্গির মতো করে পরে নিলাম, তার পর দুজনে বেড়াতে চললাম গ্রামের দিকে। যেতে যেতে সামনে দেখি একটা সরু খাল. তাতে কয়েকটি নৌকা। নৌকায় বোঝাই হাঁড়ি, পাতিল নানা আকারের। মাঝিদের শুধিয়ে জানলাম তারা আসছে নারাণগঞ্জ থেকে। মাঝিদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা বলছি, এই মালপত্র কি দামে কিনেছে, কি দামে বিক্রী করবে ইত্যাদি। লোকের সঙ্গে কথাবার্তা না বললে তো দেশকে জানা যায় না—পড়েছি বইয়ে। তাই তাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। এমন সময় সুনামগঞ্জের বন্ধুটি বললে, "এখান থেকে চলি আমরা"—বলেই

আমাকে নিয়ে হনহনিয়ে চলে এলো। আমি তাকে শুধোই—"ব্যাপার কি? এমন তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন? বেশ তো কথাবার্তা হচ্ছিল।" সে বললে—"আপনার কথা তো এ-দেশের মতো নয়, ওরা ভাবছিলো আমরা আড়কাটি—আসামের চা-বাগানের কুলি সংগ্রহ করবার জন্য ঘুরচি।" খুব আক্কেল হলো। ডন্‌কুইকসোটের দশা হতো আর একটু হলেই। কামরূপ কামাখ্যা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যেরূপ ধারণা ছিল, কাছাড় সম্বন্ধেও সেরকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতাম। শুনতাম সেখানে চায়ের বাগিচায় লোকে কুলি হয়ে যায়—আড়কাটিরা লোকদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের রামপুরহাট ছিল সাঁওতাল-পরগণা থেকে ফুসলে আনা 'কুলি'দের কেন্দ্র। সাঁওতাল-পরগণার মধ্যে রেলপথ যায়নি এখনো; হাঁটাপথে কুলি সংগ্রহ করে আড়কাটিরা রামপুরহাটে জমায়েত করতো। এ সব তদারক করবার জন্য এখানকার মহকুমা হাকিম সর্বদাই সাহেব আই. সি. এস. থাকতেন—সদরে হয়তো দেশী ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। আসামের ব্রিটিশ চা-বাগিচাওয়ালাদের স্বার্থ দেখতে হবে—ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরাই সে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। সে কাল এখন আর নেই।

সুনামগঞ্জের পুরাতন কথা বন্ধুটি বললো: প্রাচীনকালে লাউড় নামে রাজ্য ছিল। এই সুনামগঞ্জের কাছে নবগ্রাম অদ্বৈত মহাপ্রভুর জন্মস্থান। গল্প আছে অদ্বৈত তাঁর মায়ের তীর্থস্নানের জন্য সমস্ত তীর্থবারি লাউড়ের পাহাড়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন—তাই সে তীর্থের নাম 'পণাতীর্থ'। আমি বললাম—"বইয়ে পড়েছি বর্মাদেশের প্রাচীন রাজধানী মান্দালয়ে 'পণা' ব্রাহ্মণ আছে। তারা একটা উপজাতি—ব্রাহ্মণ মনে হয়। তাদের তীর্থও হতে পারে।" সহযাত্রী একজন বললেন—"চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এইরকম সর্ব দেবতাদের তীর্থস্থান কল্পিত হয়েছে। তীর্থের পাণ্ডারা কতো কি সৃষ্টি করেছে মানুষকে ভোলাবার জন্য।"

মারকুলির ঘাটে ফিরলাম। হোটেলের যাত্রীরা 'তথ্য-সংগ্রহে'র ব্যাপারটা শুনে খুব হাসাহাসি করলেন। খেতে বসেছি। পাশের ভদ্রলোকটি খাচ্ছেন বোরো চালের ভাত। আমি বললাম—"বোরো ধানের নাম শুনেছি, কখনো খাইনি—আমাকে ওই ভাত দিন তো।" পাশের ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বললেন—"হয়েছে, কখনো খাননি যখন তখন আর পথে বের হয়ে বোরো চালের ভাত না-খেলেও চলবে। ওটা দেশে ফিরে খাবেন। পথে নয়।" তারপর হোটেলওয়ালাকে বললেন—"ওঁকে ভালো চালের ভাত দাও।" সেই অপরিচিত লোকটির প্রীতির কথা আজও ভুলিনি।

সিলেট-গামী স্টীমার এলো। উঠলাম সবাই। ভিড় নেই। নূতন-নূতন

দেশ দেখতে দেখতে চলেছি।

সিলেটে ছিলাম নদীর ধারে। কাদের বাসায় মনে নেই। 'শয়নং যত্রতত্র, ভোজনং হট্টমন্দিরে' করবার মনোভাব না নিয়ে বিদেশে বের হতে নেই। সে সময় আমার যৌবনকাল, চেহারাটাও মন্দ ছিল না—তাই বন্ধুও জুটে যেতো, আতিথ্য পেতে অসুবিধা হতো না। তাছাড়া তখন খাদ্যাভাব হয়নি আজকাল-কার মতো। পূর্ববঙ্গের লোকেরাও ছিল অতিথি-বৎসল। এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত ভোগলালসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; ভাগ করে ভোগ করব না, ভোগের ভাগীদারকে সহ্য করবো না—তাই আজ বিপ্লব চারদিকে।

সিলেটে সব চেয়ে ভালো লেগেছে নদীর তীরটি। রাস্তা গিয়েছে নদীর ধারে ধারে—ঢাকার বাকল্যাণ্ড বাঁধের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সেখানে বাঁধের উপরে ছিল বড় বড় ইমারত—ঢাকার নবাবের 'মঞ্জিল' ও আরও সরকারী ঘর-বাড়ি। সিলেটে সে-সময় ইমারত ছিল না। এমন কি মুরারীচাঁদ কলেজ পাকা ইমারত নয়, বাঁশের ছাউনি, মুলিবাঁশ চিরে চিরে করা। কলেজ ছিল বাজারের কাছে—নদী থেকে খুব দূরে নয়।

সিলেটের মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ ও গণিতের অধ্যাপক অপূর্ব দত্তের সঙ্গে দেখা করি। তিনি বিলাতফেরত। গণিতশাস্ত্রে এবং জ্যোতির্বিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা "আকাশের কথা" পড়েছিলাম। বইটা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত—পুরোনো কালের অনেক বইয়ের মতোই এ বইয়ের সন্ধান কেউ রাখে না। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত উল্লেখ্য গ্রন্থ এই "আকাশের কথা"। অপূর্ব দত্ত মশাই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন বলে সরকারী মহলে তেমন আমল পাননি। এঁরই কনিষ্ঠ পুত্র নীরেন্দ্র দত্ত গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। এবং বঙ্গচ্ছেদ হওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তানে আত্রাইতে জনকল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অপূর্ব দত্তের কন্যা ইলা বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের ছাত্রী—১৯৩১ সালে গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। এই পরিবারের মধ্যে যে দেশপ্রীতি দেখেছিলাম, মনে হয় তা অপূর্ববাবুর কাছ থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পরে পুনরায় যখন সিলেট যাই, তখন অপূর্ববাবুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। অপূর্ববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক অবিনাশ দত্ত ঢাকায় ছিলেন। তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার বিশ্ব-ভারতীকে দান করার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বাধার জন্য সে-দান আমাদের কাছে পৌঁছল না—সে গ্রন্থাগার কি এখন আর আছে—কে জানে!

অপূর্ববাবুর অন্য এক কন্যা জয়া বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের বিখ্যাত অধ্যাপক গায়ক বীরেন্দ্রকুমার পালিতের স্ত্রী—এখন তাঁরা শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা।

সিলেটের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখলাম একের পর এক। বীরেন দাশগুপ্ত নামে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়। দু'জনে ঘুরে বেড়াই। 'দুর্গাবাড়ি' দেখতে যাই। উঁচু-নিচু জায়গা চারদিকে। শুনলাম এখানে মুরারীচাঁদ কলেজ উঠে আসবে। সেখান থেকে ফিরছি। পথে এলো বৃষ্টি—পূর্ববঙ্গের বৃষ্টি, আকাশ-ভাঙা জল। দুজনে চলেছি ভিজতে ভিজতে—খুব মজা লাগছে। এরকম ভাবে শান্তিনিকেতনে তো বৃষ্টিতে অনেক ভিজেছি। জানি চলতে থাকলে ঠাণ্ডা লাগে না। পথের ধারের একটা বাড়ি থেকে একজন মহিলা ডেকে বললেন—"বাবা, তোমরা ভিজছ কেন; দাঁড়িয়ে যাও না।" বললাম—"মা, বেড়াতে বের হয়েছি। ভিজবার জন্যই ভিজছি, বাড়িতে গিয়ে শুকনো কাপড় পরবো।"

আর একদিন দেখতে গেলাম শাহজালালের দরগা। শাহজালালের জন্মভূমি আরাবিয়ার য়েমন দেশ। তিনি কুরেশী বংশের খানদানী মানুষ। কিন্তু ধর্মে মন যায় এবং গুরুর আদেশে ধর্মপ্রচারে বের হন। তখন গুরু তাঁর হাতে এমন এক দেশের মাটি তুলে দিয়ে বললেন, "যে দেশে এ মাটি পাবে, সেখানে বসবাস করবে। ইসলামের কথা প্রচার করবে।"

তিনি আসেন সিলেট। লাউড়ের রাজা গৌরগোবিন্দের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। গৌরগোবিন্দ পরাজিত হলে সিলেট অঞ্চল তাঁর আয়ত্তে আসে। তিনি রাজত্ব করেননি, সাধুজীবন যাপন করেন এখানে। মসজিদ দেখলাম। শাহজালালের দরগায় রয়েছে উটপাখীর এক ডিম; আর দেখলাম তাঁর বিরাট কৃপাণ। পাণ্ডাদের মতো যাঁরা আছেন, তাঁরা যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন। যাক, সাধ্যমত তাদের কিছু দিয়েছিলাম।

নৌকায় সুরমা নদী পার হয়ে সিলেটের অপর পারে গিয়ে ট্রেন ধরলাম। নূতন রেলপথ নির্মিত হচ্ছে। মাইল পনেরো বোধ হয় যেতে হয়েছিল; তারপর নামলাম কুশীয়াড়ী নদীর তীরে। আবার নৌকায় নদী পার হয়ে ফেন্চুনগঞ্জে ট্রেনে চাপি—মাইল পনেরো গিয়ে পেলাম আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন কুলাউড়া। বহুকাল—সিলেট পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ নির্মিত হয়েছে।

কুলাউড়াতে ট্রেন এলো বদরপুর থেকে। একটা খালি কামরায় জায়গা পেলাম। বসে আছি, এমন সময় এক যুবক উঠলেন। পরিচয় হলো। মনু নদী পার হচ্ছি সেতু দিয়ে—যুবকটি বললেন—"এই মনু নদী-তীরে আমার প্রিয়াকে রেখে এসেছিলাম একদিন।" আমাকে সে খবরটা দেওয়া অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক

মনে হলো। তারপর ধরলেন একটা মনগড়া গান—'ঐ নদীর ধারে তাকে চিতায় দিতে এসেছিলাম' ইত্যাদি। মাঝখানে একটা স্টেশনে নামলাম—বোধ হয় সায়েস্তাগঞ্জ। জিজ্ঞেস করলাম—'আপনি আর বিয়ে করেননি?' বললেন —'বিয়ে করতে হয়েছে—মাতৃআজ্ঞায়।' আমার মনে পড়লো উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কথা। আর এখন লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে 'বসন্ত প্রয়াণে'র কথা।

ত্রিপুরা জেলার অনেক শহর-গ্রামের ছেলেরা শান্তিনিকেতনে পড়তো তখন। মনে পড়ছে এখনো—সামসের নগর, শ্রীমঙ্গল, কসবা, কমলাসাগর, নবীনসাগর, কৈলাশহর—আরও কতো গ্রাম। সে-সব স্মৃতি আজ সে দেশে এককালীন বাসিন্দাদের কাছেও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—অধিকাংশই উদ্বাস্তু।

পথে পড়লো আখাউড়া স্টেশন। সেখান থেকে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী মাত্র ছয় মাইল। ভাবলাম ঘুরে যাই না কেন? সোমেন দেববর্মার বাড়ি উঠবো—মনে পড়ে, এই তো সেদিন সবাই মিলে 'মালিনী' নাটক করেছিলাম; নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবো। সবাইকে আপন করবার অদ্ভুত শক্তি ছিল সোমেনের। আমার মাকে দিদিমা বলে বেশ জমিয়েছিল, আমার ছোট দু বোন তাঁকে পছন্দ করতো খুব। তাই ভাবলাম সোমেনের বাড়িতে জায়গা পাবো। তাছাড়া জনেশ ভট্টাচার্যও তো এখানে থাকে—তার বাবা তো রাজকুমারের প্রাইভেট টিউটর।

আখাউড়া নেমে শেয়ারে ঘোড়ারগাড়ি পেলাম। রাস্তাও যেমন—গাড়িও তেমন। পথে লোকজন খুবই কম, দূরে দু পাশে চাষের জমি, দূরে দেখা যায় গ্রাম। ধুলোয় ধুসর হয়ে আগরতলায় পৌঁছলাম।

মহিমচন্দ্র দেববর্মা সোমেনের পিতা, রাজসরকারে বড় কাজ করতেন। তাঁদের বাড়িকে বলতো কর্নেল বাড়ি—সে বাড়ি পেতে অসুবিধা হলো না। বাইরের একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো। বেশ হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাটলো কয়েকটা দিন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানকার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক— সেটা জেনেছিলাম 'রাজর্ষি' পড়াতে গিয়ে। শুনেও ছিলাম রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার এখানে এসেছিলেন। তখন তো ভাবিনি যে আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখবো। সোমেন্দ্র দেখালেন কবি এসে শেষবারে কোথায় ছিলেন—যেবার সাহিত্য সভায় ভাষণ দেন 'দেশীয় রাজ্য'।

বেড়াতে বেড়াতে 'চন্তাই'দের চতুর্দশ দেবতার মন্দির দেখে এলাম। এই দেবতারা হলেন—হর (শঙ্কর), উমা (শঙ্করী), হরি (বিষ্ণু), মা (লক্ষ্মী), বাণী (বাগদেবী), কুমার (কার্তিকেয়), গণপা (গণেশ), বিধি (ব্রহ্মা),

ক্ষ্মা (পৃথিবী), অব্ধি (সমুদ্র), গঙ্গা (ভাগীরথী), শিখী (অগ্নি), কাম (প্রদ্যুম্ন), হিমাদ্রি (হিমালয়)। এই দেবতাদের প্রধান পূজারীর উপাধিই 'চন্তাই'। ইনি দেবালয়ের মহান্ত স্থানীয় ব্যক্তি, অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী। চন্তাই ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ ব্যক্তি তা সহজেই বোঝা যায় এঁদের সৎআচরণাদি, ধর্মীয় ক্রিয়া, ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকার ও অলৌকিক কার্যকলাপের যে কথা জানা যায় তা থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে এঁরা ছিলেন ঋষিতুল্য যোগসাধক।

চন্তাইদের মন্দিরের কাছে একটা নদী আছে, সেটাও দেখতে যাই একদিন। শুনলাম প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অনেক দূরে—তা দেখা হলো না। পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে যতোটা পারা যায় দেখলাম। তাছাড়া আমি এমন কোন্ কেউ-কেটা যে আগরতলার লোকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু দেখাবে। তবুও একদিন জনেশের পিতা আমাকে নিয়ে গেলেন 'রাজপ্রাসাদ' দেখাবার জন্য—চারদিকের ঘরবাড়িও দৈন্যের সঙ্গে খুবই বেমানান। এ-রকম বেমানান দেখে-ছিলাম জয়পুরে, বরোদায়, ভরতপুরে, হায়দ্রাবাদে—ক্ষুদ্র করদরাজ্য ও বৃহত্তম করদরাজ্য উভয়েই যেন এক পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়িয়ে। ত্রিপুরারাজ্যের প্রাসাদের ঘরগুলি ম্যুজিয়ামের মতো সাজানো—প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদের অনুকরণে নাকি! সাধারণতঃ কোনো বিলাতী কোম্পানীর উপর ভার দেওয়া হয় গৃহসজ্জার—তাঁরা যে সব বিলাতী আসবাবপত্র সরবরাহ করেন তার অধিকাংশ যাদুঘরে রাখার মতো জিনিস।

কতো গল্পই না শুনলাম দেশীয় রাজ্যশাসন সম্বন্ধে। 'কালাপানি' পার করে দেওয়া ছিল শাস্তি—অর্থাৎ বৃটিশ-অধিকৃত অংশ ও ত্রিপুরার মাঝে ছিল একটা খাল, সেটার ও-পারে পাঠিয়ে দেওয়ার মানে নির্বাসন। আজ সেখানে পাকিস্তান শুরু হয়েছে,—ত্রিপুরা বঙ্গদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—আকাশ-পথে যাওয়া-আসা ছাড়া পথ নেই। চব্বিশ বছরেও আসামের সঙ্গে রেলের যোগাযোগ হলো না।

সফর তো অনেক হলো। এবারে ফিরতে হবে। ট্রেন সন্ধ্যার পর। ছয় মাইল পথ—কোনো শেয়ারি গাড়ি পাওয়া গেল না, একটা পুরো গাড়ির ভাড়া অনেক। তাই বেলা থাকতেই বের হয়ে পড়লাম ব্যাগ হাতে নিয়ে। একদিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় কাদা হয়েছিল—জুতো অচল, তাই সেটা খুলে বেঁধে নিলাম ছাতায়। ব্যাস্, একাই চললাম। আখাউড়া এসে দোকানে সামান্য কিছু খেলাম। আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে ট্রেনে সারারাত কাটিয়ে ভোরে এসে পৌছলাম চাঁদপুরে।

অর্ধশতাব্দীরও বেশী ব্যবধানে অনেক ছবি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, অনেক

তথ্য গেছে মুছে। তবুও আশ্চর্য হয়ে ভাবি,—কোথা থেকে একের পর এক এসব মনের চোখে ভেসে উঠছে। যেন এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই তরুণ বয়সের চোখে দেখা সে যুগকে যা আর কখনো ফিরবে না। শুনতে পাচ্ছি কতো মানুষের কথা, যারা লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল। স্মৃতিমন্থনে শুধু কথা ভেসে আসে না, রূপটাও ফুটে ওঠে—এ বিস্ময়ের 'অন্ত নাই গো নাই'।

ফিরে ফিরে চাই সেই বাংলাদেশের দিকে যা আর লোকে দেখতে পাবে না। অতীত মুছে গেছে মানুষের স্মৃতি থেকে—এখন নবীন কণ্ঠে নতুন বাংলাদেশের ধ্বনি শুনছি, সেও ও-পার থেকে। সে দেশ আর আমার মর্ত্য-চোখে দেখা হবে না, তবে মানসচক্ষে দেখছি আজকের বাংলাদেশ।

সেবার (১৯১৫) গ্রীষ্মের ছুটিতে চলতে হলো আসাম। আসামের চা বাগানের এক বাঙালী মালিকের ও তেজপুরের উত্তরের এক চা-বাগিচার ডাক্তারের ছেলে ছিল আশ্রমের ছাত্র। এ ছাড়া ছিল গৌহাটির অসমিয়া ছাত্র নরসিং গোসাঁই। বাঙালীর মালিকের নাম বোধ.হয় পাঁচুগোপাল। সেযুগে আসামের চা-বাগিচার মালিক ছিল সাহেবরা—কোনো বাঙালী সেখানে তখনো অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, এই পাঁচুগোপাল মিত্র ছাড়া। দুর্ধর্ষ লোক এই পাঁচুবাবু, বহুবার সাহেবদের সঙ্গে দাঙ্গা হয়েছে, জেলও তারা খাটিয়ে আনে। কিন্তু কিছুতেই জব্দ করতে পারেনি। এই পাঁচু মিত্র চা-বাগিচার পরিবেশ থেকে ছেলেকে দূরে রাখবার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠান—ছেলেটি খুবই প্রাণবন্ত, কিন্তু বেয়াড়া নয়। চঞ্চল প্রাণবন্ত বলে ছেলেটিকে আমার ভালো লাগতো খুব।

শিয়ালদহ থেকে আসাম-মেলে যাত্রা করি। সান্তাহারে ট্রেন বদলিয়ে উঠলাম আসামগামী ট্রেনে—সঙ্গে তিনটি মানবক। এবার পদ্মার উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দিয়ে ট্রেন পার হলো, আর সারা-দামুদিয়ায় ওঠানামা, স্টীমারে পার হওয়া করতে হলো না। আমিনগাঁও পৌঁছলে পাঁচুবাবুর লোক এসে তাঁর ছেলেকে নিয়ে গেলেন। তেজপুরযাত্রী ছাত্র ও গৌহাটির অসমীয়া ছাত্রটিকে নিয়ে স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এলাম গৌহাটি শহরে। আজ গৌহাটি পৌঁছতে হলে আর নদী স্টীমারে পার হতে হয় না, ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়ে রেলগাড়ি যায়, এমন কি যানবাহন চলাচলের সড়কও তৈরী হয়ে গেছে।

গৌহাটি পানবাজারের কাছে আমার অসমীয়া ছাত্র নরসিং গোসাঁইয়ের বাড়ি। সেখানে উঠলাম। এঁরা খাস অসমীয়া ব্রাহ্মণ। বাড়ির সামনে ব্রহ্মপুত্র

যুগযুগান্ত থেকে নানা নদী-উপনদীর জলরাশি নিয়ে বয়ে চলেছে। কতো নৌকা, জাহাজও দাঁড়িয়ে। শুনলাম সুন্দরবন ডেস্‌প্যাচ্‌-এ কলেরা দেখা দিয়েছে—জাহাজটা আসছে ডিব্রুগড় থেকে, যাবে কলকাতায় ; প্রধানতঃ মালবাহী জাহাজ হলেও যাত্রী থাকতো। কলেরা হয়েছে বলে জাহাজটাকে মাঝদরিয়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, ঘাটে ভিড়তে দেয়নি। এই ডেস্‌প্যাচ্‌ জাহাজকে গৌহাটিতে কয়েকদিন থাকতে হলো। আমি যাবো তেজপুরে ; তবে তেজপুর-গামী স্টীমারের আসতে দেরি আছে। গোসাঁইদের বাড়িতে থাকলাম। কিন্তু অলসভাবে থাকা তো আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই স্থির হলো কামাখ্যা ও উমানন্দ দেখে আসবো—কাছেই তো। প্রথমে কামাখ্যা যাবো স্থির করলাম—মাত্র তিন মাইল পানবাজার থেকে। কামাখ্যা সম্বন্ধে ছোটবেলায় কতো গল্পই না শুনেছি বাড়িতে। কামরূপ কামাখ্যায় তান্ত্রিক আছে, সেখানে গেলে লোকে 'ভেড়া' বনে যায়, আর ফেরে না। বাবার জ্যেঠিমার গ্রামসম্পর্কীয় আশু রায় নামে এক আত্মীয় আসামে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আর ফেরেননি—তখনই কিম্বদন্তীটা শোনা। ঠাকুমা বলতেন—আশুকে কামাখ্যার মেয়েরা ভেড়া বানিয়ে ধরে রেখেছে—সে আর ফিরবে না। কিন্তু কামাখ্যায় না গিয়েও যে লোকে ভেড়া ব'নে যায়, সে-খবরটা তখন জানতাম না, সেটা জেনেছি অনেক পরে ; সে-রকম ভেড়ার পাল প্রায়ই দেখা যায়। থাক্‌ সে গবেষণা। হঠাৎ একদিন আশু রায় এলেন দেশে। আমাদের বাড়িতেই উঠলেন। বাবা-মার সংস্কার ছিল না। আশু রায়ের সঙ্গে অতি সুন্দরী একটি মেয়ে, বেশভূষা বাঙালীর মতো নয়—বেশ একটু পার্থক্য আছে। কথাবার্তাও একটু অন্য ধরনের। এখন মনে হয় মেয়েটি অসমীয়া নয়, কারণ পোশাক ছিল অন্য রকমের—পাহাড়িয়াদের মতো। সেই তাদের দেখা অবধি মনে হতো কামাখ্যায় গেলেই সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের যাদু করে। ভাবলাম দেখাই যাক্‌ না কী হয় !

একদিন নরসিং গোসাঁইয়ের সঙ্গে ভোরবেলায় চললাম কামাখ্যার মন্দির দেখতে। পথে যেতে যেতে নরসিং কামাখ্যা সম্বন্ধে কতো কাহিনী শোনালো। শুনে মনে হলো—কোনো আদিযুগে আদিম মানুষের ধর্মস্থান ছিল এখানে। কোচদের এক রাজা প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করে এখানে বড় মন্দির নির্মাণ করান ; পণ্ডিতরা বলেন যে এটি একটি মহাপীঠ—কামপীঠ।

মন্দিরগুলি অদ্ভুত দেখতে। উপুড়-করা ধামার মতো ছাদ—এমন স্থাপত্য কোথাও নাকি দেখা যায় না। নাটমন্দিরের ছাদ এরকম ধামার মতো পাঁচ-চূড়া। পাশের ভোগমন্দির চালাঘরের মতো। মনে পড়লো বাংলাদেশের

মন্দিরের কথা। বাংলার মন্দিরের আদিরূপ ছিল খড়ের চালা অর্থাৎ জনতার দেব-দেবী জনতার মতোই ঘরে থাকেন—খড়ের চাল উপরে, ছোট এক দরজার ঘর। যে-ঘরে গরীব বাস করে, তাদের দেবতারাও তেমনি ঘরে থাকেন। ক্রমে ধনীর দৃষ্টি পড়লো এসব গ্রাম্য দেবতার উপর—তখন মাটির ঘরটাকে ইটের ও খড়ের চালটাকে চুন-সুরকি-ইট দিয়ে খিলান ক'রে রূপান্তরিত করা হলো। ছাদটা রয়ে গেল খড়ের চালার মতো।

কামাখ্যার মন্দিরের গায়ে কতো দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত। মন্দিরের প্রবেশ-মুখে পাণ্ডা আমাকে দেখালো দুটি মূর্তি—কোচরাজা ও তাঁর ভাইয়ের পাথর-খোদা মূর্তি। পাণ্ডা বললো—'সামনের কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে চলো।' এখানে কোনো মূর্তি দেখলাম না। পাণ্ডা বললো—'ঐ শিলাপটই কামপীঠের প্রতীক।' আমার মনে হয়, আদিম মানুষ প্রতিমা-পূজা করতো না, তারা করতো প্রতীক পূজা। কালে শিল্পীরা, কবিরা প্রতীককে প্রতিমায় রূপান্তরিত করেন। পাহাড়ের উপর মন্দির দেখলাম, পাণ্ডাকে যৎসামান্য কিছু দিলাম। নামছি এমন সময় দেখি পাণ্ডাদের একদল ফুটফুটে মেয়ে তাড়া করছে পয়সার জন্য। দু-চারটে পয়সা দিয়ে দুড়্‌দুড়িয়ে নেমে এলাম। বাপ্‌রে!

নরসিং গোসাঁই-এর পিতার কাছ থেকে 'গৌহাটি' শব্দটির আসল মানে জানতে পারি। গুয়া বা গুবাকহাটি—অর্থাৎ এখানে সুপারির বাজার ছিল এককালে—যেমন কলকাতার কাছে সুতানুটি। তাঁর কাছ থেকে শুনি উমানন্দের কথা। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থলে উমানন্দ দ্বীপটি। খেয়াঘাটের নৌকা করে লোকে দেখতে যায় ঐ তীর্থস্থান। পাহাড় খুব উঁচু নয়, তবে সিঁড়িগুলি বড় খাড়াই। মন্দিরের পথে দুধারে আছে নানা ফুলের গাছ—তা বললেন। মোট কথা তাঁর বর্ণনা শুনে উমানন্দ দেখবার ইচ্ছা হলো।

স্থির করলাম নৌকা করে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ও-পারে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের ভগ্নস্তূপাদি দেখতে যাবো ও ফেরবার পথে উমানন্দ দেখবো। আমার বয়েসী কয়েকটি যুবক সঙ্গী জুটলো—সঙ্গে পেলাম একজন সারেঙ—সম্ভবতঃ সেদিন তার ছুটির দিন। গেলাম ও-পারে নৌকা করে। দেখলাম পুরোনো ভগ্নস্তূপ—সে-সব বুঝিয়ে দিতে পারেন এমন লোক পাইনি। গেট (Gait) সাহেবের আসামের ইতিহাস তখনো পড়িনি, তখন পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের আসাম সম্বন্ধীয় লেখাগুলির কথাও শুনিনি। সুতরাং সেই সবের রহস্য তখন আবৃতই থেকে গেল।

নৌকায় ফিরছি মহোল্লাসে। ইচ্ছা, উমানন্দে নামবো। কিন্তু নৌকা

কিছুতেই বাগিয়ে কিনারায় আনা গেল না। খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি এই দ্বীপে বাধা পেয়েছে, তাই যেন ক্ষিপ্ত বেগে দু'পাশ দিয়ে সরোষে বয়ে যাচ্ছে। নৌকা ভিড়ানো গেল না। একটা স্রোতধারায় পড়ে নৌকা উন্মত্ত হয়ে ছুটে চললো। উমানন্দে নামার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আমরা যে-ঘাটে নৌকায় উঠেছিলাম, তার অনেকটা নিচে এসে নৌকা পাড়ে ভিড়লো। এই দুঃসাহসিক কাজে সলিল-সমাধি হতো যদি সারঙ সঙ্গে না থাকতো। সে সিদ্ধ হাতে নৌকা চালিয়ে আনলো এ-পারে। এই উমানন্দের স্রোতের মুখে কয় বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। আমাদের বড় ফাঁড়া কাটলো—বুঝলাম ডাঙায় এসে। নামামাত্রই পাড়ের স্নানরতা মেয়েরা আমাদের খুব গালাগালি দিল একচোট। সম্ভবত তারা নৌকার গতি দেখে ভয় পেয়েছে। স্নেহের তিরস্কার পেয়ে চুপ করে থাকলাম।

গৌহাটি থাকতে একদিন দেখা করতে গেলাম জ্ঞান বড়ুয়ার সঙ্গে। ইনি স্থানীয় আইন কলেজের অধ্যাপক—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের জামাতা। কয়েক বৎসর পূর্বে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয় গিরিধিতে—তাঁরা গিয়েছিলেন 'বায়ু পরিবর্তনে'। সে-সময় পূজার ছুটি। আমাদের মতো তরুণ ও যুবকদের জুটিয়ে তিনি সেক্সপীয়ারের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস্'-এর কিছুটা অভিনয় করালেন। এতদূর এসে জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দেখা না করাটা অশোভন-জ্ঞানে দেখা করে এলাম।

গৌহাটি থেকে চললাম তেজপুর। তখন রেলপথ নির্মিত হয়নি, স্টীমারই একমাত্র যান। ব্রহ্মপুত্রের উপর স্টীমারে যাত্রার সময়ের শোভা পদ্মার শোভা থেকে ভিন্নতর। ডেকের উপর বিছানা বিছিয়ে চলমান তীরের দিকে তাকিয়ে থাকার আনন্দ অপরিসীম—সে-আনন্দানুভূতি কি অপরকে দেওয়া যায়?

তেজপুর উজানে যেতে হয়—তাই সময় লাগলো বেশি। তেজপুরে লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়া নামে একঘর ব্রাহ্ম ছিলেন—পরিচয় ছিল না, কিন্তু পরিচয় দিয়ে আশ্রয় করে নিলাম। আমার বয়সী একটি যুবক সেই বাড়ির ছেলে ছুটিতে এসেছেন। তাকে পাওয়ায় খুব সুবিধে হলো। গৃহকর্তা বৃদ্ধ, ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁর বাড়িতে বই পেলাম। আসাম সম্বন্ধে বই পড়লাম। ১৯১১ সালের Census Report যোগাড় করে পড়ে নিলাম; মোট কথা বেড়ানো ছাড়া অন্য সময়টা পড়ে ও কথা বলে কাটাতাম।

অসমীয়া ভাষা বাংলার একটা উপভাষা—যেমন চট্টগ্রাম, পুরুলিয়ার ভাষা।

১৯ শতকের মধ্যভাগে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় অসমীয়াকে পৃথক ভাষারূপে স্বীকৃতি করিয়ে নেওয়া হয়; সেখানে পড়লাম যে, অসমীয়াতে যে-সব পাঠ্যবই লিখিত হচ্ছে, তা সব সময় শিশুদের বোধগম্য হয় না,—অবশ্য এটা ১৯১১ সালের কথা। তারপর ১৯১২ সালের পর আসাম নূতন করে পৃথক প্রদেশরূপে গঠিত হলো; অসমীয়াদের মধ্যে আত্মচেতনা দেখা দিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম এক প্রদেশ ছিল; ঢাকা ছিল রাজধানী, শিলং ছিল শীতাবাস। ফলে শিলং-এর সেক্রেটারিয়েট সিলেট ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানের বাঙালীদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। সরকারী চাকুরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সকল বিষয়ে বাঙালীদের আধিপত্য। কিন্তু আমি যে সময় গৌহাটি, তেজপুর ও পরে শিলং যাই, তখন কোথাও 'বঙাল খেদা' ভাব বা কোনোরূপ বিরুদ্ধতা বুঝতে পারিনি। গৌহাটিতে তো আমি অসমীয়া গোসাঁই বাড়িতেই ছিলাম। তেজপুরেও অসমীয়া পরিবারেই কয়েকদিন থাকি।

তেজপুরে যে বাড়িতে ছিলাম সেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র খুব দূরে নয়। তাই নদীতে স্নান করতে যেতাম। আমাকে ওঁরা বললেন যে, নদীর ধারে পুরাতন কালের একটা 'লেখা' আছে—সেটা প্রায় নদীগর্ভের কাছে। বিরাট বটগাছ ছিল ঘাটের কাছে—বৃদ্ধ বটের শিকড় ধরে স্নান করলাম, খরস্রোতা নদীর মধ্যে যাবার সাহস হলো না কারও। বৃদ্ধ বট ঝুরি নামিয়েছে, যেন ছায়া-সুশীতল আশ্রয়ে ব্রহ্মপুত্রে পুণ্যস্নানের জন্য, সকলকে সহায়তা দান করবে।

কয়দিন আনন্দে কাটলো তেজপুরে। সেখান থেকে চললাম বালিপাড়া চা-বাগানে ডাক্তারের বাড়ি। ভদ্রলোক নিতে এলেন; বিশাল অরণ্যের মধ্য দিয়ে সরু রেলপথ—আসামের তরাই-এর অরণ্যের বুকের মধ্যে দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা হলো। অরণ্যের মধ্য দিয়ে হঠাৎ এসে পড়া গেল বিশাল খোলা জায়গায়—চা-বাগিচা পরিমণ্ডলে।

ডাক্তার ও অন্যান্য বাবুদের কোয়ার্টার্স পাশাপাশি—সবাই বাঙালী। ডাক্তার খুব খুশি, ছাত্রও খুশি, বাড়ির লোকজনও খুশি অতিথি পেয়ে—কারণ সেখানে কে যায় অকারণে বেড়াতে? কয়দিন ছিলাম সেখানে মনের আনন্দেই। তন্ন তন্ন করে সব দেখলাম। কুলি-বস্তি বা 'লাইনে'ও গেলাম। কোম্পানি তাদের ঘর করে দিয়েছে। নানা দেশের মানুষ এসে মনে হয় যেন একমানুষ হয়ে গিয়েছে—নাম তাদের 'কুলি'। বাঙালী, ওড়িয়া, ছত্রিশগড়ী, সাঁওতাল, ওরাওঁ, বিহারী সব আছে পাড়ায় পাড়ায় ভাগ হয়ে। কিন্তু কালে সংকর-বর্ণের সৃষ্টি হয়—মানুষের আদিম ক্ষুধা জাতের বেড়া, ধর্মের বেড়া ভেঙে দেয়। এখানকার হাস-

পাতাল বেশ বড়—অনেকগুলি বেড, ডাক্তারবাবু সব দেখালেন। এখানে একটা জিনিস দেখলাম—চা খায় সবাই এনামেলের মগে করে, জল থেকে চায়ের প্রতি বেশি টান। আমিও বাড়ির সবার সঙ্গে মগ-ভর্তি চা খেতাম।

ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আসামের চা-বাগিচার কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি বললেন যে সে-সময় আসামে সাত-আটশ' চা-বাগান, অধিকাংশর মালিক সাহেব; একমাত্র পাঁচুবাবু তাদের সঙ্গে লড়ে টিকে আছেন। চা-বাগিচাওয়ালাদের প্রতাপ দারুণ। আসামের এসব অঞ্চল তো জনশূন্য ছিল, সাহেবরা এসেই তো বাগিচা খুললো, কুলি আনলো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে। এখন সাড়ে নয় লাখের মতো কুলি আছে, অবশ্য এদের মধ্যে মেয়েমানুষ ও ছেলে-পুলের সংখ্যা কম নয়। বাগানে দেখলামও সবাই কাজ করছে। ডাক্তারবাবু বললেন—কুলিদের এখন তো খানিকটা মানুষের মতো করে দেখতে হচ্ছে সাহেবদের, এমন সময় ছিল যখন এদের অবস্থা ছিল আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের মতো। দেশ থেকে আড়কাটিরা ফুসলিয়ে আনতো—কোথায় বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম আর কোথায় আসামের চা-বাগিচা, কোনো ধারণা ছিল না কোথায় যাচ্ছে। দেশে অনাহারের জ্বালায় মরছে, আড়কাঠিদের মন-ভোলানো কথা শুনে ভেসে পড়তো আকাশকুসুমের আশায়। ডাক্তার আরও বললেন—ব্রাহ্ম-সমাজের রামকুমার ভট্টাচার্য বহুকাল পূর্বে এসেছিলেন, কুলি সেজে গোপনে তাদের জীবনধারা দেখে লিখেছিলেন 'কুলি কাহিনী' বই। ব্রাহ্মসমাজ থেকে সর্বপ্রথম আন্দোলন হয় এ সম্বন্ধে। এ-সব কথা শুনে নূতন লাগলো সেদিন। রামকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা সুষমা দেবীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বিবাহ হয়। গিরিধিতে ও কলকাতায় কয়েকবার দেখা হয়েছিল সুষমাদির সঙ্গে; আমাদের খুব স্নেহ করতেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে।

একদিন বিকালে ট্রলি করে আরও ভিতরে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করি; সে অরণ্যের ভীষণ নীরবতার মধ্যে প্রবেশ না করলে অনুভব করা যায় না জনহীনতা কাকে বলে। হাডসন-এর Green Mansions-এ ব্রাজিলের আমাজোন নদীর তীরবর্তী অরণ্যের বর্ণনা পড়েছিলাম, সেটা মনে পড়লো এই অরণ্যে বিচরণ করতে করতে। আজ সে অরণ্যের কী অবস্থা জানি না। লুব্ধ মানুষের কুঠার পৃথিবীর অরণ্যভূমিকে মরুভূমে পরিণত করেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে।

কয়দিন তেজপুরে ঘুরে, আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে পড়াশুনা করে ফিরলাম গৌহাটি। এসে উঠলাম গোসাঁইদের বাড়িতে। তার পরদিন চললাম শিলং।

গৌহাটি থেকে শিলং পাহাড়ী পথ—মোটরযান ছাড়া আর যে যান আছে তা পদযান ও এক অশ্ব-দ্বিচক্র যান। মোটর স্টেশনে গিয়ে পাঁচ টাকায় টিকিট কেটে একটা মালবাহী গাড়ির সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম। সেটাই ছিল পাঁচ টাকার টিকিট-যাত্রীদের আসন। বাস বলতে আজ যা বুঝি তখন তা অজ্ঞাত। বসে আছি চুপচাপ। বাস কোম্পানীর এক কর্মচারী এসে বললেন —'নেমে আসুন।' ভেবে পাচ্ছিনে কী অপরাধ করেছি! নেমে যেতেই সেই লোকটি বললেন—'ঐ গাড়িতে চাপুন।' সেটাও ট্রাক—উপরে ছাদ, পাশে পরদা। শুনলাম যাত্রীবাহী গাড়ি। সামনে ফার্স্ট ক্লাসে একজন ভদ্র অভিজাত মুসলমান ছিলেন, সাহেবী পোশাক পরা। আমি সে-গাড়িতে উঠলাম, পেছনের বেঞ্চে বসলাম—যেখানে খাসিয়ারা বসে। আমার পাশেই একটি খাসিয়া সুন্দরী —কোনো সাহেববাড়ির আয়া, খুব পরিচ্ছন্ন। হিন্দী বলতে পারে, সুতরাং আলাপ করতে অসুবিধে হলো না; বেশ ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। সামনে বসা ভদ্রলোকের নাম শুনলাম আবদুল মজিদ—তখনকার দিনের আসাম সরকারের অন্যতম মন্ত্রী, অবশ্য তখন মন্ত্রী বলতো না ওঁদের—একজিক্যুটিভ কমিটির সদস্য মাত্র। আমার সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি—শান্তিনিকেতন থেকে আসছি শুনে আগ্রহ হলো কথা বলতে।

খোলা ট্রাকের মতো গাড়িতে চলেছি। খুব ভালো লাগছে। দার্জিলিঙের রেলপথের সঙ্গে মেলে না শিলঙের পথ। গৌহাটি থেকে নয় মাইল মোটর চললো সমতল দিয়ে—দু পাশে ধানক্ষেত। জোড়াবাটের কাছ থেকে গাড়ি পাহাড়ী পথ ধরলো। আঁকাবাঁকা পথ, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সামনেটা শূন্য—হঠাৎ গাড়ি ডানদিকে বেঁকে চললো। পথের একদিকে খাড়াই পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। ড্রাইভার খাসিয়া—পথ ও পথের বাঁক তার যেন মুখস্থ। ত্রিশ মাইল আসার পর গাড়ি থমলো নংপোতে। এখানে চড়াইপথের গাড়ি থামে, তখন উৎরাইগামী গাড়ি যাবার পথ পায় অর্থাৎ single line-এর মতো। নংপোতে খাসিয়া মেয়েরা পান, সুপারি, কলা, চা বিক্রী করছে পথের ধারে। মজিদ সাহেব আমাকে চা খাওয়ালেন একটা ভদ্র রেস্তরাঁয়। এখানে একটি কাহিনী শুনলাম। নামাই-উৎরাই পথে অসময়ে লাটসাহেবকে গৌহাটি যেতে হচ্ছিল। পথের আগলদার নেপালী দ্বারবান অসময়ে আগল সরাতে অস্বীকার করলো। এডিসি প্রভৃতিরা তাকে অনেক বুঝালেন, সে তার কর্তব্যে অটল থাকলো। তখন দ্বারবানের উপরিস্থন কর্মচারীকে ফোন করে অবস্থাটা জানালে তিনি নেপালী দ্বারওয়ানকে ডেকে আগল তুলে লাটসাহেবের গাড়ি যাবার হুকুম

দিলেন। তখন লাটসাহেবের গাড়ি পথ পেলো। নেপালী তার কর্তব্যপালনের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল।

নংপোর পর থেকে শাল অরণ্যের মধ্য দিয়ে গাড়ি চললো; পাশ দিয়ে কলরব করে বয়ে যাচ্ছে একটা পার্বত্য নদী। এই নদী বেঁধে বিরাট জলবিদ্যুৎ কারখানা হয়েছে কয়েক বৎসর পূর্বে—সেযুগে এসব কাজের দিকে বিদেশী শাসকদের দৃষ্টি যায়নি।

শিলং পৌঁছলাম। উঠলাম মন্মথ দাসের বাসায়। মন্মথদা ব্রাহ্মসমাজের লোক, আমাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একা থাকেন ছোট একটা বাসায়। মন্মথ দাসের সঙ্গে আলাপ হয় শান্তিনিকেতনে—তাঁর ভাগ্নে নির্মলকে রাখতে যান সেসময়। ইনি ব্রাহ্মসমাজে যৌবনেই প্রবেশ করেন। চট্টগ্রামে এককালে বহু ব্রাহ্মদের বাস ছিল। এখানকার নামকরা ব্রাহ্ম ছিলেন উকিল যাত্রামোহন সেনগুপ্ত—এঁর পুত্র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। যাত্রামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিল। যাত্রামোহন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম—তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে মন্মথবাবু ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় বিনোদবাবুর বন্ধু বলে। আমার মাকে মা বলেই ডাকতেন। কঠিন শ্রম করতে করতে শরীর ভেঙে যায়, তখন তাঁকে ধরমপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়। দীর্ঘকাল সেখানে থাকার পর শরীর সুস্থ হলে, চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি শিলঙে আসেন ও স্বভাবসিদ্ধ গুণে জনসেবায় ব্রতী হন। আমি যখন এলাম, তখন তিনি শিলঙের একটা বাড়িতে থাকেন—দেখলাম খাসিয়াদের ছেলেমেয়েদের ওষুধ-পথ্য দিচ্ছেন। বুঝলাম সবারই প্রীতি ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

শিলঙ ও দার্জিলিঙের তফাৎ এখানে এসেই বুঝতে পারলাম। শিলঙ মালভূমির উপর অবস্থিত—চড়াই-উৎরাই আছে, তবে দার্জিলিঙের মতো নয়। শিলঙ শহরটি ভারি পরিচ্ছন্ন মনে হলো। লোকে বললো—পূর্ববঙ্গ-আসাম ছোটলাট স্যার ব্যামফীল্ড ফুলার সাহেবের সময় শিলঙ যখন পূর্ববঙ্গ-আসামের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল (অর্থাৎ ১৯১২ সাল পর্যন্ত) তখন শহরের শোভা আরও মনোহর ছিল। মনে পড়ছে, ক্রেন্‌-চেস্টেন নামে একটি বীথি—পাইন বনের মধ্য দিয়ে পাহাড় ঘুরে গেছে।

শিলঙ বাসকালে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শহরের দর্শনীয় অনেক কিছু দেখলাম—বিশপ ও বীডন জলপ্রপাত দেখি, একটা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে শহরে বিজলীবাতি যোগাচ্ছে। Sweet-

falls-এর অন্ধকার পরিবেশটা বেশ ভালো লাগলো—কেমন যেন গা-ছম্‌ছম্ ভাব। পরে শুনলাম—কে একজন এখানে মারা যায়—কেউ বলে স্বেচ্ছামৃত্যু, কেউ বলে দুর্ঘটনা।

দল জুটলো চেরাপুঞ্জী যাবার। সেখানে আছেন বিনোদবিহারী রায়, যাঁর কথা পূর্বে বলেছি। তিনি সেখানে আছেন সপরিবারে। শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জী তখন কোনো বাস চালু হয়নি—পয়সা থাকলে ট্যাক্সি করে যায় লোকে। আমাদের মতো লোকে হেঁটে যায় অথবা এক ঘোড়ার টানা গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাওয়া-আসা করে। চলেছি মনের আনন্দে হৈ-চৈ করতে করতে। মালভূমের উপর দিয়ে পথ—চড়াই-উৎরাই আছে, তবে তেমন ভীষণ কিছু নয়।

শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জী ৩৭ মাইল পথ; ছয় মাইল দূরে 'আপার শিলঙ', এখানে দেখলাম জলপ্রপাত—এলিফেন্ট ফল্‌স্। হাতীর শুঁড়ের মতো জলধারা নেমে যাচ্ছে, আমরা সেখানে বসে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম—খাবার সঙ্গেই ছিল সবার। আবার চলতে শুরু করলাম হাঁটাপথে—পাকা পথ, একটু ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। উনিশ মাইলের পর আমার শরীরটা খারাপ লাগলো। তাই বন্ধুদের ছেড়ে একটা ঘোড়ার একাগাড়িতে চেপে বসলাম এক টাকার প্রতিশ্রুতিতে। গাড়িটা সুঁটকি মাছ বয়—সে গাড়িতে চেপে পথ-পরিক্রমণ কী আনন্দের তা বুঝবেন তাঁরা, যাঁরা সুঁটকি মাছ খান না। খোলা গোরুর গাড়ির মতো গাড়ি, ঘোড়ায় টানে—লিখতে লিখতে মনে পড়ছে ভরতপুরের এক্কার কথা।

চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছোলাম। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্টিপ্রধান স্থান এটি। কিন্তু এখন দেখলাম রৌদ্র ঝলমল করছে, আকাশ ইস্পাতের মতো চকচকে। গাড়ি যেখানে থামলো তার উপরেই ব্রাহ্মসমাজ মন্দির—যার কাছেই বিনোদদা থাকেন। ছোট একটা জলস্রোতের উপর কাঠের পুল পার হয়ে পাথুরে পথ দিয়ে যেতে হয় বিনোদদার বাড়ি। বিনোদদার স্ত্রী লীলা দেবী আমাকে দেখেই বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন—"এ কি প্রভাত!" তিনি ভাবতেও পারেননি, এমন ভাবে হঠাৎ এসে পড়বো। সঙ্গীদের কথা বললাম না, তারা আসুক—চমকে দেবে। কিছু পরে তারা এসে গেলে খুব হৈ-হুল্লোড় চললো।

বিনোদদা খাসিভাষা শিখেছেন ভালো করে, খাসিভাষায় মন্দিরে উপাসনা করতে পারেন, কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত অনুবাদ করেছেন—গাওয়া হয় বাংলা সুরে।

খাসি পাহাড়ে প্রায় শতাধিক বৎসর বিলাতের ওয়েলশ্ মিশন কাজ করেছে। শিলঙ থেকে হেঁটে আসবার সময় এবং চেরাপুঞ্জী থেকে যখন পরে শেলার দিকে নামি, তখন পথে প্রত্যেকটি গ্রামে চার্চ ও স্কুল দেখেছিলাম। হিন্দুরা এদের মধ্যে

প্রবেশ করে ধর্ম, নীতি কিছুই প্রচার করেননি; শিক্ষাদানের কোনো প্রয়াস করেননি। খাসিদের ভাষায় না ছিল সাহিত্য, না ছিল লিপি। পাদরি তাদের ভাষা শিখে, খ্রীষ্টানী বই ও অন্যান্য বই খাসি ভাষায় অনুবাদ করে রোমান লিপিতে প্রচার করে; সমগ্র বাইবেল খাসি ভাষায় পাওয়া যায়। মোট কথা, সভ্য দুনিয়ার সঙ্গে খাসিয়াদের পরিচয় করে দেন পাদরীরা। তারাই খাসিয়াদের সুখে-দুঃখে দাঁড়ায়। মনে পড়ছে, যোগেন্দ্র মালের কথা। মালেরা হিন্দু ছিল; কেন মুসলমান হয়ে গেছে শুধোই যোগেন্দ্রকে। সে বলেছিলো—"বাবু, আমাদের কেউ তো দেখে না, ওই মৌলবী জমিরুল হক্ সাহেবই তো সুখেদুঃখে বুকে টেনে নেয়।"

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে নীলমণি চক্রবর্তী চেরাপুঞ্জীতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে এসেছেন কয়েক বৎসর। বিনোদদা তাঁর কাজে সহায়তা করছেন। তাঁর চেষ্টায় একটি খাসিয়া ছেলে শান্তিনিকেতনে পড়তে যায় এবং একটি মেয়ে বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়। নীলমণিবাবুর সঙ্গে আলাপ হলো। কয়েকজন ব্রাহ্ম খাসিয়ার সঙ্গে পরিচিত হলাম; শুনলাম তাদের গাওয়া ব্রহ্মসঙ্গীত। কিন্তু সে ব্রাহ্মমিশন আজ কোথায়? নীলমণিবাবু উত্তরসূরী করে যেতে পারেননি; বিনোদবাবুও তাঁর সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অপারগ হন। মোট কথা, সর্বত্র ব্রাহ্মদের মন্দিরাদির যেমন দশা, তাই হয়েছে খাসি পাহাড়েও।

চেরাপুঞ্জীর বিখ্যাত জলপ্রপাত 'মৃশমই' দেখতে গেলাম—খাড়া পাহাড় থেকে নিচে যেখানে পড়ছে তা দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধোঁয়ার মতো জলকণা। কত বৎসরের পুরাতন কথা, কিন্তু আজও সেই মৃদু-গম্ভীর শব্দ কানে বাজছে ও তার বহুবেণী বিভক্ত রূপ দেখতে পাচ্ছি। সেইখানে দেখি কয়েকটি খাসিয়া মেয়ে কি একটা ফল ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ও কয়েকটা ফল চেয়ে নিয়ে খেলাম। পয়সা দিতে গেলে ইস্ ইস্ বলে হাতের ইসারায় জানিয়ে দিল পয়সা নেবে না। গৌহাটি থেকে শিলঙ এসেছি, কোথাও ভিখারী দেখিনি। পাহাড়ী পথ মেরামতি হচ্ছে, কুষ্ঠ রোগী—যার হাতের আঙুল গিয়েছে খসে—সেও ঝারিতে হাত ঢুকিয়ে জল বয়ে আনছে পাশের ঝরনা থেকে, রাস্তায় জল দিচ্ছে। বুঝলাম খৃষ্টান পাদরীরা জাতটার আদিম আত্মসম্মানবোধকে নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম যে, এদের মধ্যে কোনো জাতীয় শিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে শিলঙে 'ডন্ বোসকো' (Don Bosco) ক্যাথলিক খৃষ্টানরা শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, সেখানে কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দেখেছিলাম ষোলো বৎসর পরে যখন দ্বিতীয়বার শিলঙ যাই—সে কথা

পরে আসবে।

চেরাপুঞ্জীতে যে কয়দিন ছিলাম, বৃষ্টি পেলাম না—দেখলাম রৌদ্রতপ্ত মালভূমির আর এক রূপ। দ্বিতীয়বার যখন যাই তখন বৃষ্টি দেখি। বৃষ্টি কাকে বলে এক বিকেলেই বুঝে নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গীরা শিলং ফিরবে। বিনোদদা বললেন তিনি যাবেন শেলা, পাহাড়ের পাদদেশের গঞ্জ—যেখানে সিলেট এসে মিশেছে আদান-প্রদান ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপদেশে। চেরাপুঞ্জীর সমতল মালভূমি সিলেট জেলার সামনে যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, উপর থেকে দেখেছি সিলেটের সীমাশূন্য প্রান্তর দূরে সুরমানদীর ক্ষীণরূপ।

বিনোদদার সঙ্গে চলেছি—সামান্য পুঁটলি সঙ্গে—বাকী সব রেখে দিলাম চেরাপুঞ্জীতে, বন্ধুরা নিয়ে যাবে কলকাতায় যথাসময়ে। বন্ধুদের মধ্যে কলকাতাবাসী 'বড়কু' কলেজের ছাত্র—তার উপরেই ভারটা দিলাম। চেরাপুঞ্জী থেকে পথ বরাবর নিম্নগামী; পথে দেখি 'থাপ্পা' নিয়ে লোক আসছে—তাতে লোক বসে। লোকটার কপালে আটকে নিয়েছে পিঠের ভারটা—একটা চেয়ারের উপর লোক। অন্যরা আসছে ঐভাবে কাঠ নিয়ে। বহুকাল থেকে সিলেটের সঙ্গে এইভাবে আসা-যাওয়া চলে আসছে খাসিয়া ও বাঙালীতে। এরা নিয়ে যাচ্ছে মধু, কমলালেবু, তেজপাতা আর আনছে চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘর বানাবার টিন।

রাতে থাকলাম লাইটকান্‌স্থ নামে এক খাসি গ্রামে। সেই অঞ্চলের 'সীম' বা সর্দারের বাড়িতে আতিথ্য পেলাম। সেখানেই খেলাম তাদের রান্না, সেই ঘরেই শুলাম; আমরা একদিকে, অন্যেরা এমন কি অবিবাহিতা বয়স্কা মেয়েরা অন্য দিকে। নূতন অভিজ্ঞতা হলো জীবনে।

সকালে উঠে খাসিদের পরিবারের সঙ্গে চা-জলখাবার খেয়ে শেলা যাত্রা করলাম। শেলা বিরাট বাজার। সিলেট থেকে অনেক নৌকো এসেছে—তবে বড় নৌকো নয়—ছোট লম্বা পানসি। দেখছি খাসি মেয়েরা নৌকো বোঝাই করে ডিম বিক্রী করছে। শেলার বাজারে কিছু জলখাবার খেয়ে নিলাম দোকানে বসে। দোকানপাট সবই বাঙালীর। বিনোদদা সেখানে থেকে গেলেন। আমি নৌকায় উঠে রওনা দিলাম ছাতকের দিকে। পাহাড়ী নদী—নদীতে বড় বড় শিলা। খরস্রোতা নদীর উপর দিয়ে তীরবেগে চলেছে নৌকা। খাসিয়া মাঝির হাতে একটি লম্বা লগি—সে কেবল পাথর এড়িয়ে, ধাক্কা বাঁচিয়ে চলেছে। মনে পড়লো, বায়স্কোপে জাপানের Shooting the shoot দেখেছিলাম—ঠিক এইরকম।

নৌকা সুরমায় এসে পড়লো। বিরাট নদী। চললো নৌকো ছাতকের দিকে। ছাতক নদীর অপর পারে—দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বড় গঞ্জ, অনেক নৌকা ঘাটে বাঁধা। ছাতক সিলেটের বড় শহর, BISN (British Indian Steam Navigation Co.)-এর বড় অফিস এখানে। ছাতক সিলেটি চুনের কেন্দ্র।

আমাদের ছাত্র শরদিন্দুর পিতা BISN কোম্পানীর বড়বাবু। ঘাটের অদূরেই বাসা। আমায় দেখে শরদিন্দু নন্দী খুব খুশি—বাড়ির লোকেরাও। ছাতকে কয়েকদিন থাকি। একদিন বেড়াতে গেলাম চুনাপাথর খনি দেখতে। খনি তো নয়—পাহাড় কেটে পাথর জমা হচ্ছে এবং তাই পুড়িয়ে চুন হচ্ছে। শেলার পাহাড় থেকে চুনাপাথর আসে। কোন্ আদিকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল—যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলি নিজেদের দেহ দিয়ে রচে গেছে ভাবীকালের মানবের ইমারত তৈরীর উপাদান।

Inglis নামে এক ব্রিটন বণিকদের অগ্রণী হয়ে আসে—সিলেটে চুনের ব্যবসায় প্রবর্তক। মধ্যযুগে শামুক পুড়িয়ে চুন করতো 'চুনারী' নামে একটা জাত—আমাদের গাঁয়ে তারা ছিল। তাদের শামুক আসতো নৌকা করে সাগরতীর থেকে। Inglis-এর সমাধি সৌধ দেখলাম—তখনই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত —এখন কী অবস্থায় আছে জানি না।

ছাতক থেকে চললাম সিলেট। রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে উঠলাম এক নৌকোয়—আরোহী আমি একা, মাঝিও একটি মাত্র। সারারাত নৌকো চললো, ভোরে পিটারগঞ্জ নামে (এখন কি নাম জানিনে) ছোট একটা গঞ্জে নেমে পড়লাম। মাঝিকে শুধোই—"এখান থেকে সিলেট হাঁটাপথে কতোটা?" মাঝি বললে—"সাত মাইল।" আমি মাঝিকে বললাম—"তোমার ভাড়া নাও, আমি এখান থেকে হেঁটে যাবো।" মাঝি আশ্চর্য হলো একটু। ছোট বোঁচকা হাতে নিয়ে চলেছি পাকা রাস্তা ধরে। পথে একজন লোক আমার স্বল্প দাড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করলো—"জানবাজারে আপনার দর্জির দোকান আছে?" আমি বললাম—"বিদেশী—বেড়াতে এসেছি।" তার সঙ্গে শহরে এসে উঠলাম একজনদের বাসায়—সেটা কাছারি বাড়ি। নদী খুব কাছে। তখন সিলেটের রেল হয়নি; সুরমা পার হয়ে রেললাইন পত্তন হয়েছে; কুশিয়ারার উপর রেলসেতু নির্মাণ হচ্ছে তখন। ফেঞ্চুগঞ্জে ট্রেন ধরে কুলাউড়া যেতে হতো। সিলেটের বৈশিষ্ট্য তার নদীর ধারে পথটি—ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে বাকল্যাণ্ড চন্দননগরের গঙ্গাতীরের strand ছাড়া আর কোথাও নদীর ধারে সৌন্দর্য

রক্ষার এমন চেষ্টা দেখা যায় না। পাটনা, কাশী, প্রয়াগ কোথাও নদীতীর সুন্দর নয়।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে সিলেটের নদীর ধারে বসে আছি। জ্যোৎস্না থাকায় চারদিকটা বেশ মনোরম লাগছিল; তবুও কেমন যেন বিষাদ মাখানো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে একা একা ঘুরছি অকারণ পুলকে, প্রয়োজনহীন ডাকে। অদূরে বসে কয়েকজন লোক। একজন গান করছে—"বন্ধু, প্রেমের পিয়াসীরে….।" সত্যই তো দুনিয়ার লোক তো এই প্রেম-পিয়াসী, যাই তার অর্থ হোক। কাছে গিয়ে বসলাম। গান হচ্ছে—

"বন্ধু প্রেমের পিয়াসীরে
বন্ধু তোর সনে পীরিতি করি,
ঘরে না মুই রইতে পারি।
বন্ধুরে দিবানিশি ঘুরিয়া মরি তুই বন্ধুর লাগিয়া
রাইতে দিনে চাহিয়া থাকি পন্থ নিরখিয়া—
বন্ধুরে সহিতে না পারি দুখ সদায় জ্বলে হিয়া,
স্বপনে দেখি বন্ধু না পাই জাগিয়া।
বন্ধুরে সৈয়দ সাহানুর কয় উদাসিনী হইয়া
কি দোষ পরাণের বন্ধু না-চাও ফিরিয়া।…"

গান শুনতে শুনতে ভুলে গেলাম আমি পূর্ববঙ্গের নদীর ঘাটে বসে গান শুনছি। অপরিচিতদের উদ্দেশে বলে ফেললাম—"গানটি আমি লিখে নিতে পারি কি?" তাঁরা চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে, বোধ হয় অ-বাঙাল কথা শুনে বিস্মিত হয়ে একজন বললেন—"মনে হচ্ছে, আপনি এ-অঞ্চলের লোক নন।" আমি সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। লোকটি বললে—"ভক্তের গানের কথা সুর সব ধর্মেই এক।" আমার দাড়ি দেখে তাদের মনে সন্দেহ জাগে—প্রথমে বুঝতে পারেননি আমার জাতধর্ম কি। কথায়-কথায় বেশ পরিচয় হয়ে গেল তার সঙ্গে। বললে, তার বাড়ি সিলেট থেকে মাইল চোদ্দ দক্ষিণ-পূর্বে 'ঢাকা দক্ষিণে'। আমি 'ঢাকা দক্ষিণ' শুনেই শুধোই—"চৈতন্য মহাপ্রভুর আদি বাসভূমি না?" সে বললে—"হ্যাঁ, দত্তরাইল গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান। এখানে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। প্রবাদ—চৈতন্যদেব শ্রীহট্টে আসেন তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে; তখন তিনি তাঁকে দুটি মূর্তি দিয়ে যান—একটি নিজের ও অপরটি কৃষ্ণের। দুটি মূর্তিই ঠাকুরবাড়িতে আছে। এখান থেকে ভালো রাস্তা আছে, যাবেন?"

আমি বললাম—"হাতে সময় কম, বোধ হয় পারবো না।" সে বললে, "শাহজলালের দরগা দেখেছেন ?" বললাম—"গতবার গিয়েছিলাম, শাহজলাল সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারি ; পরে পড়াশুনো করেও তাঁর সম্বন্ধে ও শ্রীহট্ট বিজয় সম্বন্ধে ইতিহাসটা জেনে নিয়েছি।" সে বললে—"তাহলে আপনাকে আরেকটি জিনিস দেখাব ; নূতন লাগবে—আর কোথাও পাবেন না দেখতে এই জেলা ছাড়া। সেটা হচ্ছে 'সিলেটি নাগরী'র বই। আমি হেসে বললাম—"আমাদের শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে সিলেটি বাংলার কয়েকখানা বই আছে, আমি তা কলকাতার বটতলা থেকে কিনি। আমাকে বইগুলো কিনতে দেখে দোকানী খুব অবাক হয়ে যায়।" এ-কথা শুনে সে বললে—"আমারও তো অবাক লাগছে। হিন্দুরা কেন ; শিক্ষিত মুসলমানরাও এই নাগরীর খবর রাখে না। বেশ, কাল সকালে আপনাকে এখানকার একটা ছাপাখানায় নিয়ে যাবো।"

পরদিন সকালে দেখা করতে এলে আমি তাকে বললাম—"প্রেস খুলতে নিশ্চয় দেরি আছে, চলুন নূতন কলেজটা দেখে আসি। গতবার দেখেছিলাম তো বাজারের কাছে। দুর্গাবাড়ি দেখতে গিয়ে শুনি সেখানে কলেজ হবে।"

মুরারিচাঁদ কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে, অর্থাৎ যে-বৎসর আমার জন্ম হয়। রাজা গিরিশচন্দ্র রায় তাঁর মাতামহ মুরারিচাঁদের নামে কলেজটি স্থাপন করেন। গতবার অধ্যাপক অপূর্বকৃষ্ণ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নূতন কলেজ-বাড়ি দেখলাম। কলেজের অদূরে এক টিলার উপর খ্রীষ্টান পাদরী টমাস সাহেবের সুন্দর অট্টালিকা। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেট সফরে এসে এই পাদরীর বাড়িতে উঠেছিলেন। থাক্ সে-কথা।

নূতন কলেজ দেখে ফিরে আমরা সিলেটি নাগরী হরপের বই দেখবার জন্য গেলাম 'ইসলামিয়া প্রেসে'। প্রেসের মালিক আমাকে 'সিলেটি নাগরী' সম্বন্ধে কৌতূহলী দেখে একটু বিস্মিত হলেন। তখন পরিচয় দিয়ে বললাম—"আমি এই সিলেটি নাগরীতে ছাপা বহু বই দেখেছি—ভেবে পাইনে দ্বীপের মতো এই লিপিটি বাংলাদেশের একপ্রান্তে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলো কেন ও কেমন করে।" সেখানে বসা ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত মৌলভী। তিনি বললেন—"এই লিপি সমুদয় জেলায় প্রচলিত নেই ; সিলেট সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবী বাজার মহকুমায় আর কাছাড় জেলায় ও মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় এক সময়ে সিলেটি নাগরী পুঁথির প্রচার ছিল।" মৌলবী সাহেব আরও

বললেন—"আশ্চর্য হবেন শুনে পুরুষদের থেকে মেয়েরা এই নাগরী লিপি ব্যবহার করতেন এককালে। অশিক্ষিত মুসলমান যারা বাংলা, উর্দু, আরবী কিছুই জানে না, তারা এই লিপিতে দলিল-দস্তাবেজে সহি করতো। আমি সে রকম দলিল দেখেছি।" আমি বললাম—"ছোটনাগপুরে কায়থী নাগরী দেখেছিলাম। গিরিধিতে বাবার এক মুহুরী কায়থীতে আর্জি লিখতেন, আর মুসলমান মুন্সী উর্দুতে লিখতেন। কায়থী লিপি উঠে গিয়েছে এখন।" মৌলবী বললেন—"এই লিপি কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে শেখা যায়। বাংলার মতো মিশ্র বানান প্রায় নেই এতে, যুক্তবর্ণ মাত্র তিনটি। আর আমাদের বাংলার কথা ভাবুন তো। লোকে বলতো আড়াই দিনে সিলেটি নাগরী শেখা যায়। কিন্তু দেশব্যাপী হয়নি।" সেদিনকার কথাবার্তা ভালোই হলো। ভাবলাম ভাগ্যে সিলেটি নাগরী বই সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল।

সিলেট থেকে যাবো করিমগঞ্জে। বাসার লোকেরা আমাকে শুধোলেন—"আপনি সাঁতার জানেন?" আমি "না" বলায় তাঁরা খুবই বিস্মিত হলেন—পূর্ববঙ্গের নদীপথে ঘুরছি সাঁতার না জেনে! মনে ভাবলাম, যে নদী দেখেছি নৌকাডুবি হলে সাঁতরে পার হবে কে?

এবারও একা আমি এক নৌকোয়—সঙ্গী এক মাঝি। চলেছি দু'পাশের শোভা দেখতে দেখতে। বিকালবেলায় দেখি কারা যেন নদীতে বিরাট জাল ফেলে মাছ ধরছে। মাঝি কয়েকটা টাটকা খয়রা মাছ কিনলো তাদের কাছ থেকে। সন্ধ্যার মুখে হাত পা ধুয়ে মাঝি "নামাজ" সেরে নিলো। তারপর ছোট একটি পাথরের শীল একটি নোড়া বের হলো নৌকার খোল থেকে—একটা ছোট উনুন জ্বেলে ভাত চাপালো। তারপর লঙ্কা বাটলো শীলে, ভাত হয়ে গেলে ছোট কড়াইয়ে ছোট শিশি থেকে তেল ঢেলে সেই খয়রা মাছ রাঁধলো—কী লাল টকটকে রঙ হলো! সন্ধ্যার পর খেয়ে নিয়ে আবার হাল ধরলো মাঝি। আমি সংস্কারবদ্ধ জীব, জাতধর্মের বৈশিষ্ট্য ভুলে বলতে পারলাম না 'বন্ধু, তোমার সঙ্গেও বসে খাই।' তা পেরেছিলাম বহু বৎসর পরে বর্মায়—ইরাবতী নদীর উপরে জাহাজে। মান্দালয় থেকে আসছি—স্টীমারের সারেঙ বাঙালী দেখে আলাপ করতে এলো; বললে তার বাড়ি ঢাকায়—রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিল ঢাকায়। শান্তিনিকেতনের কথা জানে। আমি তাকে আমার জন্ত ভাত রাঁধতে বলি—একসঙ্গে খেতে বসলাম পাশাপাশি। সারেঙ বললে—"এই কাসান্দিটা খান, আমার মায়ের হাতের তৈরী।" খাওয়া হলো একসঙ্গে। খাওয়া-শেষে আমি দাম দিতে গেলাম; নেবে না কিছুতেই। বললে—"এখানে

তো বাঙালী যাত্রী কমই দেখি, আজ আপনাকে পেয়েছি, পয়সার কথা উঠতে পারে না।" সেই ঢাকা, সেই মানুষ! সে মুসলমান, আমি হিন্দু!

সুরমা নদীর উপর দিয়ে চলেছি একা—জ্যোৎস্না-আলো ছড়িয়ে পড়েছে, চারিদিকে অস্পষ্ট পাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ খুব দুর্গন্ধে চমকে উঠে দেখি নৌকার পাশ দিয়ে কী একটা ভেসে যাচ্ছে। মাঝি বললো—"বাবু একটা মাইয়ামানুষ কোথায় ডুইব্যা মরছে, তারই লাস ভাইস্যা চলছে।" ভাবলাম, কে এ হতভাগিনী—কোথায় তার ঘর?

ভোর হতেই একটা ঘাটে থামলো নৌকো। পারাপারের ঘাট এটা, তাই অনেক লোক। মাঝি বললে—"ঐ ছাখেন কতো লোক চলছে; ওদের সঙ্গে গেলেই কুশিয়ারি নদী পাবেন।" নৌকা ছেড়ে চলতে শুরু করলাম হাঁটাপথে। জনশূন্য প্রান্তর। কুশিয়ারি নদীতে গিয়ে গয়নার নৌকা পেলাম, নৌকা হচ্ছে নদী-পথের বাস। করিমগঞ্জের ঘাটে নামলাম—সামনেই শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহের বাড়ি। শশীন্দ্রচন্দ্রের ছেলেমেয়েরা সবাই শান্তিনিকেতনে পড়ে—সে সময়ে শশধর ও সমরেশ ছাত্র। সমরেশ সুমধুর গানের জন্য সবার প্রিয়। সমরেশ ও বুনি (ছাত্র) রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে দোলনায় দুলতে-দুলতে গান গেয়েছিল—"দক্ষিণ হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত প্রাণ।"

শশীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছিল, যখন ছেলেদের রাখতে বোলপুরে এসেছিলেন। আমাকে অতিথিরূপে পেয়ে খুশি হলেন খুব। যেখানে আমরা ছিলাম, তার অপর পার পূর্ব পাকিস্তান—আজ এপারে কুহু আর ওপারে কেকা ধ্বনি কলরব করে না। শশীন্দ্রবাবু ছিলেন Many a Hampden-এর একজন; তেজস্বী পুরুষ, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক। Eastern Chronicle নামে এক সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকা ছিল বৃটিশ চা-বাগিচাওয়ালাদের চক্ষুশূল। চা-বাগিচাওয়ালারা পুলিসের, ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে কতো ভাবেই না শশীন্দ্রবাবুকে নিপীড়ন করছিল।

আমি যখন এই অঞ্চলে ঘুরছি, তার কিছুকাল পূর্বে সিলেটের এক গ্রামে পুলিসের সঙ্গে ঠাকুর দয়ানন্দের দলের সংঘর্ষ হয়ে যায়; হবিগঞ্জ অন্তর্গত বামৈ গ্রামে গুরুদাস চৌধুরী ১৯০৮ সালে 'ঠাকুর দয়ানন্দ' নাম নিয়ে বিশ্বশান্তির গুরু বলে আপনাকে প্রচার করেন।

১৯১২ সালের ৬ই ও ৮ই জুলাই অরুণাচল আশ্রমে পুলিস ও মিলিটারি সিপাহীর অত্যাচার-কাহিনী সেদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন বাংলাদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী মতবাদ আর বাক্যব্যয়ে সীমিত ছিল না,—বোমা

দিয়ে ইংরেজ অফিসার ও তাদের দালালদের হত্যাকাণ্ড চলছে এখানে-সেখানে। জগৎসী আশ্রমে পুলিস জনৈক বালককে পাকড়াও করতে আসে। আশ্রমের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে সাহেবকে আসতে দেখে একজন ত্রিশূলধারী ঘোড়া ও ঘোড়-সোয়াড়ীকে আঘাত করে। একটি খণ্ডযুদ্ধ ঘটে—দয়ানন্দের প্রধান শিষ্য মহেন্দ্র-নাথ দে (M. A. B. Sc.) গুলির আঘাতে মারা যান। দুদিন পরে ৮ই বহু গুর্খা সিপাহী ও সিলেটের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার আশ্রমের লোকদের গ্রেপ্তার করে ও আশ্রম তছনছ করে অকথিত অত্যাচার করে। এসব কথা কিছু কিছু জানতাম—তবে শশীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনলাম।

শশীন্দ্রবাবু এই গুরুবাদী দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর পত্রিকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিস ও সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন, ফলে পত্রিকা চালনা বন্ধ করতে হয়। শশীন্দ্রবাবুর বাসাতেই মানগোবিন্দ রায় নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়—তিনি দয়ানন্দের শিষ্য। শশীন্দ্রবাবু বলেছিলেন—লোকটি অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন—দয়ানন্দের আদর্শে তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়। শশীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন—"আমি ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য এদের হয়ে লিখেছিলাম—ধর্মমত বা তাঁদের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না।"

করিমগঞ্জ থেকে রেলে শিলচর চললাম—সেখানে ঠাকুর দয়ানন্দের আশ্রম। বদরপুর জংশনে ট্রেন বদল করে শাখা রেলপথে শিলচর পৌঁছলাম। কাউকে চিনি না—কেবল জানি আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র অপূর্ব চন্দের পিতা কামিনী চন্দের নাম। সেকালে কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী, শিলচরের নামজাদা উকিল। তাঁর বাসায় উঠলাম। অপূর্ব ছিলেন না, তবুও পরিচয় দিয়ে আশ্রয় পেলাম। অপূর্বর কনিষ্ঠ অশোক তখন কিশোর, সে হলো আমার গাইড। তার সঙ্গে শহর ঘুরলাম—আর দেখতে পেলাম অরুণাচল আশ্রম। মনে পড়ছে—একটা টিলার উপর আশ্রম, তখন সেখানে বেশি কেউ ছিলেন না। এখন অরুণাচল নামে একটি রেলস্টেশন আছে।

শিলচর থেকে ফিরলাম।

জীবনসায়াহ্নে এসে কেবলি ফিরে ফিরে চাই। মনে পড়ছে ১৯১৫ সালের বসন্তকাল। গত বৎসর নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজীর ডারবান (নাটাল) শহরস্থিত ফিনিক্স বিদ্যালয়টা উঠে আসে শান্তিনিকেতনে। আমরা দেখলাম একদিন জন বিশ ছাত্র ও তিনজন শিক্ষক নিয়ে একটি দল হাজির হলো,

তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো নূতন বাড়ি।

অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা বলবার মতো লোক এখন কেউ নেই এখানে, তাই বলে যাচ্ছি সেদিনের কথা। মনে আছে, সেই ছাত্রদের দলে ছিল গান্ধীজীর ছোট ছেলে বালক দেবদাস। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে গুজরাটী, তামিল, তেলেগু ভাষী অনেকেই ভারত কখনো দেখেনি, অনেকের পিতামহরা চুক্তিবদ্ধ 'কুলি' হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধলে দক্ষিণ আফ্রিকা নয়া সরকারের অন্যতম সচিব জেনারেল স্মাট্সের সঙ্গে গান্ধীজীর একটা বোঝাপড়া হয়, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে, গান্ধীজী ভারতীয়দের বললেন যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে সহায়তা করবার জন্য। তারপর বিলেত গেলেন ঔপনিবেশিক সচিবের সঙ্গে দেখা করতে—যদি প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য কিছু সুরাহা করা যায়।

গান্ধীজী বিলেত থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে ফিরে জানতে পারলেন যে, তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ও নিজ পুত্র শান্তিনিকেতনে আছে। এসবের ব্যবস্থা করেন এণ্ড্রুজ সাহেব কবির সঙ্গে পরামর্শ করে। ইতিপূর্বে এণ্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন সরেজমিন তদন্তের জন্য। গান্ধীজী কস্তুরীবাঈ-এর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন তাঁদের দেখতে।

সেযুগে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশের ভালো রাস্তা ছিল না—মাঠের মধ্য দিয়ে গরুরগাড়ি আসতো, কখনো আসতো ভুবনডাঙার বাঁধের 'গাবা' দিয়ে। গান্ধীজী আসবেন বলে একটা রাস্তা বানানো শুরু হলো। তখনকার দিনে ছাত্র বলতে স্কুলের বালকদের বোঝাতো—সেই ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকরাও খাটতেন। সন্তোষ মজুমদার প্রমুখ অনেকেই হাত দিলেন কাজে। আমিও ছেলেদের সঙ্গে 'ঝোড়া' নিয়ে মাটি টেনেছি। সে রাস্তা কোথায় ছিল আজ কেউ জানে না! শচীন্দ্র বসুর বাড়ি পাশ দিয়ে সেই রাস্তা ছিল—সেই বাড়ি ও রাস্তার কোনও চিহ্ন নেই আজ।

রাত্রি বারোটার গাড়িতে গান্ধীজী—কস্তুরীবাঈ এলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা হলো মাধবীকুঞ্জে, পুরোনো আশ্রমসীমানার দক্ষিণে দুটি স্তম্ভে ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্র খোদিত আছে—সেই আশ্রম-প্রবেশমুখে তাঁদের স্বাগত জানানো হলো (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫)। পরদিন গান্ধীজীকে দেখলাম, মাথায় পাগড়ী, গায়ে কুর্তা, পরনে ধুতি, পায়ে চপ্পল। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহেবী পোশাক নয় ও আমরা নাঙ্গা ফকিরের যে ছবি দেখতে অভ্যস্ত সেরূপও নয়। তখনও তিনি মহাত্মা হননি—তিনি মিস্টার গান্ধী। সেযাত্রায় তিনি একদিন মাত্র থেকেছিলেন।

১৯শে টেলিগ্রাম পেলেন পুনায় গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যু হয়েছে—সেইদিনই রওনা হয়ে গেলেন পুণা। কবির সঙ্গে এবারে তাঁর দেখা হলো না। গোখলে ছিলেন গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু।

ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছেলেরা কঠোর জীবনযাবন করতে অভ্যস্ত। একটুকরো চটের বিছানার উপর মোটা চাদর ঢেকে শুতো বারান্দায়। তাদের লেখাপড়া দেখবার জন্যে সঙ্গে এসেছিলেন রাজঙ্গম—এক তামিল ব্রাহ্মণ, আর ছিলেন মগনলাল গান্ধী, যাঁর নামে ওয়ার্ধা অঞ্চলে 'মগনবাড়ি' নামে কলোনি গড়া হয়েছিল।

কিছুকাল পূর্বে দত্তাত্রেয় নামে এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক এসেছিলেন, বোম্বাইয়ের গ্রাজুয়েট। এখানে কিছু ইংরেজি পড়াতেন ও বাংলা পড়তেন। আমার ছোট্ট ভাই 'সু' (সুহৃৎ) তখন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র—সে দত্তাত্রেয়কে বাংলা পড়াতো এবং 'গোরা' উপন্যাস সমস্তটা তাকে মুখে মুখে অনুবাদ করে পড়িয়ে দেয়। গান্ধীজীর বাহিনী এলে দত্তাত্রেয় সেই দলে ভর্তি হলেন। এই দত্তাত্রেয় কালে 'কাকা কালেলকর' নামে খ্যাত হন তাঁর তালিমি সঙ্ঘের জন্য।

গান্ধীজী পুণা থেকে ফিরে এলেন ৬ই মার্চ। কবি তখন সুরুলের বাড়িতে—গত বৎসর সুরুলের বাড়ি নূতন করে তৈরী হয়েছে। নূতন ঘরবাড়ি কবিকে চিরদিন আকর্ষণ করেছে। সুরুলের বাড়িতে গিয়ে লিখছেন 'ফাল্গুনী' নাটক।

গান্ধীজী একদিন শিক্ষক ও ছাত্রদের ডেকে স্বাবলম্বননীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। পাচক ভৃত্যদের সেবা গ্রহণ করা অন্যায়, নিজের কাজ নিজেই করা উচিত...ইত্যাদি। বক্তৃতা শুনে আমরা খুব উৎসাহিত—নিজেদের কাজ নিজে করবো নিশ্চয়ই। সন্তোষ মজুমদার, নগেন গাঙ্গুলী, পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ প্রভৃতির ভীষণ উৎসাহ—আমরাও জুটলাম। পরদিন ১০ই মার্চ পাচক ভৃত্যদের জবাব দিয়ে ভোর থেকে সবাই কাজে লেগে গেলাম। ভোরবেলা উঠে স্নানের জল তোলা, খাবারের ব্যবস্থা করা—কিন্তু কে করবে লুচি, প্যারাকি? হালুয়াটা সহজে করা যায়। ঠিক হলো ছাতু উৎকৃষ্ট খাদ্য—কিন্তু তখন বোলপুরে ছাতু পাওয়া যায় না। পাউরুটি খাওয়া যেতে পারে। সন্তোষবাবু সভায় গান্ধীজীকে শুধিয়েছিলেন পাউরুটি খাওয়ার কথা, ঈস্ট বা তাড়ি আছে বলে প্রথমে আপত্তি করেন। আমার উপর ভার পড়লো কলকাতা থেকে ছাতু কিনে আনবার ও বর্ধমানে পাউরুটির ব্যবস্থা করবার। গেলাম কলকাতায়—বড়বাজারে না কোথায় ঘুরে ঘুরে পাওয়া গেল এক মণ ছাতু। ছাতু পাঠালাম বোলপুরে। বর্ধমানে নেমে এক রুটিওয়ালার সঙ্গে রুটির জন্য ব্যবস্থাদি করে পাঁচ টাকা আগাম দিলাম।

সকালে ছাতু খাওয়া হবে—গোলা হচ্ছে বড় গামলায়—কিন্তু এ কি! ছাতু তো নয়, এ যে ব্যাসন। সব ফেলা গেল। বর্ধমান থেকে পাউরুটিওয়ালা বোলপুরে বুক করে রুটি ঠিকই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু রসিদটা পাইনি, সেটা গার্ডের সঙ্গে এসে স্টেশনে পড়েছিল। দিন দশ পরে জানা গেল, স্টেশনে এসে রুটি পড়ে আছে। এলো যখন, তখন সেগুলো শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে। আজ সেই বোলপুরে কতো বেকারী!

যাহোক, আমাদের তা মহোৎসাহে আত্মনির্ভরতা চলছে। কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করা। তারই মাঝে মাঝে ক্লাসেও পড়িয়ে আসছি। কিন্তু যারা পড়ছে তাদেরও কাজ করতে হচ্ছে থেকে থেকে।

একদিনের ঘটনা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। আড়াইশ লোকের জন্য তরকারী হবে—অনেকগুলি লাউ বলি দিয়েছি, চাকা-চাকা করে কেটে একটা বিরাট কড়াইয়ে জল দিয়ে লাউ সিদ্ধ করতে দিলাম। একটা ত্রিশূলের মতো খুন্তি নিয়ে লাউ নাড়ছি—কিন্তু নরম তো হয় না! অনেক কষ্ট করেও লাউ সিদ্ধ করতে পারলাম না। সেই বিরাট খুন্তি দিয়ে একটা লাউ-চাকা ডুবিয়ে ধরি—যেমন খুন্তি সরিয়ে আর একটাকে ডোবাবো—দেখি আগেরটি উঠে এসেছেন উপরে। কিছুতেই লাউ ডোবেও না, সিদ্ধও হয় না।

সমস্যার অন্ত নেই। একদিন হঠাৎ ঝড় এলো—ভীষণ ঝড়বৃষ্টিও। রান্না-ঘরের টিনের চাল উড়ে গেল। একটা টিন পাশের তালগাছে বিঁধে পতপত করতে লাগলো—প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। অপরাহ্ণের মধ্যে সব শান্তি। সূর্যদেব মেঘের মধ্য থেকে বের হয়ে এলেন, যেন কিছুই হয়নি ভাবটা নিয়ে সব জলটুকু শুষে নিলেন।

নেপালবাবু বাতে ভোগেন—গান্ধীজীর উপবাস ও মাটির প্রলেপে চিকিৎসা চলছে। যাদবের টাইফয়েড—বিনোদ ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করেছেন, উপকার হচ্ছে না। সেকালে টাইফয়েডের ওষুধ ছিল না আজকালকার মতো। যাদবের পিতা আসামে কাজ করতেন, তিনি এলেন একেবারে শেষকালে। প্রাণ-কৃষ্ণ আচার্য সে-সময়ের নামী ডাক্তার—তিনিও দুবার এলেন। কিন্তু যাদবকে বাঁচানো গেলো না। যাদবকে শেষকালে 'শান্তিনিকেতন' গৃহের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাদব পিয়ার্সন সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিয়ার্সন তাঁর 'Shantiniketan' গ্রন্থখানি যাদবের নামে উৎসর্গ করেন। এই বইয়ের উপস্বত্ব তিনি শান্তিনিকেতন হাসপাতালের জন্য দিয়ে যান—পিয়ার্সনের অকালমৃত্যুর পরে এই হাসপাতাল 'পিয়ার্সন হাসপাতাল'

নামে অভিহিত হয়।

যাদবের অসুখ নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত—তখনই চলছে 'ফাল্গুনী'র মহড়া (২১শে চৈত্র ১৩২১। ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৫)। ঈস্টারের ছুটিতে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হবে। কলকাতা থেকে বহু লোক এলেন। তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা হলো আমাদের লঙ্গরখানায়। রান্নাঘর উড়ে গেছে। আদি কুটিরের উত্তরের বারান্দায় তাঁদের ভোজনাগার—শালপাতার উপর আমাদের 'ভোগ' ঢেলে দিচ্ছি। আনন্দে সবাই তাই খাচ্ছেন।

অভিনয় হতো নাট্যঘরে। সে ঘর এখন নেই এবং কোথায় ছিল তা আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে না, কর্মীরাও জানেন কিনা সন্দেহ। আর জানবারই বা প্রয়োজন কী? এসেছি চাকরি করতে—পড়াতে। রবি ঠাকুর এখানে কি করেছিলেন সেসব তো অতীতের কাহিনী। তবুও বলে রেখে যাই। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক এই ঘরেই অভিনীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয় করেন এই ঘরে। অন্য দেশ হলে সেই ঘরটিকে সেইভাবে রেখে দিয়ে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ গড়তো অন্যত্র। মনে পড়ছে লেলিনগ্রাদ থেকে অনেক দূরে প্রায় ফিনল্যাণ্ড উপসাগরতীরে পলায়নপর লেনিন যেখানে কাঠুরে সেজে কুটির বানিয়ে বাস করেছিলেন সেখানে সেইভাবে কুটিরটি রাখা আছে, তাছাড়া কংক্রীট দিয়ে অনুরূপ কুটির বানিয়ে পাশে রেখেছেন। ঘাস-পাতা দিয়ে নির্মিত কুটিরটি মাঝে মাঝে নূতন করে তৈরী করা হয়। ভ্রমণকারীরা এসে দেখতে পান লেনিন কীভাবে ছিলেন। আমরাও রাখতে পারতাম পুরাতন কালকে দেখবার জন্য। আজ অবশিষ্ট আছে 'নূতন বাড়ি'—যেটি কবি আশ্রম-সীমানার বাইরে নিজ পরিবারের জন্য নির্মাণ করেন। হয়তো বা একদিন এটিও নিশ্চিহ্ন হবে। 'দেহলি'কে পুনর্গঠন করে তবুও কিছুটা ইজ্জত বজায় রাখা হয়েছে—ওটাও তো পড়ে যাচ্ছিল। থাক এসব কথা। তবে সংক্ষেপে বলে রাখি, 'দেহলী'র সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর কোনো যোগ ছিল না—নূতন বাড়ি নির্মিত হয় তাঁর জন্য, তবে গৃহ শেষ হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নামেন। জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিমোহন সেন, দিনুবাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রভৃতি সকলেই অংশগ্রহণ করেন—অভিনয় হয়েছিল নাট্যঘরে। এই নাটকে আমি সেজেছিলাম 'জীবন সর্দার'। এরপর থেকে কবি আমায় প্রায়ই 'সর্দার' বা 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন —কেননা, দেখতেন সব কাজেই এগিয়ে যাই, হটতে চাইনে।

আশ্রমের ডাক্তার বিনোদবাবু ও তাঁর স্ত্রী লীলা দেবী থাকতেন শচীন্দ্র বসুর

বাড়িতে—বাড়িটি খড়ের, চারদিকে বারান্দা, মাঝে ঘর। শচীন বসু নাগপুরের বিখ্যাত আইনজীবী বিজয়কৃষ্ণ বসুর পুত্র—আগ্রার রাধাসোয়ামী সৎসঙ্গের শিষ্য। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজয় বসুর নামে 'হল' আছে—মনে আছে সেখানে আমি ভাষণও দিয়েছিলাম কোনো এক সভাতে। শচীন বসু ছিলেন অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ। কখনো কখনো অয়েলক্লথ মুড়ি দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকতেন —খেতেন নিজে রান্না করে। তিনি চলে যাবার সময় বাড়িটা আশ্রমকে দিয়ে যান।

'ফাল্গুনী' অভিনয় দেখার জন্য ঈস্টারের ছুটিতে বোলপুরে এলেন আমার দাদা ও লীলাদির বোন জ্যোতিদি গিরিধি থেকে—উঠলেন সেই বাড়িতে। জ্যোতিদি গিরিধি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা; দাদা গিরিধি হাইস্কুলের জনৈক শিক্ষক ও বালিকা বিদ্যালয়ের 'কেরানী'। দুজনের সঙ্গে ভাব হচ্ছে—তাই এলেন ঈস্টারটা লীলাদির কাছে কাটাবার জন্য। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আর এক বোন সুধাময়ী। সুধা আই. এ. দিয়ে এসেছেন দিদির কাছে—অভিভাবকের ইচ্ছা গ্রীষ্মের ছুটিটা এখানে থাকেন, খোলা জায়গায় শরীরটা ভালো হবে।

এই ব্রাহ্ম দত্ত পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল গিরিধিতে। পরিবারের কর্তা সীতানাথ দত্ত 'তত্ত্বভূষণ' নামে পরিচিত—সত্যই তত্ত্বালোচনায় জীবন কাটান তিনি। তাঁরা কোনো এক ছুটিতে গিয়েছিলেন বেড়াতে। দুটি বোন সুধা ও শোভাকে দেখতাম। মাঝে মাঝে নাম গুলিয়ে ফেলে খুব মুরুব্বীর মতো বলতাম—"কে সুধা, কে শোভা গো?"

বিদ্যালয় বন্ধ হলে বেড়াতে চলে গেলাম। 'সু' গেল গিরিধি। দাদা পূর্বেই ফিরে গিয়েছিলেন। পরে জানতে পারি, সুধাময়ী এই তেপান্তরের মাঠে জনহীন আশ্রমে মন বসিয়ে থাকতে পারেননি—কান্নাকাটি করে কলকাতা মহানগরীতে ফিরে যান। সেদিন রসিক পুরুষ বিধাতা হেসেছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই শান্তিনিকেতনে তাঁকে বধূবেশে আসতে হলো ২৩ বৎসর বয়সে। গত ৫৮ বৎসর ধরে তিনি আমার সকল কাজের সহায় হয়ে বিরাজিতা—একেই বলে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'।

১৯১৬ সালের গোড়ায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'ফাল্গুনী' ও 'বৈরাগ্য সাধন'-এর অভিনয় হবে, বাঁকুড়া-দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মহড়া চলছে। আমরা অভিনয়ের অংশগ্রহণকারীরা কলকাতায় হাজির। একদিন সকালে বিচিত্রা বাড়ির দোতলায় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ঘরোয়া মজলিশ চলছে—গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র তিন ভাই আছেন, আর কে ছিল মনে নেই। সেখানে আমার

ডাক পড়লো। বয়স তখন তেইশ-চব্বিশ—দিব্যি দাড়ি রাখছি। দাড়ি কেন রাখছি বলেছি তো—আমার চেহারা নাকি মেয়েলী, এ-অপবাদ শুনেছি বহুকাল। দাড়ির প্রতি আমার খুব মায়া। কবি বললেন—"প্রভাত, নবীন সর্দারকে দাড়িতে মানাবে না, দাড়ি কামাতে হবে।" আমার মাথায় তো বজ্রাঘাত—কবি বলেন কী! মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, "রথীনবাবুকে বলেছি, দাড়িতে আমায় মানায় ভালো।" কিন্তু আমার আবেদন কে শোনে। কবি হাঁক দিলেন—"পতুর্লাল"! পতুর্লাল বাড়ির দারোয়ান। এসে হাজির। হুকুম হলো—"নউয়া বোলাও।" নউয়া এলো অর্থাৎ নাপিত ধরে আনা হলো চিৎপুর রাস্তা থেকে। বিচিত্রায় দোতলার বারান্দায় আমার দাড়িগোঁফ সাফ করে দিল সে—হাত দিয়ে দেখি সব শূন্য। কবির কাছে যেতেই সহাস্যে বলে উঠলেন—"বাঃ, এই তো সুন্দর—মেঘমুক্ত প্রভাত!" ভাবলাম বলি, মেঘমুক্ত রবির শোভাও তো দেখবার মতো—কিন্তু বলবার মতো সাহস হলো না।

অভিনয়ে কী ভিড়! মনে আছে, সন্ধ্যার দিকে গেটে দাঁড়িয়ে—এক মারোয়াড়ি এলেন, শুধালেন টিকিট আছে কিনা। কোনো টিকিট নেই। স্যার আশুতোষ চৌধুরীরা একশো টাকার বক্স নিয়েছিলেন—তাঁরা আসবেন না। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক সেই বক্সের জন্য একশো টাকার টিকিট কিনলো।

অভিনয়ের পরদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্যান সম্মেলন, সেখানে যাই। যারা চিনতো তারা আমার নূতন রূপ দেখে হাসলো—যারা চিনতো না তারা চেয়ে থাকলো। সেখানে দেখি ব্রাহ্মসমাজের একটি উচ্চশিক্ষিত ছেলে খুব ভালো পাস করে খুব বড় সরকারী চাকুরি পেয়েছেন—তাঁর সঙ্গে মেয়েদের মায়েরা আলাপ করছেন কতো মিষ্ট ভাবে, যদি তাঁদের মেয়ের দিকে ছেলেটির চোখ যায়। আমি তো অখ্যাত যুবক—যারা চিনতো তারা জানতো বিদ্যা এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত, তারপর 'স্বদেশী' করে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয় এবং রবি ঠাকুরের স্কুলে মাস্টারি করে। তখনকার দিনের রবি ঠাকুরের স্কুলের শিক্ষকদের মাইনের কথা ওয়াকিবহাল মহল জানতেন; সুতরাং আমার প্রতি দৃষ্টি কারো পড়লো না।

দৃষ্টি যে একেবারে পড়েনি তা বলতে পারিনে। কিন্তু হুঁশিয়ারি বুদ্ধি রাখে এমন মেয়েও আছে—যারা ভাঙে অথচ মচকায় না। 'ভালোবাসি'—বলে ফেলেই 'তোবা তোবা' করে ওঠে। ভাবে—খাওয়াবে কি করে, ঐ তো মাইনে বোলপুরে! অতএব—। একজন তো অনেক এগিয়েছিলো, পত্রও লিখলো কয়েকখানা—সে পত্রের ভাষা আপিসি নয়। কয়েকখানা পত্র লিখেই মেয়েটার দিব্যজ্ঞান হ'লো। ভাবলো—করছি কি! খাওয়াবে কি করে? পত্র এলো

—"পত্রগুলো ফেরত দাও।" পত্রাদি ফেরত পাঠালাম। ব্যস্। তারপর ত্রিশ বৎসর পরে দেখা হলো দূরদেশে—ভারতের পশ্চিমে। সংসার করছে—দুটি মেয়ে হয়েছে। আমি সেই শহরে এসেছি জেনে সে ও-পক্ষের বড় ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো—দেখা করার আহ্বান জানিয়ে। আমি তখন চার ছেলের পিতা। কথাবার্তা শুনে মনে হলো, পুরোনো দিনের কথা এখনো কিছু মনে আছে তার।

এরকম আরও ঘটেছে জীবনে। মেয়েরা ভালোবেসেছিল আমার রূপকে—আমাকে তারা বুঝতে পারেনি। তারা ভাবতে পারেনি আমার মধ্যের সুপ্তশক্তি একদিন জাগবে।

ছুটিতে গিরিধি গিয়ে শুনি দাদা বিয়ে ঠিক করেছেন, লীলাদির বোন জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে। দাদা ইতিমধ্যে প্রাইভেটে বি. এ. পাস করেছেন। নয় মাস ছুটি নিয়ে পাটনাতে গিয়ে বি. টি. পাস করেন। ভালই কাজ করছেন গিরিধি হাইস্কুলে। স্থির হলো দাদার বিয়ে হবে ডিসেম্বরে খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে কলকাতায়।

জ্যোতির্ময়ী দেবী বি. এ. পাস করে কুমিল্লা বিদ্যালয়ের কাজ নিয়ে যান, পরে স্কুল-পরিদর্শিকার পদ পান। সে যুগে বি. এ. পাস করে এসব পদ পাওয়া যেতো। কারণ সে সময়ে গ্রাজুয়েট মেয়ে আঙুলে গুনে বের করা যেতো। কিন্তু কলকাতায় লালিত মেয়ের পক্ষে পূর্ববঙ্গের জলা দেশে নৌকোয়-নৌকোয় ঘোরা, অসময়ে স্নানাহার সহ্য হলো না শরীরে—শেষে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ডাক্তাররা সন্দেহ করেন বুকের রোগ। চিকিৎসা শুরু হলো কলকাতায়। একটু সুস্থ হয়ে গিরিধি বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিদ্যালয় কি ভাবে বামনদাস মজুমদার, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক প্রভৃতির চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল সে কাহিনী এখানে থাক।

উত্তর ভারতে

১৯১৫ সালের পূজার ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ হলে দিল্লী যাই। দিল্লী যাবার কারণ তখন দিল্লীর জয়পুরের কয়টি ছাত্র ছিল আমাদের বিদ্যালয়ে। অভিভাবকরা জানালেন যদি কেউ তাদের নিয়ে যান, তাঁরা আসা-যাওয়ার সমস্ত ব্যয় বহন করবেন। সুদূর জয়পুর-দিল্লী থেকে লোক পাঠানো সহজ নয়। লোক যাওয়া কঠিন, খরচও অনেক পড়ে। দিল্লীর ও জয়পুরের যাত্রী-ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। সেকালে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস বলে ট্রেনে এক শ্রেণীর গাড়ি ছিল মধ্যবিত্তদের জন্য; ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস ছিল ধনীদের ও সাহেবদের জন্য; থার্ডক্লাস ছিল জনতার। এখন হয়েছে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড—অর্থাৎ থার্ডের নামকরণ করা হয়েছে সেকেণ্ড। ভালই হয় যদি ফার্স্ট ক্লাসটা উঠিয়ে দিতে পারেন—তবেই বুঝব গভর্নমেণ্টের হিম্মত আছে। শ্রমিকেরা, মন্ত্রীরা থার্ড ক্লাসে তক্তায় বসে বা ছাগলের গাড়ির মতো তিন তাক আসনে শুয়ে যদি দিল্লী যেতে পারেন জনতার সঙ্গে—তবে বুঝতাম জনদরদী লোক এঁরা। মোট কথা সেকালে মধ্যবিত্তদের স্থান-মান দুই ছিল সমাজে, আজ মধ্যসত্ত্ববান লুপ্ত হয়েছে। চাষীর শস্য অন্নরূপে আমার রন্ধনশালায় আসার মধ্যে কতো মধ্যস্বত্ববান রয়েছে—তারাও না থাকলে অর্থাৎ অসংখ্য সংস্থা যা মাঠ থেকে চাষীর ঘর, সেখান থেকে শহরের কলে, সেখান থেকে আড়তে, আড়ত থেকে দোকানে আসছে—সবাই শ্রম দিচ্ছে, সময় দিচ্ছে, অর্থ লগ্নী করছে—বিনিময়ে এই মধ্যবর্তিতার জন্য নিশ্চয়ই কিছু দাবি করছে। আসলে মধ্যসত্ত্ববান নিছক অলস সমাজ নয়। তাদের স্থান আছে বিপণন ও বণ্টন কাজে। কোথায় কাপড় তৈরী হচ্ছে, বোম্বাই, আমেদাবাদের কলে—আমরা বাজারে গেলেই পাচ্ছি। সুতরাং এই চেন-কে বানচাল করলে বিশৃঙ্খলা যে হবেই—তা তো স্পষ্ট বোঝা যায়। শিল্প খনি জাতীয়করণ করে যেমন সমস্যার সমাধান হয়নি, সমবায় বুলি দিয়ে সব শোধন হবে এটাও দুরাশা মাত্র। সমবায় গঠিত হয় লোকদের নিজ গরজে, সরকারের নির্দেশে সমবায় গঠিত হতে পারে না। দেখা যাবে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বুদ্ধিমান লোক সমবায়ীর মুখোস পরে ঠিক নিজের স্থান করে নেবে। সমবায়-আন্দোলন এতো করেও দানা বাঁধছে না কেন?

অবান্তর কথা থাক—ফিরে আসা যাক ভ্রমণকথায়। আমার সঙ্গের ছেলেগুলি ছোট ছোট, তাদের নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না। তাদের শোবার

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আরামেই যাচ্ছি আজকালকার তুলনায়। পথের একটা ঘটনা মনে আছে। পাশের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে হঠাৎ একটা শব্দ ও যুগপৎ হৈ-হল্লোড় শোনা গেল। গুমডি স্টেশনে ট্রেন থামতেই শুনলাম—পাশের কামরায় একটা পশ্চিমা বুড়ীর কলেরা হয়েছে। অন্য যাত্রীরা নেমে গাড়ি বদল করে নিলো। স্টেশনে একটি বাঙালী ডাক্তার কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে পায়চারি করছিলেন; সংবাদটা শুনেই সেই গাড়িতে সেই অবস্থাতেই ঔষধপত্র নিয়ে উঠে গেলেন। গয়ায় ট্রেন থামলো। দেখি পাশের গাড়ি থেকে মরা বুড়ীটাকে বের করে প্ল্যাটফর্মে রাখছে; আত্মীয়স্বজন কাঁদছে—লোক জমা হয়েছে—কোন্ জাতের মড়া—তারপর কলেরায় মরেছে—তাই সবাই দূর থেকে তামাসার মতো করে দেখছে—আর মুখে হায় হায় করছে। সেই গাড়িটাকে রোগজীবাণুমুক্ত করবার জন্য খালি করে দেওয়ার ফলে কিছুটা ভিড় আমাদের গাড়িতেও এসে গেল। তবে যতই ভিড় হোক আজকালকার মতো ভিড় তখন ছিল না। এখন যাদের পয়সা নেই তারা ছুটছে শিল্প-কারখানা কেন্দ্রে কুলিগিরি কাজের আশায়, যাদের কম পয়সা তারা চলছে মহানগরীতে, আত্মীয় 'ভাই'রা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে সেই আশায়। আর যাদের অতি পয়সা হয়েছে—তাঁরা বের হয়েছেন ভ্রমণ উদ্দেশ্যে। তীর্থযাত্রী-যাত্রিনীরা এখনও হালসীগাঁথা হয়ে পাণ্ডাদের নির্দেশে চলাফেরা করছে। একবার আসছি সস্ত্রীক উত্তর প্রদেশ থেকে—মাঝরাত্রে দেখি একটা স্টেশনে শতাধিক কুষ্ঠরোগী ট্রেনে চাপছে, কোথায় যেন বড় মেলা বসেছে সেখানে যাচ্ছে ভিক্ষার জন্য, নিয়ে যাচ্ছে তাদের সর্দার, বুঝলাম এরা রাতারাতি চলে। স্টেশনে বাবুদের বলায় খানিকটা কৃত্রিম চেঁচামেচি করলেন তারা—যাত্রীরা ঠিক চলল। তাদের নিয়ে ব্যবসায় চলছে। মনে পড়ছে John Gay-র লেখা The Beggar's Opera নাটকে মি. পীচ্‌হামের দুর্বৃত্ত চোরবাটপড়দের নিয়ে ব্যবসার চিত্র। সুতরাং আজকাল ভিড়ের অনেক কারণ। দেখেছি বোলপুরের ভিতর দিয়ে কয়েক হাজার সাঁওতাল মেয়েপুরুষ চলেছে ধান রুইতে, আবার কয়েক মাস পরে ধান কাটাবার সময়ে আসছে সেই হাঁটাপথেই। এখন তারা বাসে আসে রামপুরহাট, সেখান থেকে ট্রেনে চেপে যায় খানা, বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা। পয়সা যখন রোজগার করছে, তখন তাদের এটুকু বিলাস—(যদি ট্রেনে চাপাকে কেউ বিলাস মনে করেন তবে তাঁরা যেন হেঁটে কাশী বৃন্দাবন যান, যেমন যেতেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ইচ্ছাপত্র, দানপত্র করে) উপভোগ করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। মানুষ খুঁজে আসছে আরাম—comfort এবং আরও comfort—যার শেষ সীমানা কোথায় তা যে আজও

আবিষ্কার করতে পারেনি—কেবলই বস্তুতার বাড়িয়ে চলেছে—মনে করছে বিলাসসজ্জার সমারোহ সংগ্রহ করতে পারলেই 'আরাম' পাবে, কিন্তু সে মৃগতৃষ্ণা মাত্র। এর পাল্টা কথা হলো কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত। নেতি, নেতি, নেতি।

দিল্লী স্টেশনে পৌছে দেখি—এ যে আমাদের বর্ধমান আসানসোলের মতোই—রাজধানীর ছাপ তখনও পড়েনি, ১৯১৫ সাল—পার্টিশনের পূর্বে দিল্লী স্টেশন কি ছিল তা আজকালকার যাত্রীরা কল্পনা করতে পারবে না। বহুকাল পরে ১৯৬১ সালে দেখেছি; তখন তাকে চিনতে পারিনি। স্টেশনে যতীন রায় এসেছেন অশোক দিলীপকে নিতে; হেম সেনের বাড়ির থেকে লোক এসেছেন সমীরকে নিতে, কমল মিত্রকে নিতে এসেছেন তার এক আত্মীয়। যতীন রায় সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন—বড় চাকুরে—এঁর ভাই সেকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার জ্ঞান রায়—অনেক স্বদেশী মোকদ্দমায় বাঙালীদের সাহায্য করতেন।

দিল্লীতে আমি উঠলাম সমীরকে নিয়ে তার মামা হেম সেনের বাড়িতে—তাঁরা ছিলেন প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে নামী লোক—চাঁদনীচকে তাঁদের দাওয়াই-খানা। বাড়ির ভিতর দিকে পরিবার-পরিজনেরা থাকে। আমি কয়দিন থেকে গেলাম এঁদের বাড়ি—দিল্লী দেখে বেড়ালাম। কিন্তু বাড়ির ভিতর কি রকম দেখতে পাইনি। বুঝলাম এঁরা পর্দানশীন। দিল্লী-আগরার রাস্তার ঝাড়ুদার-নীরা ঘোমটা টেনে কাজ করছে, তাদের হাতে পায়ে রূপার ও কাঁসার মোটা মোটা গয়না।

এই চাঁদনীচকে হেম সেনের বাড় থেকে দেখা যায়—সেই মসজিদ, যেখান থেকে এসে নাদির শাহ দিল্লী লুঠতরাজের হুকুম দেন। বোধ হয় চুখতাই নাদির শাহের ছবি এঁকেছিলেন মন থেকে—প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে। পাঠক ভুল থাকলে শুধরে নেবেন।

দিল্লী যাবার সময় ক্যানশ এবং Delhi past and present বইটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। তার সাহায্যে দিল্লী দেখে বেড়াতে লাগলাম।

শেষ দিন প্রথমেই দেখতে গেলাম 'লাল কেল্লা'—ঢুকতে গিয়ে দেখি লালমুখো বৃটিশ সৈন্য পাহারায় আছে। কালটা খারাপ, বিপ্লবীরা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—বাঙলাদেশে আর সীমিত নয়। বাইরের বাঙালী, তাতে আবার যুবক হলে—টিকটিকিদের দৃষ্টি পড়ে থাকতো তার উপর। তাই বাড়ির অভিভাবকরা সাবধান করে দিলেন। সেবার দিল্লী দুর্গ দেখা হলো না।

দিল্লী দুর্গ দেখতে গেলাম না, দেখলাম জুমা মসজিদ—এতো বড় মসজিদ

পূর্বে দেখিনি। বিরাট চত্বর—অনেক হাজার লোক সেখানে নমাজ পড়তে পারে একসঙ্গে। ইসলামী স্থাপত্য austere, bold। পাশেই দেখতে যাই এক জৈন মন্দির—সরু গলিপথ দিয়ে গিয়ে একটা টিলার উপর উঠতে হলো সিঁড়ি বেয়ে। সেখানে শিল্পের বাহুল্য কাকে বলে তা দেখলাম। জৈন মন্দিরের এই বাহুল্যই তাদের শিল্প-বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পশোভন হানিকর বলেই মনে হয়। এই মন্দির দেখতে দেখতে মনে পড়ল কলকাতার পরেশনাথের মন্দির—উৎকট সৌন্দর্য বলবো তাকে। দিল্লীর মন্দিরে জৈন সাধুর মূর্তির উপর হাতীর দাঁতের তৈরী যে ছাতা আছে তার সূক্ষ্ম কারুকার্য দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। জুমা মসজিদ ও জৈন মন্দিরের শুধু রূপগত ভেদ নয়, গুণগত ভেদ; বুঝলাম দুটো একদিনে দেখে।

কাশ্মীর গেট—যার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের দিল্লীর সম্বন্ধ জড়িয়ে ছিল—দেখলাম সেই জায়গাটা—গেটের বাইরে পাহাড় থেকে তোপ দাগা হয়েছিল। সে জায়গাগুলো দেখে এলাম। যেখানে নিকলসন মারা যান—যেখানে তোপখানা উড়িয়ে দিয়ে দুই ইংরেজ সৈন্য আত্মাহুতি দেয়—সব দেখলাম। এখন সেই পাহাড় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে শহর প্রসারিত হয়ে গেছে।

একদিন টাঙা ভাড়া করে চললাম মথুরা রোড ধরে কুতুবমিনার দেখতে; পথ জঙ্গলময়। দেখলাম নয়া দিল্লী নগর পত্তন হচ্ছে—রাস্তা তৈরি হচ্ছে পুরাতন ইমরাত ভেঙে। একটা জায়গায় দেখি খুব একটা বড় বাড়ির পত্তন হয়েছে। টাঙাওয়ালা বললে—'বড়লাট সাহেবের মোকাম বানানো হচ্ছে।' এখন সেটার নাম 'রাষ্ট্রপতি ভবন'। আজ বলছি 'নিউদিল্লী' তখন সেটা ছিল তুর্ক, পাঠান মুঘলদের শ্মশান—অসংখ্য অখ্যাত মানুষের ভগ্ন কবরপূর্ণ। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে নতুন নগরের বহু স্থান যেতে হয় এমন কি রাষ্ট্রপতি ভবনে। থাক্ সে কথা এখন।

কুতুবমিনারের চারপাশটা দেখলাম ঘুরে ঘুরে; প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি ভেঙে তুর্করা গড়েছিল তাদের প্রথম রাজধানী। হিন্দুদের রাজধানী ছিল; তাদের ইমারত ভেঙে সেই পাথর দিয়ে তুর্কি রুচিমত ঘরবাড়ি, মসজিদ নির্মাণ করেছিল—কুতুবমিনারও হয়তো সেই সব উপকরণ দিয়ে গড়া। বিজিতের ধনসম্পদ জয়ীরা পায়। পুরাতনকে ভেঙে নূতন করে ইমারত গড়ে বিজয়ীর দল। হিন্দুর অট্টালিকা যেমন ভেঙেছিল তুর্করা, মুঘলরা তেমন ভেঙেছিল তুর্কদের ইমারত। পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থের মাল-মসলা এসেছিল যক্ষদের ভাঙা বাড়ি থেকে। হয়তো নগরীর ইট দিয়ে ব্রিটিশ যুগে রেল কনট্রাক্টর খোয়া বানিয়েছিলেন। পুরাতনকে

কতকাল মানুষ আগলে আগলে বাঁচিয়ে রাখবে! তাহলে মিশরীয়দের মরা মানুষের 'মমি'ও অটুট থাকতো। তা সম্ভব হয়নি। কুতুবমিনারের উপর উঠলাম—অন্ধকার সিঁড়ি, প্রায় হাতড়ে হাতড়ে উঠতে হলো। উপরে উঠে বহুদূর দেখতে পেলাম—গাছপালার মাঝে ঘরবাড়ি, দূরে দিল্লী শহর ঝাপসা দেখাচ্ছে। কুতুবমিনারের উপর উঠছি, কী অন্ধকার। দেশলাই জ্বাললাম। কিন্তু লালপাথরে আলোর প্রতিফলন হলো না। প্রথমতলা প্রায় ৯৫ ফুট উঁচুতে, সেখানকার অলিন্দে এসে দম নিলাম। এইভাবে আরও ৫১ ফুট চড়ে দ্বিতীয়তলা ক্রমে ৫১ ফুট তৃতীয়তলা এরপর আরও দুটো তলা ২৫ ফুটে ও ২২ ফুটে। বইয়ে পড়েছি মিনারের গায়ে আল্লার নাম লেখা আরবী হরফে—লেখাগুলি এমন কায়দায় খোদাই যে নিচের থেকে উঁচুতে খোদাই লেখা ছোট দেখায় না। আমাদের কলকাতার অকটারলনি মনুমেন্ট, যাকে আজকাল শহীদমিনার বলি—তার উচ্চতা তো ১৬৫ ফুট— আর কুতুবমিনার হচ্ছে ২৪৮ ফুট—প্রায় দেড়গুণ উঁচু। একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার মনে করেন, এই মিনার মূলে হিন্দুরাজের তৈরী—কারণ এ ধরনের মিনার কোনে ইস্‌লামিক দেশে দেখা যায় না। হিন্দু গণিতশাস্ত্র অনুসারে মাপজোকে নির্মিত হয়। গল্প আছে, এক রাজকন্যা রোজ যমুনায় স্নান করতে যেতেন ; কিন্তু নদী সরে সরে যেতে থাকলে হেঁটে যেতে কষ্ট হয়। তখন রাজা স্তম্ভ বানিয়ে কন্যাকে বললেন, যমুনা দেখেই পুণ্যি কর। কিন্তু যমুনা যত সরে যায়, একটা করে তলা বাড়ে। বাড়তে বাড়তে উঠল উপরে। বলা বাহুল্য এটা গল্প মাত্র। তবে পূর্বকালের কোনো স্তম্ভকে মিনারে পরিণত করে তুর্কি সুলতানরা নূতন রূপ দেন বলেই মনে হয়।

অনেকের ধারণা গোলামশাহী প্রথম বাদশা কুতুবউদ্দীন আইবকের কীর্তি এটা। মোটেই না—এটা শুরু করেন ইলতুতমিস—আর কুতুবুদ্দিন হচ্ছেন এক সাধকের নাম। রুশের পিটার্সবার্গের সঙ্গে জার পিটারের সম্বন্ধে সেই রকম। সাধু পিটারের নামে নগরের নামকরণ। কুতুবমিনারও ঠিক তাই।

কুতুবমিনার এলাকায় আর একটা জিনিস দেখলাম, সেটা হচ্ছে লোহার স্তম্ভ। পৃথিবীতে কোথাও এর মতো স্তম্ভ দ্বিতীয়টি নেই। এটি আছে এক মসজিদের সামনে অদূরে : মনে হয় মসজিদটি কোনো মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুযুগে মন্দিরের সামনেই ছিল এই গরুড়ধ্বজ লৌহস্তম্ভ, অবশ্য গরুড়ধ্বজ এখন নেই। এই সাড়ে সাত হাত উঁচু লৌহস্তম্ভ কোনো কারখানায় ঢালাই হয়েছিল সম্ভবত। স্তম্ভের গায়ে খোদিত রয়েছে 'চন্দ্র' নাম। কে এই চন্দ্র? তা নিয়ে কতো গবেষণা হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য থেকে বাঁকুড়া

গুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ এক 'চন্দ্রে'র সঙ্গে। শোনা যায় বিহারে কোনো স্থানে এটি ছিল, অনঙ্গ পাল সেটি এখানে আনেন। তাঁরও নাম খোদিত দেখা যায়। যাক, আমি স্মৃতিচারণে ঐতিহাসিক গবেষণার শিক্ষা দিতে চাই নে। তবে দেখে বিস্মিত হলাম, কী মসৃণ। মনে হয় যেন সদ্য লিখিত হয়েছে। এতো-কাল আছে খোলা আকাশের তলে রৌদ্রবৃষ্টির মাঝে, মরিচা পড়েনি। এতো বড় স্তম্ভের নিচে মাত্র এক হাত আছে। কী করে খাড়া আছে তা বিজ্ঞানীরও বিস্ময়!

দিল্লীতে দেখবার যা আছে সবই দেখলাম, ফ্যানশর বই হাতে করে। শহরের মধ্যে সব থেকে অদ্ভুত লাগলো ট্রামগাড়ি—কলকাতার সঙ্গে তুলনা হয় না। বুঝলাম কলকাতা থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছে—দিল্লীতে মুঘলদের পত্তন হয়—সুতরাং হৃতগৌরব মহানগরীর ট্রাম ও ধনগর্বে কলিকাতার ট্রাম—শুধু ট্রাম কেন, গৃহশ্রী, পথশ্রীও পৃথক হবেই। দিল্লী আজ ভারতের সেরা নগর, পৃথিবীর দেশবিদেশ থেকে লোক আসছে সভা করতে, রাজনৈতিক বৈঠক করতে অথবা কেবলমাত্র বেড়াবার উদ্দেশ্যে—অনেক অফিস কলকাতা থেকে সরে দিল্লী গেছে। এখন কথায় কথায় দিল্লী চলো, দিল্লী চলো। মুখ্যমন্ত্রীদের প্রায়ই উড়তে হয় দিল্লীতে সভা করতে, উপদেশ নিতে।

১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেন বঙ্গচ্ছেদ রদ হলো—আর দিল্লী ভারতের রাজধানী হলো। এক বৎসরের মধ্যে নূতন রাজধানী নির্মিত হলো, তবে সে রাজধানী নয়া দিল্লীতে নয়—আর পাঁচিল ঘেরা পুরানো দিল্লীতেও নয়, দিল্লীতে অঢেল জায়গা পেয়ে এক বৎসরের মধ্যে বাদশাহী কায়দায় প্রাসাদ ও তার আশেপাশে অফিস, আদালত, ছাপাখানা, সৈন্য-বারিক, আস্তাবল প্রভৃতি অসংখ্য ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছে। সেই নূতন রাজ-ধানীতে গিয়েছিলাম। ঘুরে এলাম সব—কাছে ঘেঁষি সাধ্য কার?

মনে পড়ছে ১৯১২ সালে ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ—রাজকীয় মর্যাদায় ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হতে আসছেন। দরিয়াগঞ্জে এক বাড়ি থেকে পড়ল বোমা হাতীর উপর। মাহুত গেল মরে, লেডি হার্ডিঞ্জ শক পেলেন—তারপরে তাঁরও মৃত্যু হয়। বোমা কে ফেললে ধরা গেল না। আজ সবাই জানে কে এ কাজ করেছিল।

আজ সেই নূতন দিল্লীতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বহু বৎসর পরে দেখাতে নিয়ে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিঃ সেঠি। এই সেঠিকে দেখি কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে—ধর্মতলায় যখন সেটি ছিল। তারপর একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান পেয়েছিলাম, বক্তৃতা করেছিলাম বাঙলা

বিভাগের ছাত্র-অধ্যাপকের কাছে—আর লাইব্রেরীতে সম্মান দিয়েছিলেন আমার বহু গুণীবন্ধু।

১৯১৫ সালে দিল্লীর উপকণ্ঠে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছি কুতুবমিনার, সফ্‌দরজং, হুমায়ুনের কবর প্রভৃতি। একদিন গেলাম সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের সঙ্গে দেখা করতে। কলেজের সংলগ্ন পরিপাটি একটি বাড়িতে থাকতেন। এনড্রুজ এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন—সেই সূত্র ধরে দেখা করি রুদ্র সাহেবের সঙ্গে। রাত্রে ডিনারে খেতে বললেন; আর অতিথি ছিলেন তাঁর মেয়ে-জামাই। জামাতা বরুণ দত্ত স্কটিস চার্চ কলেজের কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক—কলকাতার রামবাগানের দত্তবাড়ির লোক—বুনিয়াদি খ্রীষ্টান এঁরা। রুদ্র সাহেব বিপত্নীক—স্ত্রী ছিলেন পাঞ্জাবী। জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীর রুদ্র কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন—রেড ক্রসের সেবাকার্যের স্বাস্থ্যসেবক হয়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সে, তাই এনড্রুজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুধীর গোঁড়া অ্যাংলিকান চার্চে লালিত—শান্তিনিকেতনে এনড্রুজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখানে স্বধর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ তো হয় না। এনড্রুজ শান্তিনিকেতনের শিশুদের দেখিয়ে বলেছিলেন, এঁদের মাধ্যমে আমি যীশুকে পাই। সুশীল রুদ্রকে শান্তিনিকেতনে দেখেছি। ঋষিতুল্য মানুষ এনড্রুজ সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক ও পাদরীর পদ নিয়ে এদেশে আসেন। তিনি অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেননি; তাঁর হৃদ্‌গত ভাব—ভারতে ভারতীয়রা শাসন করবে—তিনি খৃষ্টদাস, সেবা করবেন। এই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখেছিলাম বলে যীশুখৃষ্টের প্রতি আমি চিরদিন শ্রদ্ধাশীল। সন্ন্যাসী ছিলেন বললে ভুল হবে—কারণ আমাদের দেশের পুরাতন ও নবীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে গেলে তাঁকে ছোট করা হবে। বিদেশী হয়ে তিনিই বলেছিলেন Independent India চাই—সে কথা কত বৎসর পূর্বে বলেছিলেন।

দিল্লী থেকে টুন্‌ডলা এসে নতুন ট্রেনে চেপে আগরায় চলেছি। একা বসে আছি ট্রেনের কামরায়। একটি সুদর্শন যুবক উঠে আলাপ করল। বিদেশে বাঙালীকে, বিশেষ করে সমবয়সী যুবককে দেখলে ভালই লাগে; মনে হয় সে যেন পরম আত্মীয়। দিল্লী থেকে বের হবার সময় আমি মাথায় পাগড়ি পরে নিয়েছিলাম, মারাঠী ঢঙে মালকোঁচামুণ্ডি। দাড়ি আছে ফুরফুরে। হঠাৎ বাঙালী বলে চেনা শক্ত। যাই হোক খালি গাড়িতে যুবকটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগল। আগরা নেমে কোথায় যাব ঠিক ছিল না। মনে পড়ল

আগরা কলেজের প্রফেসার নগেন নাগ আছেন—ব্রাহ্মসমাজের লোক, আনন্দ মোহন বসুর জামাতা, বিপত্নীক—একাই থাকেন। তাঁর বাসায় গিয়ে পরিচয়াদি দিয়ে আশ্রয় চাই। তিনি আনন্দে স্থান দিলেন, কিন্তু বললেন, ফোর্ট প্রভৃতি দেখতে যাবার চেষ্টা করবেন না, আপনার যা চেহারা এ দেখেই সেখানে আটকে রাখবে। বাঙালীদের সম্বন্ধে ইংরেজের খুব ভয় তখন।

নাগ মহাশয়ের বাড়িতে সেই যুবকটি দেখা করতে আসে পরদিন। সে রাজপুত স্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক। ছেলেটি চলে গেলে অধ্যাপক নাগ আমাকে শুধালেন, "এর সঙ্গে আপনার কোথায় পরিচয়?" আমি বললাম, "টুন্‌ডলা স্টেশনে উনি আমার কামরায় এসে ওঠেন ও আলাপ করেন, পূর্বে পরিচয় ছিল না।" তিনি বার বার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, পূর্বে পরিচয় ছিল না তো? ঠিক? আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম—এমন ভাবে জেরা করছেন কেন। তারপর রাত্রে খাবার টেবিলে বসে বললেন, "এই ছেলেটি খুব বড় বংশের ছেলে —আমার কলেজের ছাত্র এবং আমারও ছাত্র ছিল। ওর কাজ ছিল স্পাইং। প্রত্যেকের গতিবিধি লক্ষ্য করা, কে কার সঙ্গে ভাব করছে, কে কোথায় যায় তাই রিপোর্ট করা ছিল কাজ।" শুনে আমি তো স্তম্ভিত। রাজপুত স্কুলে একদিন গিয়েছিলাম—তার সঙ্গে দেখা করতে, এটি শোনার পর আর সেমুখো হলাম না। অনেক অনেক কাল পরে ১৯২৭ সালে কবির সঙ্গে এখানে যাই— কবি বক্তৃতা দেন এখানে।

আগরার সম্বন্ধে Havele-এর একটা বই সঙ্গে ছিল। একদিন Public Library-তে গিয়ে Imperial Gazetteer ও Agra Gazetteer থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিই—পুরাতন আগরা সম্বন্ধে তথ্য। কিন্তু আগরার ফোর্ট দেখা হলো না, দিল্লী দেখা হয়নি যে কারণে। তাজমহল দেখলাম, তখন সামনে অনেকটা জঙ্গলের মতো ছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেই যুবকের সঙ্গে দেখা যে কলকাতা থেকে আসবার সময়ে সহযাত্রী হয়েছিল শেষকালটা। তার কাহিনীটি বলে নিই। বেচারা অতি কৃষ্ণবর্ণ; কিন্তু কোটপ্যাণ্ট পরে থার্ড ক্লাস য়ুরোপিয়ান কামরায় উঠেছিল। সেযুগে ট্রেনের কামরায় 'য়ুরোপীয়দের জন্ত' বিশেষ করে লেখা থাকতো, সেখানে ভারতীয়রা উঠতে পারতো না। ট্যাস্‌দের জন্ত থার্ড ক্লাসেও বিশেষ কামরা থাকতো। সে ছোকরা ভেবেছিল সাহেবী পোশাক যখন পরেছে, তখন সাহেবী কামরায় চড়বার অধিকার তার হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একটা স্টেশনে দেখি—মুখ কাঁচুমাচু করে গুটিগুটি আমাদের কামরায় ঢুকল। ব্যাপারটা শুনি। এক স্টেশনে নেমে দেখি, যিনি তাকে কক্ষচ্যুত

করেছেন, তাঁর বর্ণ যে ও বেচারার থেকে বিশেষ উজ্জ্বল তা নয়, এবং তাঁর গৃহিণী ও সন্তানসন্ততিদের দেখে ব্রিটেনবাসী বলে মনে হলো না ;—বরং বাংলার পশ্চিম প্রান্তের আদিবাসী বলেই সন্দেহ হলো। কাকের ময়ূরপুচ্ছ যে কী বেমানান, তা বেচারী কাকে বুঝতে পারে না। কিন্তু তখন বৃটিশরাজ শাসক। প্রত্যেক সাহেবই 'রাজার জাত' তাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম সর্বদাই। বেচারা বাঙালী ছেলেটি এক ধমকেই ময়ূরপুচ্ছ ফেলে আমাদের কামরায় আশ্রয় নিল।

মনে পড়ছে একটি কাহিনী। এক বাঙালী সাহেব তাঁর বাঙালী স্ত্রীকে মেম সাজিয়ে নিয়ে ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন। দুটি খাঁটি গোরা সাহেব সেই কামরায় উঠে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে শুরু করে। এমন সময় সেই গাড়িতে উঠেন ডেভিড হেয়ার। কাণ্ডকারখানা দেখে যখন গোরা দুটোকে ঘুঁষি লাগিয়ে আক্রমণ করতে গেলেন, তখন তারা নেমে পালিয়ে গেল। হেয়ার সাহেব বাঙালী সাহেবটির কান ধরে বললেন 'আগে সাহসী হও, গায়ে জোর করো, তারপর সাহেব সেজো।' গল্পটার সত্যি-মিথ্যে জানি নে—তবে শুনেছি।

আমাদের অধিকাংশ ভারতীয়র না ছিল সাহস, না ছিল শক্তি—তাই সাদা সাহেবরা কালো সাহেবদের অপমান করতে পারত। আর একটা গল্প—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক। এক সাদা সাহেব উঠে বাঙালী বাবুকে ফার্স্ট ক্লাসে দেখেই তো মনে মনে খাপ্পা। করলেন কি—বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে পা তুলে দিলেন ; ভদ্রলোক সরে বসলেন, আবার সাহেবের পা কাছে এলো। ভদ্রলোক ব্রাহ্ম—মন বলছে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—ব্রহ্মের সন্তান ভুল করছে। এবার পা আরও কাছে এলো। তখন ভদ্রলোক উঠে এক বিরাশি ওজনের চপেটাঘাতে সাহেবকে কাত করে দিলেন—ধুলো ঝেড়ে উঠে সাহেব এক কোণে সরে বসল।

আমি সেই যুবকটিকে বললাম, 'চলুন ঐ মিনারে ওঠা যাক।' তাজমহলের চার কোণে যে মিনার আছে তাতে তখনো ওঠা যেতো। আমরা উঠছি—কী অন্ধকার। যুবকটি ভয় পেয়ে বলে উঠল—'ও মশায়, আমাকে ধরুন।' আমি হাসতে হাসতে হাত ধরি—তারপরে দুজনে উঠি। বুঝলাম মানুষটি খাস কলকাতার—কখনো ঘর ছেড়ে বের হননি—শ্বশুরবাড়ির নিমন্ত্রণে বঙ্গদেশ ছেড়ে বের হয়েছেন। বহু বৎসর পরে সস্ত্রীক দেখেছি তাজমহল জ্যোৎস্নারাতে—সে সন্ধ্যার ছবি গাঁথা আছে মনে।

যমুনা পার হয়ে ইতমদ্দৌলা দেখতে যাই একদিন। নূরজাহানের পিতার সমাধি। আমি এই স্থাপত্য নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে হলো সৌন্দর্যের

দিক থেকে এই ছোট সমাধিগৃহ তাজমহলের থেকেও সুন্দর। তাজমহলের সঙ্গে প্রেমের কাহিনী জড়িত বলে সেই সৌধ আজ ভাবময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের মান নিয়ে বিচার করলে ইতমতদ্দৌলাকেই বরাসন দেবো।

এ যাত্রায় না দেখা হলো আগরার দুর্গ—না ফতেপুর শিকরী। অবশ্য প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে দেখলাম ১৯৬১ সালে। সেবার উঠি আগরা হোটেলে। সে কথা এখন থাক।

আগরা থেকে মথুরা এলাম। একাই চলেছি। উঠলাম একটা ধর্মশালায় —জীবনে এই প্রথম ধর্মশালায় বাস। পরে কাশীতে দুইবার পাঁড়ের ধর্মশালায় উঠেছি। ধর্মশালা কি গোশালা ঠিক বুঝলাম না। একটা একদ্বারী ঘর—মেঝেতে বা ঘরের ভিতর কোনো আসবাবপত্র নেই—মেঝেটা অসমান। অসংখ্য যাত্রী। ইঁদারায় ভিড় করছে, ঝগড়া করছে, পায়খানায় যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে লোটা নিয়ে। হঠাৎ সেখানে দেখা মিঃ অনাথ সরকারের সঙ্গে—কলকাতায় ফল প্রিজার্ভ করার কারখানা করে বেশ যশ অর্জন করেছিলেন। বাঙালীর মধ্যে তিনিই পথিকৃৎ হন এই ব্যবসায়ে। থাকতেন বদরীদাস গলিতে। তাঁর স্ত্রী স্নেহনলিনীদিকে জানতাম গিরিধিতে। সে বাড়ির সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনাথবাবুকে ধর্মশালায় দেখে খুব খুশি হলাম—তাঁর সঙ্গে আরও দুজন বন্ধু ছিলেন। সবাই একটা ঘরে থাকলাম। বাজার থেকে পুরি-তরকারী এনে ছোটখাটো একটা ভোজ করা গেল। তারপর আমি মথুরা পরিক্রমণে বের হলাম। প্রথমেই গেলাম স্থানীয় মিউজিয়ামে। মথুরায় দেখবার মতো জিনিস হচ্ছে সেখানকার মিউজিয়ামটি। গান্ধার স্থাপত্য ভাস্কর্যের নমুনাসমৃদ্ধ। মুণ্ডহীন কনিষ্কের বিরাট মূর্তি—কোমরে বাঁধা তরবারি—পায়ে লম্বা জুতো। কণিষ্ক সম্বন্ধে আমার বিদ্যা ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্যন্ত। সহদর্শকদের মধ্যে একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন, আমি খুব তন্ন তন্ন করে সব দেখছি, সেটা লক্ষ্য করে বললেন,—'মনে হচ্ছে আপনি ইতিহাসের ছাত্র?' আমি বললাম, 'ঠিক ধরেছেন, তবে আভিধানিক অর্থে ছাত্র বলতে যা বুঝায় তা আমি নই।' সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। মনে হলো অস্পষ্ট ভাবে বুঝলেন—কারণ রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর পূর্বে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে তাঁর তার নামটা লোকে জানে। সহদর্শক একজন অধ্যাপক, অর্থাৎ কলেজে পড়ান—স্কুলে পড়ালে বাঙলায় বলি শিক্ষক বা মাস্টার—আর কলেজে পড়ালে বলি অধ্যাপক—প্রফেসর। যাক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম তাঁর জ্ঞানের উৎস ভিনসেণ্ট স্মিথ।

আমি আর বললাম না যে সে বই আমার পড়া। যাহোক, মিউজিয়ামে দেখে ধর্মশালায় ফিরলাম। বহুকাল থেকে জানি এখানকার সংগ্রহের মধ্যে আছে কণিষ্কের মুণ্ডহীন "মূর্তি"—যার ছবি দেখেছি ইতিহাসের বইতে। ছোট মিউজিয়াম হলেও পুরাতন জিনিস দেখবার মতো।

মথুরার সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এককালে মথুরা অসুর সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়, কারণ এটা মধু অসুরের রাজধানী ছিল বলে নাম হয় মথুরা। তারপর অসুরদের পতনের পর এ স্থানটা জঙ্গলে পূর্ণ হয়—লোকে বলত মধুবন। কংস ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই নগরের সম্বন্ধের কথা মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে; লোকে যমুনার তীরে একটা ভগ্নস্তূপ দেখিয়ে বললে, ওখানে কংসরাজের প্রাসাদ ছিল।

মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাব—ছয় মাইল পথ—ঠিক করলাম টাঙায় যাব শেয়ারে। ধর্মশালা থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় উঠেছি—দেখি সামনের বাড়িতে কয়েকটি মেয়ে বসে। একজন বয়স্কা মেয়েমানুষ একটা মেয়ের ঘাড়ে হাত দিয়ে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে; আমি ভাবলাম পাগলী। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বললাম—তাঁরা হেসে উঠলেন আমার কথায় ও বর্ণনায়, তখন বুঝলাম ওরা কারা; তা না হলে দিন দুপুরে পথচারীদের আহ্বান করে কখনও! গল্প শুনেছিলাম বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে গোপীরা কৃষ্ণভক্তদের যত্ন করে। এ তো বৃন্দাবন নয়।

বৃন্দাবনে গিয়ে উঠলাম প্রেম মহাবিদ্যালয়ে; মহেন্দ্রপ্রতাপ নামে এক ব্যক্তি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি একটি কারীগরি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দান করে দেশত্যাগী হন এবং ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর কীর্তিকাহিনী বলতে গেলে পুথি বড় হয়ে যাবে। পরে জানতে পারি প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে মহেন্দ্রপ্রতাপ, জার্মান সেনাপতি ফন্ ডর-গোৎজ (von der Goltz) আফগানিস্তানে এসেছিলেন, খোঁজখবর নিতে। বহু বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন—শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বেড়াতে। তখন তিনি বৃদ্ধ, বিপ্লবীর তাপ নির্বাপিত।

প্রেম মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মহারাষ্ট্রীয় কোটাল, তাঁর বাসায় আশ্রয় নিলাম। কোটালের সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী সংক্ষেপে এখানে বলতে হয়। ১৯১৫ সালে বর্মা থেকে ব্যারিস্টার ও বস্ত্রব্যবসায়ী গুজরাটী মিঃ মেহতা তাঁর তিন ছেলেকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন মিঃ কোটালকে অভিভাবক শিক্ষক করে। সেই সূত্রে কোটালের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব হয়।

মেহতারা চলে যাবার সময়ে তিনি বর্মা যান বোধ হয়; তারপর কী ভাবে প্রেম মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পান সে সূত্র জানা নেই। যাই হোক, সেই পরিচয়ের সুবাদে উঠলাম সেখানে। দিন দুই ছিলাম। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে একদিন শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছিল—ঘরোয়া ভাবে, কোন্ ভাষায় বলেছিলাম মনে নেই—বোধ হয় হিন্দীতেই। ন্যাশনাল কলেজে হিন্দী পড়েছিলাম, আর গিরিধিতে ছিলাম বলে চলতি হিন্দী বলতে পারতাম এবং এখনো পারি, অবশ্য 'লিঙ্গ' নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই না। হিন্দী ভাষা তার sex-complex ত্যাগ না করতে পারলে সর্বভারতীয় ভাষা হবে না। কনেস্টবল আতে হ্যায় আর পুলিস আতী হ্যায়। একজন বলেছিলেন—পুলিস যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে পুংলিঙ্গ কে?

বৃন্দাবনে দেখবার অনেক কিছু আছে। বিশেষ করে দেখেছিলাম পরিত্যক্ত 'গোবিন্দ মন্দির'। যেটা মুগল বাদশাহ অওরঙ্গজেবের আদেশে অপবিত্র হয়। এখানকার বিগ্রহ সম্বন্ধে কতো গল্প শুনলাম। আগরা থেকে অওরঙ্গজেব মন্দির ভাঙবার হুকুম দেন। হুকুম তামিল করবার জন্য লোক ছুটলো। আর যুগপৎ দরবারে উপস্থিত এক রাজপুত সেনাপতি এই আদেশ শুনে সেই রাতেই দূত পাঠালেন—বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত করবার জন্য। জয়পুরে সেই মূর্তি দেখি।

আমি খালি পায়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সমস্ত মন্দিরগুলি দেখেছিলাম—বলা বাহুল্য ধর্মলোভে নয়, স্থাপত্যরীতি দেখবার ও বুঝবার জন্য আগ্রহ ছিল বেশি। বৃন্দাবনে বাঙালী বৈষ্ণব অনেক—একদিন দেখতে যাই। শুনেছিলাম বৃন্দাবনে কুঞ্জবন আছে, সেখানে নাকি কত কী হয়; আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যবশত সে রকম অভিজ্ঞতা হয়নি। মথুরায় পথের ধারে বাড়ি থেকে হাতছানির আতঙ্ক বৃন্দাবনেও ছিল। তাই কুঞ্জবন আবিষ্কারের সাহস হয়নি। বৃন্দাবন শব্দের মধ্যে 'বন' আছে, কিন্তু 'বৃন্দা'র অর্থ কী। শুনি তুলসীগাছের এক নাম 'বৃন্দা'। মনে হয় এটা বৈষ্ণব ভক্তদের ব্যাখ্যান। যমুনার ঐ পারটা ছিল 'নাদাড়'—সেখানে আহীর গোপদের বাস ছিল। যমুনার অপর পারে মথুরায় থাকতেন রাজা কংস অথবা তাঁর পূর্বে মধু অসুর। গোপরা নগরে কাজ করত। সেই গোপ পরিবেশে বা গোয়ালাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত কাটে।

প্রেম মহাবিদ্যালয় থেকে যমুনা দূরে নয়। রোজই স্নান করতে যেতাম—বহু তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় লোক পুণ্যার্জনের জন্য স্নানে আসতো। জলে নেমে

দেখি—অসংখ্য বড় বড় কাটুয়া (কচ্ছপ) ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকে খাবার দেয় বলে, কেউ জলে নামলেই খাদ্যলোভীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যেতো। তাদের ভয়ে ভাল করে স্নান করতে পারতাম না। মনে পড়ে কলকাতার বদরীনাথের মন্দিরে ফোয়ারার নিচে জলাধারে রঙীন মাছগুলোর লোভীপনা—মুড়ি খই দিয়েছি—ঝুপ ঝুপ করে খেয়েই আবার ঘুরতে থাকে। কলকাতা লেকের মধ্যে একটি মসজিদ আছে—তারের পুল আছে চলাচলের। সেই হ্রদে মাছ মারা নিষেধ; তাই বড় বড় মাছ নির্ভয়ে জলে বেড়াচ্ছে—লোকে তারের সাঁকো দিয়ে চলছে বুঝতে পারলেই খাবার পাবার আশায় এসে হাজির হয়।

কোটাল মহারাষ্ট্রীয়—সেখানে তাঁর আত্মীয় মহিলা থাকতেন। দেখলাম মেয়েদের মাথায় ঘোমটা নেই, শাড়ি পরা কাছা দিয়ে। মারাঠা দেশ পার্বত্য—ঘোড়ায় চড়বার এই বেশ। এখন সে দেশের 'শিক্ষিতা' মেয়েরা ওভাবে শাড়ি পরে না, তারা বাঙালী বা গুজরাটী ফ্যাশানে শাড়ি পরাই পছন্দ করে। মনে আছে, ন্যাশনাল কলেজে যখন পড়ি, বাঙলার অধ্যাপক সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙালী মেয়েদের পর্দানশীনী ও ঘোমটা পরা নিয়ে ঠাট্টা করে গল্প বলেছিলেন—"আমি একদিন আমার এক বাঙালী বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম—ভিতর থেকে একটি মহিলা দরজা খুলেই আমাকে দেখে জিভ বের করে দেখালেন—তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে যখন পালালেন তখন পিঠের কাপড় উঠে গেছে—আদুড় গা বের হয়ে পড়েছে।" সেযুগের পক্ষে কথাটা খুবই সত্য। বলা বাহুল্য অর্ধশতাব্দীর মধ্যে যুগান্তর হয়ে গেছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে; টাইট স্লাক্স্—পোশাকে আবৃত নারীদেহ দেখা যায়,—মফস্বলে এলো বলে—গ্রামেও আসবে—'একাকার' হবে। এককালে বাঙলাদেশে হিন্দু মেয়েরা পর্দানশীন ছিল এবং পুরুষ অন্তঃপুরে যেতো না, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর দেখা হতো না দিবালোকে; তার কারণ নিশ্চয়ই নারীরা যে সূক্ষ্ম শাড়ি পরে থাকতেন তা প্রায় বটমলেস পর্যায়ে পড়ার মতো, আর যে অংশ উপরে আবৃত করতেন তা টপলেসের সমতুল্য। ছোটনাগপুরের রাঁও মেয়েরা, কেরালার কয়েকটি উপজাতীয় নারীরা দেহের উপরটি অনাবৃত রেখেই ঘুরতো; খৃষ্টান পাদরীরা এসে তাদের সভ্য করলেন—শেমিজ, কামিজ, সায়া, বডিস পরাতে শেখালেন। বলিদ্বীপেও বক্ষনগ্ন নারীরা পাশ্চাত্ত্য সভ্য পর্যটকের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'সভ্য' হয়ে উঠেছে। বাঙলাদেশের গ্রীষ্মকালে দারুণ গরম ও বর্ষাকালের বৃষ্টিতে বাঙালীর পোশাক স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছিল।

ইতিহাসে পড়েছি ভরতপুরের দুর্গ ইংরেজ প্রথমবার (১৮০৫) দখল করতে পারেনি। শুনেছিলাম দুর্গপ্রাচীর নাকি মাটির তৈরি, তাই লর্ড লেকের গোলন্দাজদের গোলা গিয়ে মাটিতে লাগে—দেওয়াল ভাঙতে বা ফুটো করতে পারেনি। পাথরের গাঁথনি হলে গোলার ঘায়ে ঘায়ে পাথরের ইটগুলোর বন্ধনী যায় ঢিলে হয়ে এবং ধীরে ধীরে ইট-পাথর যায় খসে, তখন সেই ভাঙা পথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে আক্রমণকারী সৈন্যদল। মাটির প্রাচীর ভাঙতে পারেনি ইংরেজ। আর একশ বৎসর পরে মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল নগরের প্রাচীরদুর্গ অধিবাসীদের নিরাপদে রক্ষা করতে পারে না। কামানের গোলা আসছে ঢিলের মতো, তীরের মতো উপর দিয়ে, কামানের মুখ যন্ত্রের সাহায্যে ওঠা-নামা করে। সে যুগের কামান তা পারতো না বলে লেক সাহেবের ভরতপুর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। অবশ্য পরে ইংরেজ জয়ী হয়—ভরতপুর 'করদ' রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সেই ভরতপুর দেখতে চললাম আগরা থেকে।

ভরতপুরে একজন বাঙালী পুলিসের কাজ করেন—তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কার সুপারিশে ঠিক মনে পড়ছে না। মনে আছে, স্টেশন থেকে নেমে একায় চাপার অভিজ্ঞতা। তখন ভরতপুরের রাস্তা ছিল পাথরের ইট দিয়ে তৈরি, স্প্রিংহীন একায় পাথরের পথ দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তিনি ছাড়া কেউ বুঝবেন না এই গাড়িতে চড়ায় কী সুখ। ঝাঁকানি ও লাফানির চোটে হাড় পাঁজরা যায় বুঝি! শেষকালে দুই হাতের উপর ভর দিয়ে তাদের করলাম স্প্রিং। পুলিস দারোগার বাড়ি পৌঁছিয়ে পত্র দিলাম। পুলিস ভদ্রলোককে তখনই কোথায় বের হতে হচ্ছে—খুব ব্যস্ত, তবুও বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে গেলেন। স্নান-খাওয়া করে সারাদিন টো টো করলাম। দেখতে গেলাম সেই মাটির প্রাচীর ও তার পরিখা—তখনই তার অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, বা নষ্ট করা হয়েছে। কারণ এ যুগে মাটির স্তূপের স্থান জুড়ে থাকার সার্থকতা আর নেই—প্রাচীর ঘেরা শহরে আর জনসংকুলান হচ্ছে না—তাই প্রাচীর ভেঙে, পরিখা ভরাট করে শহর বেড়ে চলেছে। কলকাতার মারাঠা ডিচ আজ কোথায়? ভরতপুর আবার একবার দেখি বারো বৎসর পরে (১৯২৭) কবির সঙ্গে যখন আসি। সেবার রাজঅতিথিরূপে অনেক কিছু দেখেছিলাম—সে কথা যথাস্থানে আসবে। এবার মাটির প্রাচীর দেখবার সখ ছিল—তা হলো।

ভরতপুর থেকে চললাম জয়পুর। পথে বান্দীকুই স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হয়। স্টেশনের প্লাটফর্মে ছোট একটি বোঁচকা নিয়ে বসে, একমাত্র বাঙালী

আমি। তবে সর্বদা মাথায় পাগড়ি বেঁধে নিতাম—পাছে লোকের কৌতূহল হয় নেংগা মাথা মানুষ দেখে।

ট্রেন এলো। যে-গাড়িতে উঠলাম তার সব যাত্রীই আজমীঢ় যাচ্ছে। সবাই খৃষ্টান—সেখানে তাদের চার্চের লোকদের এক সম্মিলন হবে। প্রথমে কামরায় উঠতে দিতে আপত্তি ছিল কিন্তু দয়া হলো পরে। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে যেটুকু বিদ্যা আমার ছিল—ইতিহাসের ছাত্ররূপে তাই নিয়েই কথাবার্তা শুরু করলাম। দেখলাম তারা মধ্যযুগের সন্তদের সম্বন্ধে কিছু জানে না,—এরা প্রোটেস্টাণ্ট। মাদাম গেঁয়ো, ব্রাদার লরেন্স, থেরেসা ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি সম্বন্ধে আমি যখন বলতে আরম্ভ করলাম, তখন দেখি আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়ছে। গল্প করতে করতে স্বল্প পথ কেটে গেল। এই পথে যেতে যেতে দেখলাম বালির সমুদ্র—দূরে ছুটে পালাচ্ছে হরিণ, আর ময়ূরগুলি কাক-শালিখের মতো রেলের পাশে তারের বেড়ায় বসে আছে। মাঠের পথে চলেছে উটের সারি মালপত্র পিঠে করে—কোনো কোনোটার পিঠে একটা পরিবার ছেলেপুলে নিয়ে বসে। গরুরগাড়ি গ্রামপথে চলেছে, চাকার অর নেই—কাঠ জুড়ে চাকার মতো করা—খুব প্রাচীনকালের স্থাপত্য পাথরের উপর খোদাই করা এই ধরনের গরুরগাড়ির ছবি দেখেছিলাম, এখনও গ্রামে শহরে সেই প্রাচীনকাল এমনি ভাবে জীবনের নানা স্তরে টিকে আছে। বর্তমানে বাইরের খোলস বদলাচ্ছে অনুকরণের আকর্ষণে, কিন্তু ভিতরটায় রয়ে গেছে আদ্যিকালের বুড়োটা। সহযাত্রী খৃষ্টানদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম যে তারা হিন্দু পুরাণ ছেড়েছে, কিন্তু ইহুদী পুরাণ ধরেছে—অর্থাৎ এক প্রাচীনের কুসংস্কার ছেড়ে আর এক প্রাচীনের কুসংস্কার আঁকড়ে ধরেছে। আসলে কোনো ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ অলৌকিকতা ছাড়া নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সবাই কী অলীক অসম্ভব সংস্কারের বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছেন! সেই সব মত প্রচার করেছেন! আর এই মূঢ় জনতা সে সব শুধু বিশ্বাস করেই খুশি হয়—যারা বিশ্বাস করে না তাদের উপর হামলা চালানো পবিত্র ধার্মিকের লক্ষণ বলে মনে করে। এখন ভাবি মানুষের মনের মুক্তি সহজে হয় না, সর্বদা সজাগ না থাকলে মন ঝিমিয়ে পড়ে—তখন শয়তান অহ্রিমণ মার মেফিস্টোফিলিস এসে যেন সব শান্তিকে হরণ করে, মনের মধ্যে চেপে বসে নির্বুদ্ধিতা। দুর্বুদ্ধি তোয়াজে তোয়াজে ফেঁপে ওঠে। সেই মূঢ়তাকেই ধর্ম বলি। হায় রে মানুষের দেবতা!

জয়পুরে নামলাম। সমীরের পিতা সুবোধ মজুমদার স্টেশনে এসেছেন আমায় নিতে। ইনি শান্তিনিকেতনের পুরাতন শিক্ষক—সন্তোষ মজুমদারের

নিকট-সম্পর্কীয় খুল্লতাত—রবীন্দ্র-ভক্ত। তাই ছেলেদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তে দেন। সুবোধবাবুকে আমি শান্তিনিকেতনে কাজ করতে দেখিনি, তবে একবার ছেলেকে রাখতে আসেন, তখন পরিচয় হয়। সমীর খুব শিশুকালে শান্তিনিকেতনে ছাত্র হয়ে আসে; সবারই প্রিয় ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা গ্রন্থের পাঠকরা মাঝে মাঝে সমীর পুঁথির উল্লেখ পান—সমীরের পিতা সুবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে খাতাটি নিয়েছিলেন—তাকেই আমরা 'সমীর পুঁথি' নাম দিয়েছি, কারণ সমীর সেই খাতার সন্ধান দেন। শ্রীকানাই সামন্ত তাঁর 'রবীন্দ্র প্রতিভা' গ্রন্থে এই পুঁথির সদ্‌ব্যবহার করে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

সুবোধবাবু জয়পুর রাজসরকারের কর্মচারী। জয়পুরের সঙ্গে বাঙলাদেশের সম্বন্ধ প্রাচীনকাল থেকে। মানসিংহ বাঙলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম। প্রতাপাদিত্যকে হারিয়ে তাঁর রাজধানী লুটেপুটে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন ও যাবার সময়ে যশোরেশ্বরী কালীমূর্তিটি নিয়ে গিয়ে তাঁর রাজধানী অম্বরের প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে কিংবদন্তী আছে। কালীর পূজার জন্য ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসেন। আমি যখন অম্বর প্রাসাদ দেখতে যাই, তখন কালীবাড়িতে এক ছোকরা পুরোহিতকে দেখি—খোলা গা, হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, দাঁড়িয়ে ভক্তদের প্রসাদ দিচ্ছে। তাকে শুধিয়েছিলাম—তোমার বাড়ি কোথায় ছিল? সে বললে, 'নদে সাঁতিপুর' অর্থাৎ নদীয়া শান্তিপুরে। নামও বলেছিল কি 'ভট্টাচারিয়া'। বাঙালিত্ব আর কিছু নেই।

রাজা জয়সিংহ নতুন নগর পত্তন করবার সময়ে বাংলাদেশ থেকে বিদ্যাধর পণ্ডিতকে ডেকে আনেন; তাঁরই পরিকল্পনা মতো নতুন রাজধানীর পত্তন হয়—হিন্দু বাস্তুবিদ্যা বা Town Planning অনুসারে। খুব ভাল করে নগর বিন্যাস দেখেছিলাম। পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত রাজপথগুলি বিস্তারিত—তার কারণ সারাদিন সূর্যের তাপ ও আলো পাবে পথ। নগরের কাছিমপিঠা ও মাঝ দিয়ে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণে পথ—একটা যেন জলচ্ছেদক; নগর পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারটি গেট। প্রথমবার যেবার এলাম, তখন প্রাচীরের বাইরে শহর মাত্র ছাপিয়ে পড়তে শুরু করেছে। সুবোধবাবুদের বাড়ি খাস জয়পুরের বাইরে। ১৯৬১ সালে যখন জয়পুরে যাই, তখন দেখলাম নয়াদিল্লীর মতো জয়পুর থেকে বৃহত্তর জয়পুরের পরিধি বহুগুণ ব্যাপ্ত হয়েছে।

সমীরের ভাই-বোনেরা খুব আপনার হয়ে গেল; সমীরের মায়ের কী যত্ন পেলাম।

জয়পুর সম্বন্ধে একখানা বই যোগাড় করেছিলাম, তাতে ম্যাপও ছিল।

সেইটি হাতে করে সারাদিন ঘুরতাম। একদিন গেলাম গলতা পাহাড়ে। কবে কোন্ কালে সেই পাহাড়ের নির্জনতায় সাধনা করতে এসেছিলেন কোনো সন্ন্যাসী। তারপর ধর্মলোভাতুর মানুষ নিজের দৈনন্দিন অপকর্ম থেকে রেহাই পাবার জন্য সাধুসেবা, মন্দির স্থাপন শুরু করে নির্জন তীর্থস্থানগুলিকে শহরে পরিণত করে তুললো—পাপের প্রশ্রয় ও পাপীর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলো তীর্থ-স্থানগুলি।

দেখলাম বেশ একটা বড় গ্রাম হয়ে উঠেছে—মন্দিরে, বাজারে, ভিখারীতে, সন্ন্যাসীতে, সাধুতে, শঠেতে মাখামাখি। দ্বিতীয়বার যাই, জ্যোৎস্নারাতে মোটরগাড়ি করে ঘুরে আসি। প্রথমবারের সেই চড়াই পাথুরে পথ দিয়ে ওঠার ক্লান্তি এবার হয়নি, কিন্তু সেইদিনকার গ্রাম্য গল্‌তার চিত্রটা মনে আছে।

আজমীঢ়ে দেখবার অনেক কিছু আছে। তাই এবার গেলাম আড়াই দিনকা ঝোপড়া দেখতে—চিস্তির দরগা পেরিয়ে যেতে হয়। ইতিহাস শুনতে হয় টাঙাওয়ালাদের কাছে—তারাই তো উত্তর ভারতের কিংবদন্তীমূলক গাল-গল্পগুলি পুরুষানুক্রমে ধরে রেখেছে। কুতবুদ্দীন আজমীঢ় দখল করেন এবং ওখানে যে জৈন মন্দির ছিল সেটা বোধ হয় আড়াই দিনে ধ্বংস করেন। তাই আড়াই দিনের প্রবাদ। সেটাকে মসজিদে পরিণত করেন, তবে আড়াই দিনে ঘর করা যায় না। অবশ্য আজকাল শুনছি, পড়ছি—কয়েক ঘণ্টায় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এটা যন্ত্রযুগ, তাই সম্ভব হয়েছে। ইমারত নির্মাণ শেষ হয় ইল্‌তুত্‌মিস-এর সময়ে। মসজিদের অনেকটাই মহাকাল মুছে দিয়েছিলেন দেখলাম, ভাগ্যে বৃটিশ যুগে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণে মন দেন, তাই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। কতক-গুলি স্তম্ভের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার মতো, আর মজার ব্যাপার দুটো শিল্পের রীতি একরকম নয়। এই বিশাল মসজিদ তুর্করা ভারত জয়ের আট বৎসরের মধ্যে নির্মাণ করে ফেলে। ভাবলে হাসি পায়—বীর রাজপুতরা তখন ছিলেন কোথায়? চিরদিনই হিন্দুরা গাঁয়ের এক পাড়াতে আগুন লাগলে নিজের দাওয়ায় বসে ভাবে সে নিরাপদ। কিন্তু হঠাৎ হাওয়া যায় বদলে, আগুনের ফুল্‌কি এসে পড়ে বাড়ির চালায়। তখন হায় হায় করা ছাড়া উপায় থাকে না। ভিন পাড়ার লোক, যার ঘর পুড়েছিল, সে তখন মনে মনে বলে, 'আমার ঘর পোড়ার সময়ে তো আসনি! এবার মরো। কে যাবে তোমার ঘর সামলাতে?' এই হচ্ছে ভারতের ইতিহাস।

আজমীঢ়ে বাসকালে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে স্যার টমাস রো (Roe) দেখা করতে আসেন ইংরেজ কোম্পানীর জন্য সুবিধা পাবার ভরসায়, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে

বাদশাহকে দেখতে পান সে স্থানটি দেখলাম, তখন সেখানে বাজার। কোথায় গিয়েছে মুঘলদিনের গৌরব!

বিকালে বেড়াতে গেলাম হ্রদের তীরে। শাহজাহানের সময়ের নির্মিত শ্বেত পাথরের সোপান বেয়ে নেমে গেলাম জলের ধার পর্যন্ত। অনেকক্ষণ বসে থাকলাম—মনে মনে সেই অতীত কালের ছবিটা আনতে চেষ্টা করলাম। কতো নরনারী আমারই মতন এই সোপানের ওপরে বসেছিল—কতো স্বপ্ন দেখেছিল, কতো ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছিল এখানকার স্তব্ধ আকাশ। ম্লান অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—ফিরতে হলো মেসবাড়িতে।

পরদিন সকালে চললাম পুষ্কর তীর্থে। টাঙাগাড়ি রাস্তায় এসে ভাড়া করলাম। যেতে আসতে বারো মাইল—ভাড়া বোধ হয় দেড় টাকা মাত্র। পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ, পথে ভিড় নেই—শুনলাম কার্তিকী পূর্ণিমায় বিরাট মেলা হয়। সে মেলা দেখিনি, তবে বহু বৎসর পরে ভাঙা হাট দেখেছিলাম, তার কথা যথাস্থানে বলব। পুষ্কর তখন ছোট গ্রাম্য শহর। টাঙা গিয়ে থামল একটা জায়গায়—দেখি ছয়জন পাণ্ডা বসে আছে একটা পাঁচিলের উপর উবু হয়ে। আমাকে দেখামাত্র ছুটে এলো, ভাবল ভালো শিকার হবে। আজমীঢ়ে আসবার সময়ে টাঙার কাছে আমার হাতে হ্যান্ড্‌বিল দিয়েছিল, বাঙলায় ছাপা। একজন ভাঙা বাঙলায় বলেছিল, 'আমার ভাই পুষ্করের পাণ্ডা, তার নাম করলেই হবে, সবাই চেনে।' টাঙা থামতেই পুষ্করের পাণ্ডারা ঘিরে এলো, বললে, 'বাবু, আপনার শ্রারধ উর-ধ সব সম্পন্ন করে দেগা, পাঁচরুপেয়া সে।' আমি বললাম, 'বাপু, আমার চেহারাটা দেখে কি মনে হচ্ছে শ্রাদ্ধ করতে এসেছি!' তারা ভাবল বোধ হয় পাঁচ টাকা দিতেই আমার আপত্তি। তাই পিঠ-পিঠ বললে, 'তবে পাঁচ সিকামে!' অর্থাৎ শ্রাদ্ধ পাঁচসিকা পেলেই করে দেব। আমি বললাম, 'পাঁচ পয়সাও নয়', আমার কাছে বই আছে, সব দেখতে পাব এই বই থেকে।' সত্যই বই এনেছিলাম সঙ্গে করে। তখন নাছোড়বান্দা একজন সঙ্গ নিলো। বললাম, 'চার আনা পয়সার বেশি দেবো না।' তাতেই সে রাজী। আর আমারও তখন ওর থেকে বেশি দেবার অবস্থা ছিল না। তন্ন তন্ন করে প্রায় দেড় ঘণ্টা সব দেখলাম; তারপর পুষ্কর হ্রদে স্নান করতে গেলাম। গিয়ে দেখি হ্রদের মাঝে পাথরের দ্বীপে কুমীর রোদ পোয়াচ্ছে—একটা নয় অনেক কয়টা। মনে হলো জলের মধ্যে কয়েকজন বিচরণ করছে। সন্তর্পণে স্নানে নামলাম—পাণ্ডা চোখ রাখল জলের দিকে কুমীরগুলোর উপর। স্নান সেরে উঠলাম, পাণ্ডা কাপড় এগিয়ে দেয়। খাবার কিনে এনে হাতে তুলে দেয়।

বেচারা! শুনলাম ব্রহ্মার মন্দির একমাত্র এখানেই আছে, আর ভারতে কোথাও নেই। ত্রিমূর্তির আদি ব্রহ্মার স্থান বিষ্ণু ও শিব দখল করছেন ; শুধু তাঁরা নন—বিষ্ণুর দশ অবতার—তাঁদের পত্নী, পুত্র, কন্যা, বাহন সবাই নানা নামে ভারত জুড়ে বসেছেন। শিব তো পুজো পান ; দুর্গা, অন্নপূর্ণা, কালী প্রভৃতি অসংখ্য নামে তাঁর স্ত্রী-শক্তি মন্দিরে মন্দিরে স্থান করে নিয়েছেন—দুই মেয়ে ও দুই ছেলেও দেবদেবী হয়েছেন। এমন কি শিবের বাহনটি যদৃচ্ছক্রমে উৎপাত করে বেড়ালে কারও মারবার অধিকার নেই—সে ধর্মের ষাঁড়। কেবল ফাঁকিতে পড়েছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মন্দির বালিয়াড়ি পেরিয়ে একটু দূরেতে।

টাঙার কাছে আসছি—পাণ্ডাটাকে চার আনা দিলাম। তখন সে বলছে, 'আর কিছু দিন, এই চার আনার ছয়টা 'হিস্‌স' হবে'—অর্থাৎ যে ছয়জন পাণ্ডা বসেছিল, সবাই চার আনায় ভাগ বসাবে। আমি তাকে আরও দুই আনা দিলাম। টাঙার কাছে আসতেই সেই পাণ্ডারা জিজ্ঞাসা করলো, 'কেতনা দিয়া ?' বললাম, 'হামসে জো বাত হুয়ে, উহী দিয়া।' মিথ্যা কথা বলা হলো না—চার আনা তো দিয়েছি! পাণ্ডাকে পথে শুধিয়েছিলাম সে লেখাপড়া জানে কিনা ; ব্রাহ্মণের ছেলে। বললে 'জানে না।' সংস্কৃত গায়ত্রী, সন্ধ্যাআহ্নিক কিছুই বলতে পারলে না। দেখে অবাক হয়েছিলাম, এদের উপর হিন্দুধর্ম রক্ষার ভার!

আজমীঢ়ে তখন অত্যন্ত জলকষ্ট ও শস্যাভাব ; শুনলাম গরু-ঘোড়া জলাভাবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সে-যুগে এ ধরনের জলকষ্টে, খাদ্যাভাবে সরকারের মন ও ধন আকর্ষণ করা সহজ ছিল না ; তাছাড়া তখন আজমীঢ় ব্রিটিশের খাস শাসনাধীন।

রাজপুতানায় দেখবার স্থান তো কত আছে! কিন্তু আমার পয়সা ও সময় দুই-ই কমে আসছে। তাই ভাবলাম কাছেই তো সম্বর হ্রদ—দেখে আসিনে কেন! শুনলাম সেখানে নিমক মহলে এক বাঙালী আছেন। চললাম তাঁর ভরসায়। ফুলেরা জংশন আজমীঢ় থেকে খুব দূরে নয় ; মাইল পঁচিশ মাত্র। ফুলেরা জংশন থেকে রেলপথ সম্বর হয়ে যোধপুরের দিকে গিয়েছে। ট্রেনে বোধ হয় আমিই একমাত্র বাঙালী যাত্রী। সম্বর ছোট স্টেশন, যানবাহন কিছু নেই ; নিমকীবাবুর ডেরা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন কিনা জানিনে। কারণ দেখলাম কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধু এসেছেন এবং দেখলাম পরিবার-পরিজনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বেশ তরল অবস্থায় আছেন। তখনো সমাজ আজকালকার মতো এতটা উদার হয়নি ; তাই সামাজিক অনাচার সাধারণ ঘরের লোকেরা লুকিয়ে-

চুরিয়ে করতেন ; আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে ক্লাবে খাওয়ার অভ্যাস তখনো তেমন চালু হয়নি। ভদ্রলোক আমাকে সকাল সকাল খাইয়ে দিলেন। আমি বারান্দায় বসে থাচ্ছি, এমন সময়ে কলকাতার বাবুত্রয় এলেন সেখানে। একজন গোলগাল চেহারা, গোঁফদাড়ি কামানো, বয়স আন্দাজ করতে পারলাম না— দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু পা টলছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন ভাঙা গলায়, 'চলবে নাকি?' গৃহপতি বললেন, 'ইনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, এসব চলবে না।'

খাওয়ার পর ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝছেন তো, আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে রাত হবে। তা ছাড়া এখানে গোলমালের মধ্যে ঘুম হবে না। আমার মুন্সির বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা করেছি।' কিছুদূর গেলাম, একটা মাটির পাঁচিল দেওয়া বাড়ি, ভিতরে খাপবাব ঘর—সরু বারান্দায় খাটুলি পাতা, যেখানে শোবার ব্যবস্থা। আমার কাছে ছোট সতরঞ্চ ছিল—তাই পেতে বোঁচকা মাথায় দিয়ে শুলাম খোলা আকাশের তলে—খাটুলি টেনে আনলাম উঠানের মাঝখানে। শুয়ে আছি--শুনছি ঘরের মধ্যে কাতরানি। তা হলে লোক আছে ভিতরে। যে লোকটি এসেছিল সঙ্গে সে বললে, মুন্সির বাড়িতে কার যেন টাইফয়েড হয়েছে, সেই লোকটা প্রলাপ বকছে। বেশ ভালো জায়গায় বন্দোবস্ত হয়েছে। আর ভদ্রলোককে দোষ দিতে পারিনে—সম্বরের যেখানে তিনি বাস করেন, সেখানে লোকবসতি বিরল—তাঁর নিজের বাড়িতে কলকাতার বন্ধুরা এসেছেন---আমি তো সম্পূর্ণ অযাচিত অতিথি।

সকালে উঠে বোধ হয় গেলাম লবণ হ্রদ দেখতে। লবণ খাই—কোথা থেকে কেমন ভাবে পাই জানিনে। হ্রদের কাছে গিয়ে দেখি চৌকো চৌবাচ্চা পাশাপাশি অনেক, তাতে সর পড়ছে—সেই সর বড় বড় হাতললাগানো চামচে করে মজুররা ডাঙায় ফেলছে। শুকিয়ে গেলে ঝুড়ি করে স্তূপ করছে। লবণের পাহাড়। কুলিরা ঝুড়ি ভরে মাথায় করে এনে স্তূপ করছে। নিকটেই রেল লাইন পাতা—মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। ডাঙার কাছে মাটি-মেশা লবণ—এই লবণই কি পবিত্রজ্ঞানে করকচ নামে বাবা খেতেন রবিবারে। আর বিধবা আত্মীয়রা এই লবণ অথবা সৈন্ধব ব্যবহার করতেন। বিলাতী লবণ আসত ইংলণ্ড থেকে। মনে আছে বিলাতী লবণ 'বর্জন' নিয়ে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনকালে কত কাণ্ডই না হয়েছিল। অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টায় বরিশাল জেলার কোনো বাজারে বা গঞ্জে বিলাতী লবণ পাওয়া যেতো না—সফেদ লবণ ছেড়ে সকলে কালো করকচ খেতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদের

একটা কারণ ছিল, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ 'বয়কট'। মনে পড়ছে, আমরা গ্রামের লোকদের বলতাম 'বিলাতী লবণ' জাহাজের খোল বোঝাই হয়ে আসে, তার মধ্যে সাহেব ও খালাসীদের গোমাংস, শুকরমাংস রাখা থাকে পচবে না বলে। এসব কথা বললে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বিরক্ত হবে। এখন মনে পড়ছে ১৯৩১ সালের লবণ আন্দোলনের কথা।

সম্বর হ্রদ দেখে সেইদিনই রওনা দিলাম—এবার গন্তব্যস্থল স্বস্থান, তবে একটু ঘুরে লখনৌ দেখে গেলে হয় না? কত বেশি খরচ হবে আর!

ভোরবেলায় লখনৌ পৌছলাম। কাউকে চিনিনে, একমাত্র পরিচিত ছিলেন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন। কয়েক বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন; লাইব্রেরির পাশেই যে টালির ঘর ছিল, তার পশ্চিমদিকে একটা ঘরে থাকতেন দিনুবাবু। সেখানে অতুলপ্রসাদের গান শুনি। সেই ঘরে শিশু বিভাগের ছোট সমরেশ, বুনি এসেও গান শুনত—গান তখন শান্তিনিকেতনের ভিতরের জিনিস ছিল। ছাত্ররা ডিপ্লোমা-ডিগ্রির জন্য লালায়িত হয়ে ভিড় শুরু করেনি তখনো। স্কুলের ছেলেরা দিনুবাবু, অজিতবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে একত্র বসে কখনও ঘরে কখনও শালতলায় গান জমাতো। কালে এমন দিন এলো যখন 'পণ্ডিতদের' পক্ষে গানের কোলাহল সহ্য করা সম্ভব হলো না। তারপর একদিন বিশ্বভারতী ঘোষণা করেন পেশাদার গায়ক সৃষ্টির দোকান খুলবেন তাঁরা—সেদিন গান নির্বাচিত হলো আশ্রমের হৃদ্‌কেন্দ্র থেকে বাইরের সীমানায়।

অতুলপ্রসাদের কণ্ঠস্বর এখনও কানে বাজছে। গান তো কণ্ঠ দিয়ে গাইতেন না—সমস্ত অন্তর থেকে গান উৎসারিত হয়ে উঠতো। জীবনটা ছিল সুমহান ট্র্যাজেডি।

লখনৌর বাড়িতে তখন কেউ ছিল না, কেবল ছিল তাঁর মুন্সী ও ভৃত্যরা। তারাই থাকবার ব্যবস্থা করে দিল—বাজার থেকে খাবার আনিয়েও দিল। তাদের কাছে শুনলাম, মেমসাহেব এখন নেই লখনৌতে—তিনি এক দর্জির দোকান খুলেছেন বাজারে। শুনে অবাক্ হয়ে গেলাম। বুঝলাম কোথাও একটা গোলমাল আছে।

মুন্সী এক টাঙাওয়ালাকে বলে দিলেন শহর ঘুরিয়ে দেখাতে। ঘুরে দেখা ছাড়া খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। তাই টাঙা চড়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হলো—উপর থেকে যা দেখা যায় তাই হলো মাত্র। ভাঙা রেসিডেন্সির পাশ দিয়েও ঘুরে গেলাম। এসব ভালো করে দেখি বহু বৎসর পরে, যখন প্রায় পনের দিন ছিলাম এখানে। যথাস্থানে সেকথা আসবে।

কলকাতায় বৎসর দুই

শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ায়, সাত বৎসর পরে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চললাম কলকাতায় চাকুরি করতে নূতন পরিবেশে। ইতিপূর্বে ১৯০৮-০৯ সালে ছিলাম ছাত্ররূপে। মেসে থাকতাম। অভিভাবক ছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। এবার সেখানে বাসা করে থাকতে হবে।

আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছি কেন সে-প্রশ্ন সদাঃ পাঠকদের মনে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ছিলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপের দিকে যাওয়া খুবই মুশকিলের, তাই গিয়েছেন জাপান ও মার্কিন রাষ্ট্রে বক্তৃতা সফরে। তিনি থাকলে হয়তো আমার কলকাতা যাওয়ায় বাধা দিতেন। সামান্য কয়টা টাকার জন্য—মাত্র পাঁচটা টাকার জন্য—দরখাস্ত করে ব্যর্থ হয়ে ভাবলাম দেখা যাক বাইরে গিয়ে বেশি টাকা পাই কিনা। কর্তৃপক্ষ জানতেন—"ম্যাট্রিক পাশ তো নও, কোথায় চাকরি পাবে।" কিন্তু পেয়ে গেলাম কলকাতার সিটি কলেজে, গ্রন্থাগারিকের পদ,—জীবনে এই একবারই দরখাস্ত করি এবং সফল হই।

বর্ধমান স্টেশনে দেখি দাদা পশ্চিমের এক ট্রেনের কামরায়—আসছেন গিরিডি থেকে; যাচ্ছেন কলকাতায়—খৃষ্টমাস ছুটিতে তাঁর বিবাহ হবে। এক গাড়িতে উঠলাম। হাওড়ায় নেমে দুই ভাই চললাম বেচু চাটুজ্জে স্ট্রীটে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায়। তখন কলকাতায় এমন আত্মীয়স্বজন ছিলেন না, যাঁদের বাড়িতে উঠতে পারি। সতীশবাবুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় গিরিডিতে; সেই সামান্য পরিচয় থেকে আত্মীয়ের মতো হয়ে যান। তাই দুই ভাই উঠলাম তাঁর বাসাতেই।

আমার কথা বলবার আগে এই বিস্মৃত দেশসেবকের কথা এখানে আগে বলে নিই। সতীশচন্দ্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের গণিতের অধ্যাপক। তারপর একদিন আশ্রয় নিতে হয় কলকাতায়। কেন নিজ দেশ ছেড়ে কলকাতায় আসতে হলো এখন সেই কাহিনীটি বলি।

আজকার পাঠকদের স্মৃতির বাইরের ঘটনা। ১৯০৫ সালে একবার বঙ্গচ্ছেদ হয়। তখন দুটি রাষ্ট্র হয়নি, হয়েছিল বৃটিশ ভারতের দুইটি প্রদেশ বা প্রভিন্স। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র—কয় বৎসর পূর্বেও ঐ অঞ্চল ছিল

পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রদেশ। ১৯০৫ সালের এই 'পার্টিশন অব্ বেঙ্গল' বা বঙ্গচ্ছেদ শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মনঃপূত হয়নি; তাই তা রদ করবার জন্য শুরু হয় আন্দোলন। প্রথম বৃটিশরাজের কাছে হাতকচলে আবেদন নিবেদন, তারপর গলা ফাটিয়ে চিৎকার। তাঁরা বললেন ওটা একটা settled fact—পার্টিশন নড়চড় হবে না। বাঙালীরও রোক চাপলো। আন্দোলনের হাতিয়ার হলো বৃটিশ পণ্য বর্জন। সেকালে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি থেকে সর্বপ্রকার নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র আসতো বিলাত থেকে। স্থির হলো বৃটিশের আঁতে ঘা লাগবে, যদি আমরা বৃটিশ পণ্য বর্জন করি। তাই বস্ত্র ও লবণ বর্জন ঠিক হলো। পূর্ববঙ্গের নেতাদের উৎসাহ বেশি—ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি মহানগরীতে। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ হয়ে ওঠে আন্দোলনের বড় রকম কেন্দ্র। জেলার অবিসম্বাদী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত। প্রচারের ফলে বরিশাল জেলায় হাটে-বাজারে বিলাতী বস্ত্র, বিলাতী লবণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। সেকালের বস্ত্র আসতো ইংলণ্ডের ম্যানচেস্টার থেকে, লবণ আসতো লিভারপুল থেকে—চেশায়ার লবণ কোম্পানী ছিল মালিক। বৃটিশ পণ্য বর্জন অর্থ হচ্ছে বৃটিশের চোখে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দমন করতেই হবে। তাই অখণ্ড বাংলার এই বয়কট আন্দোলনের বাছা বাছা নেতাদের অন্তরীণ করা হলো। বৃটিশ যাহ করুক আইনমাফিক করে। তাহ ১৮১৮ সালের একটা রেগুলেশন অনুসারে তাঁদের অন্তরায়িত করা হয় ৯০৮ সালে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এই সতীশ চাটুজ্জে। অবশ্য তিনি একা নন, ব্রজমোহন কলেজের স্থাপয়িতা দেশবরেণ্য অশ্বিনীকুমারও ছিলেন, আর বরিশাল বানারিপাড়ার মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। ঢাকা থেকে পুলিনবিহারী দাশ, ভূপেশচন্দ্র নাগ, কলকাতা থেকে সঞ্জীবনী সাপ্তাহিকের সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ছাত্রনেতা শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, (যিনি পরে কৃষ্ণকুমারের কন্যা, 'শিখের বলিদান' নামে গ্রন্থের লেখিকা কুমুদিনী মিত্রকে বিবাহ করেন), শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—বাগ্মী সাংবাদিক, পরে Servant নামে ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক; আর ছিলেন এই দলে সুবোধচন্দ্র মল্লিক—যিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন বলে লোকে বলতো 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক। আজ তাঁর নাম স্মরণ করে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নাম হয়েছে 'সুবোধচন্দ্র মল্লিক স্কোয়ার'।

সতীশচন্দ্র মুক্তি পেলেন ১৯১০ সালে, কিন্তু বরিশালে থাকতে পাবেন না এই হলো সরকারী হুকুম। তাই অবশেষে কলকাতার সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদ পেয়ে সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর সঙ্গে আরেকজনকেও বরিশাল

ত্যাগ করতে হয়—তাঁর নাম রজনীকান্ত গুহ—ইংরেজির অধ্যাপক, অবাঞ্ছিত বলে তাঁকে বরিশাল ত্যাগ করতে হয়। তিনিও আশ্রয় পান সিটি কলেজে। ব্রাহ্মদের পরিচালিত সিটি কলেজ অনেককেই আশ্রয় দিয়েছিল সেকালে।

এই সতীশ চাটুজ্জের বাসায় এসে উঠলাম শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে নূতন কাজ পেয়ে। তাঁরই চেষ্টায় ঘর পেলাম ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক সুগায়ক কাশীচন্দ্র ঘোষালের বাসায়, নিচের তলায় একখানি ঘর, ভাড়া ছয় টাকা আর তাঁদের বাড়িতে আহারাদি করবো বলে আরও দশ টাকা। আজকাল অভাবনীয়। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর চলছে, কিন্তু তার তরঙ্গ-তাপ এখানে এসে পৌঁছায়নি। বিজলি বাতি বাড়িতে ছিল না, তাই ডিট্‌জ লণ্ঠন কিনলাম—বোধ হয় দেড় টাকা দাম—খাস আমেরিকার নিউইয়র্ক ছাপ মারা বাতি; এমন কি বাতির চিমনি তাও বিদেশী, কেরোসিন তাও বিদেশী, দেশলাই তাও সুইডেন বা জাপানের। পলতেটা কোথায় বোনা হতো জানি না। এই ছিল ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে দেশের শিল্পের অবস্থা।

ঘরের জন্য একখানা খাট কিনেছিলাম—জারুল কাঠের তৈরী, চার-পাঁচ টাকার মধ্যেই বোধ হয়। টেবিল একটা ঘোষালরা দিয়েছিলেন—খাটে বসেই কাজকর্ম করতাম। আমার নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে একটা ট্রাংক, বিছানা, কাঠের একটা প্যাটেন্ট বাক্স—যাতে ছিল আমার লেখা কাগজ, লেখার ব্যারাম বহুকালের তো—তাই সেই বাক্সে ছিল কত যে রাবিশ তা মনেও নেই। ঝরা পাতার সন্ধান কে রাখে আর রাখার প্রয়োজনই বা কি।

১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি সিটি কলেজের কাজে যোগদান করলাম। তখন সিটি কলেজ ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটের উপর—গোলদীঘির ধারে; নূতন বাড়ি তৈরী হচ্ছে আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর। কোন্ মির্জার নামে যে এখানে পল্লী ছিল তা জানিনে, তবে আজ যার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন—আজ এই পথের নাম সূর্য সেন সরণী, চট্টগ্রামের বীর-শহীদ।

নূতন কাজে এলাম। ইতিপূর্বে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কাজ করেছি—এবার বড় ছেলের মধ্যে কাজ করতে হবে। নূতন অভিজ্ঞতা হলো। তাদের মন জয় করে নিলাম, কারণ তারা আমার কাছ থেকে গ্রন্থাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে পারতো। মনে পড়ছে বহু বৎসরের পরের একটি ঘটনা, বাসে কোথায় যাচ্ছি, স্থানাভাব—দাঁড়িয়ে আছি। একজন ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি এখানে বসুন।' আমি চিনতে পারিনি। তিনি বললেন, 'আমি সিটি কলেজের ছাত্র ছিলাম,

আপনি যখন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, আমার ইংরেজি অনার্স ছিল—আপনার কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেতাম।' শুনলাম এখন তিনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। সেকালে কলেজে লাইব্রেরিয়ানদের কোনো মানমর্যাদা ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান থাকতেন একজন অধ্যাপক আর দৈনন্দিন কাজকর্ম যিনি চালাতেন তিনি কেরানী-লাইব্রেরিয়ান। বহু বৎসর পরে এলাহাবাদে যাই—বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ভক্তপ্রসাদ ত্রিবেদী লাইব্রেরিয়ান; কাজকর্ম সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির আসাদুল্লা সাহেবের কাছে শিক্ষিত, কিন্তু দেখলাম জনৈক আনাড়ী অধ্যাপক হচ্ছেন ত্রিবেদীর Boss। সে দুর্দিন এখন কেটে গেছে।

সিটি কলেজের গ্রন্থাগারে বই যে পদ্ধতিতে বর্গীত ছিল তা আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়। তাঁরা অন্ধভাবে সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজের পদ্ধতি অনুসরণ করেন —ডিউইর দশমিক বর্গীকরণের মূল তত্ত্ব না বুঝে যা-তা ভাবে বর্গীকরণ। আমি কলেজের কয়েক সহস্র বই প্রায় ডিউইর মতে শ্রেণীত করে ক্যাটালগ ছাপিয়ে ফেলি।

কাজ করছি নিষ্ঠার সঙ্গে—ছাত্র অধ্যাপক সকলেই খুশি, কিন্তু দেখলাম অধ্যাপক ও অন-অধ্যাপক বা করণিকদের মধ্যে দুস্তর ভেদ। বেতনের কথা বাদই দিলাম—সামাজিক ব্যবহারে ব্যবধান বড়ই মনে লাগে। শান্তিনিকেতনে এটা তো অনুভব করিনি কোন দিন—কে দু'শো টাকা পায় আর কে বিশ টাকা পায় তা বোঝা যেতো না চায়ের মজলিশে। সিটি কলেজ লাইব্রেরীর পাশের ঘরে অফিসে মাঝে মাঝে চায়ের মজলিশ বসতো; মজলিশ যতক্ষণ না শেষ হতো আমাকে লাইব্রেরীতে থাকতেই হতো। কিন্তু কোনো দিন ভুলেও কারও মনে হয়নি পাশের ঘরে যুবকটি সেই সকালে দশটায় এসে লাইব্রেরী খুলে বসে আছে, টিফিনের সময় নেই—একে এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিই! কলকাতায় এসে বুঝলাম চা-ক-রই করতে এসেছি। শুনেছি পড়েছি যে উর্ধ্বতন 'অফিসার' জাতীয় জীবের অসৌজন্যকর ব্যবহারে অধস্তনের মানুষ বিদ্রোহী হয়েছে—উত্তর-প্রদেশের সশস্ত্র কনস্টবলদের কথা স্মরণীয়, কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষের 'এই নাক-উঁচু ভাবটাই সব নয়—মানও পেয়েছি। একদিন অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু ডেকে পাঠালেন। তিনি কার কাছে শুনেছেন যে আমি পড়াশুনা করি এবং খবরাখবর রাখি। তাই আমাকে বললেন, শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু statistics তাঁর প্রয়োজন—বিশেষ করে পৃথিবীর শিক্ষাখাতে কোথায় কত ব্যয়িত হয় আর তার সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক তথ্য তাঁর প্রয়োজন। তিনি কুমারখালির প্রাদেশিক

সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ লিখবেন। আমি বললাম, 'এসব তো এখানে নেই, আছে আমার বাসায়।' তিনি অসহায়ভাবে বললেন, 'তুমি এখনই যাও, আমাকে এনে দাও।' আমি তখনই ট্রামে করে বাসায় চলে যাই এবং সেই যে কাঠের বাক্সর কথা বলেছি, তার থেকে তথ্য সম্বলিত নোটগুলি নিয়ে আবার ট্রামেই ফিরি ও হেরম্ববাবুকে সমর্পণ করি। প্রসঙ্গত বলি, আজ কুমারখালি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত। হেরম্ববাবুর দেশ ছিল কুমারখালি।

ছুটিছাটা পেলেই চলে যাই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি—এখন যার নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি। যাবার কারণটা বলি। সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে Indigenous Education of N. W. Provinces নামে একটা বিরাট সরকারী রিপোর্ট পাই, লেখকের নাম মনে আছে (Leitner) লাইটনার। বোধ হয় লর্ড রিপনের সময়ে যে এডুকেশন কমিটি বসে, এখানি সেই সময়ে সম্পাদিত। নর্থ-ওয়েস্ট প্রভিন্স বলতে বুঝায় আজকালকার উত্তর প্রদেশ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৯০১ সালে গঠিত হলে এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নূতন নাম হয় ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস অব্ আউধ এন্ড আগ্রা, সংক্ষেপে বলা হতো 'ইউ পি'; সেই 'ইউ পি' এখন উত্তরপ্রদেশ। যাক নাম তত্ত্বকথা। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে ভারতের শিক্ষা ইতিহাস পড়তে শুরু করি। লাইটনারের পর পড়লাম অ্যাডামের 'ভার্নাক্যুলার এডুকেশন ইন্ বেঙ্গল' বইটা। এটা লর্ড বেন্টিকের সময়কার রিপোর্ট—বহুকাল দপ্তরে পড়েছিল, রেভারেণ্ড লং তাকে দপ্তর-গর্ভ থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। স্বাধীন ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বইখানিকে পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন—বহু নূতন তথ্যাদি দিয়ে অধ্যাপক অনাথ নাথ বসু সম্পাদন করেন। এই বইখানিতে পড়ি যে, বাংলাদেশের এক-একটা টোলে এতো পণ্ডিত আছেন যে ব্রিটেনের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের লোকে এই ভাষা আয়ত্ত করতে পারতেন—জনতা নিরক্ষরই থেকে যেতো। উত্তর প্রদেশ ও বাংলা দেশের কথা পড়া হলো, এবার পড়লাম এল্‌-ফিনস্টোন সাহেবের মহারাষ্ট্র দেশের শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবেদন। এলফিনস্টোন সাহেবের ভারত ইতিহাস এককালে সুপরিচিত গ্রন্থ ছিল, কলেজেও ছিল পাঠ্য—আজ তিনি বিস্মৃত। এলফিনস্টোন সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা উচিত। তিনি ছিলেন স্কট—নামী অভিজাত বংশীয়, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন ১৭৯৬ সালে। তারপর বহু বৎসর বহুস্থানে বিচিত্র সরকারী কার্য করে ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাই তিনি বোম্বাই অঞ্চলের গবর্নর

থাকাকালে শিক্ষা বিষয়ক যে রিপোর্ট দেন তার মধ্যে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, দেশোয়ারদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংস না করে তাদের আধুনিকীকরণে ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁর এই উপদেশ ভারত সরকার গ্রহণ করেননি—তাঁরা পুরাতন পাঠশালা, টোল, মকতব, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে অবহেলা করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলেন। শিক্ষা বিভাগের সাহেব ডিরেক্টর মহোদয়দের বাৎসরিক রিপোর্ট পড়ি—দেখি দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে তাঁরা যেন খুশি। বৃটিশ কূটনীতিকরা জানতেন যে এই বিপুল জনতাকে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল করে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় আকৃষ্ট করতে হবে ; তাই একদিন ঘোষিত হলো যে সরকারী স্কুলের ছাত্ররাই সরকারী চাকুরি পাবে। বোধ হয় ১৮৪৩ সালে লর্ড হেস্টিংসের সময়ে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। আমি স্মৃতি থেকে লিখছি, ভুল থাকলে পাঠক শুদ্ধ করে নেবেন।

এইটি লিখতে লিখতে মনে পড়ছে ইতিহাসের পুরাতন একটি ঘটনা। রোমানরা বৃটেন জয় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন সেনাপতি হাদ্রিয়ানকে। হাদ্রিয়ান এসে বৃটেনে বহু লাতিন বিদ্যালয় খুলে দিলেন ; তারপর দেশে ফিরে গেলে সিনেটররা তাঁকে শুধোয়, কী করে এলে বৃটেনে! তিনি বললেন, আমি লাতিন স্কুল স্থাপন করে এসেছি। মূর্খ সিনেটরগণ বললেন, 'তোমাকে দেশ জয় করতে পাঠিয়েছিলাম, স্কুল খোলবার জন্য পাঠাইনি।' হাদ্রিয়ান বলেছিলেন, 'এর পরে দেখতে পাবে।' তারপর যখন রোমের দুর্দিন ঘনিয়ে এলো, তখন বৃটেন থেকে রোমান সৈন্য অপসারণের প্রয়োজন হলো, রোম রক্ষার জন্য। রোমান সৈন্য চলে গেলে শিক্ষিত বৃটনরা আর্তনাদ করে উঠলো—'রোমানরা চলে যেয়ো না' ; ইতিহাসের এটি Groans of Britain নামে পরিচিত। আজ ভারতেরও সেই দশা, ইংরেজ গিয়েছে শাসকরূপে, কিন্তু ইংরেজিয়ানা হাড়ে হাড়ে জট পাকিয়ে গেছে—English Medium School-এ ভর্তি করবার জন্য অভিভাবকরা ফিরিঙ্গি স্কুলে ধর্ণা দিচ্ছেন, একে বলে cultural conquest বা দাস মনোভাব দেগে দেওয়া।

সিটি কলেজের নূতন বাড়ি তৈরী হলো আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপর ; পাশেই নির্মিত হলো ছাত্রাবাস যার নাম হয় 'রামমোহন হস্টেল'। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে সিটি কলেজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে চলতো। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্রাহ্মরা। সেই সুবাদে ছাত্রাবাসের নাম হয় 'রামমোহন হস্টেল'। কয়েক বৎসর পরে এই হস্টেলে সরস্বতী পূজা নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হয়, তা আমার কলকাতা বাসের পরের

ঘটনা বলে এখানে আর আলোচনা করলাম না।

সিটি কলেজের নূতন বাড়ি তৈরী হয়ে গেল, পুরাতন বাড়ি থেকে কলেজের সাজসরঞ্জাম এখানে স্থানান্তরণ আরম্ভ হলো; লাইব্রেরির বই আসছে—নূতন শেলফ-আলমিরা তৈরী হচ্ছে, কাঠমিস্ত্রিরা কাজ করছে আর আমরা বই সাজিয়ে তুলে ফেলছি। কলেজের কয়েকজন ছাত্র স্বেচ্ছায় আমাকে সাহায্য করছে—ডাকতে পারলে চির তরুণ ছাত্ররা আজও সাড়া দিতে পারে মঙ্গল কর্মে আমরা তাদের সম্মান দিতে পারিনে বলে আজ এমন ট্র্যাজেডি।

প্রশ্ন—বই সাজাবার এতো তাড়া কেন? স্যাডলার কমিশনের সদস্যগণ কলেজ দেখতে আসছেন যে। সকালেই অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু এসে আমায় শুধুচ্ছেন, 'প্রভাত হবে তো?' আমি তাঁকে বললাম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ঠিক সব হয়ে যাবে। এগারোটায় ঘরে ঢুকে কেউ বুঝতে পারলো না, আজ সকালেও বই ছড়ানো ছিল মেঝেতে। তাঁরা আসবেন একটু পরেই।

এখানে স্যাডলার কমিশন ব্যাপারটা কি, তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই কমিশন বড়লাটের নির্দেশমতো নিযুক্ত হয়; সেকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝাতো পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম এমন কি বর্মা দেশও; তখন পশ্চিমবঙ্গে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়নি। এই সমস্যা ছাড়াও আভ্যন্তরীণ সমস্যা কিছু কম ছিল না। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র সমস্যা—এই সব তদারক করে প্রতিবেদন দেবার জন্য এই কমিশনের নিয়োগ। কমিশনের সভাপতি বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাডলার। সদস্যদের মধ্যে একমাত্র বাঙালী সদস্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। অন্য ভারতীয় সদস্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদ। অবশিষ্ট সবাই বৃটিশ। বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হর্নওয়েল সাহেব আর ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব। সিটি কলেজ পরিদর্শনে আসেন মাইকেল স্যাডলার, হর্নওয়েল সাহেব ও স্যার আশুতোষ। লাইব্রেরি পরিদর্শনে করতে এলেন এঁরা —বোধ হয় হর্নওয়েল সাহেব আমাকে লাইব্রেরি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করে প্রশ্ন করেন, তাঁর প্রশ্নের অর্থ ছিল—ছাত্ররা বই চুরি করে কিনা, সে বিষয়ে আমার মত জানা। তখন খোলা শেলফ (open shelf) পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। কমিশন চলে গেলে হেরম্ববাবু আমার কাছে এসে শুধোলেন, "কমিশন তোমার সঙ্গে এতো কী কথা বলছিলেন?" আমি বললাম, তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন আমাদের ছেলেরা বই চুরি করে কিনা। আমি বলেছি, "আমাদের তদারকের

ভালো রকমের ব্যবস্থা আছে। আমার চোখে কখনো চুরির ব্যাপার পড়েনি।' হেরম্ববাবু শুনে খুশি হলেন।

আমার প্রশ্নকর্তা হর্নওয়েল সাহেব কলকাতা সরকারী বেসরকারী কলেজের অনেক কেলেঙ্কারির কথা জানতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব বিলাত থেকে এসে কলেজে open shelf system চালু করেন কিছুটা। সদ্য প্রকাশিত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা এসেছে ইণ্ডিয়া পেপার সংস্করণ, এই গ্রন্থ ও এ জাতীয় গ্রন্থ তিনি খোলা শেলফে রাখেন, কিন্তু দেখা গেল ছাত্ররা খোলা শেলফের মর্যাদা রাখতে পারেনি। ছবি, প্রবন্ধ কেটে নিয়েছে কারা।

আমার দুঃসাহস, স্যাডলার কমিশনের হাতে দেবার জন্য আমি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটা বড় রকম স্মারকপত্র স্যার আশুতোষের হাতে সমর্পণ করি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করেছিলাম—কি ভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা যায়, জিজ্ঞাসু গবেষকদের প্রশ্নের উত্তর দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য একটা 'ব্যুরো' থাকা দরকার ইত্যাদি। বহু বৎসর পরে স্যার আশুতোষের লাইব্রেরি ও কাগজপত্রের মধ্য হতে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে সেই স্মারকলিপি পাওয়া যায়—আমাকে সেটি পাঠিয়ে দেন ঐ বিভাগের জনৈক কর্মী। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তারপর পড়ে দেখি গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অনেক বই পত্রিকা পড়ে বহু তথ্য দিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম।

সিটি কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকের কথা এখনো মনে আছে তাঁরা যে এককালে বাংলা দেশের তরুণদের মনকে জ্ঞানোজ্জ্বল করেছিলেন, আজ সে কথা সুবিদিত নয়। আজ ছাত্র-অধ্যাপকের যে সম্বন্ধ তাতে জ্ঞানদানের কথা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—Generations gap। যাই হোক তবুও তাঁদের স্মরণ করছি। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র পড়াতেন ইংরেজি; তিনি যখন অনার্স ক্লাস পড়াতেন, তখন আমাদের বেশ সজাগ থাকতে হতো—কখন ক্লাস থেকে কী চেয়ে বসেন! প্রায়ই Oxford English Dictionary মূলটা চেয়ে পাঠাতেন—এই অভিধানে প্রতিটি শব্দের ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তনের উদাহরণ আছে, হেরম্ববাবু ছাত্রদের সম্মুখে এই সব তথ্য তুলে ধরতেন। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানের ইতিহাস এখানে বলি—কারণ আজ আমরা এই বিরাট অভিধানের concise সংস্করণ অথবা pocket সংস্করণ সর্বদাই ব্যবহার করে থাকি। জন্ মারে এই কাজ শুরু করেন। গল্প আছে—ইংরেজি সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্বের শব্দ ও উদাহরণ তিনি পাচ্ছেন জনৈক ভদ্রের নিকট থেকে।

তিনি লোকটির পাণ্ডিত্য দেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন—দেখেন সেটি একটি উন্মাদাশ্রম—লোকটির ওই-ই নেশা। বইয়ের খসড়া হয়ে গেলে মুদ্রণ নিয়ে হলো সমস্যা, তখন ক্লেরনডন প্রেসের মালিক সাহস করে এগিয়ে এলেন —Oxford English Dictionary বহু খণ্ডে বহু বৎসর ধরে প্রকাশিত হলো, ব্রিটিশ সরকার মারেকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলাদেশের দুইজনের কথা মনে হচ্ছে—তারানাথ বাচস্পতির সংস্কৃত অভিধান ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ।

সেকালে কী অদ্ভুত ধরনের বই যে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য করতেন তা আজকাল কল্পনারও বাইরে। মনে পড়ছে একদিন অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ আমার কাছে এলেন, অনার্সের একটা বই নিয়ে—বইটার লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক, রাজনীতিক জেমস ব্রাইস্। তিনি তাঁর Holy Roman Empire বই লিখে অমর হয়েছেন, তাঁর American Democracy গ্রন্থও সুপরিচিত। কিন্তু যে বই অনার্সের পাঠ্য হয়েছে—Studies in contemporary Biography (1903) তার কথা আজ কেউ জানে না। সেই বইয়ে বিংশ শতকের গোড়ায় বা উনবিংশ শতকের শেষদিকে সমকালীন নামী ব্যক্তিদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা-গ্রন্থ, অনেকেই বিস্মৃত। সেই রকম কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলেন অধ্যাপক গুহ। আমাদের লাইব্রেরীতে এমন কোনো পুস্তক পেলাম না, যার মধ্যে এই সব সমসাময়িক তথ্য জানতে পারা যায়। ভেবে অবাক হই, এ-বই নির্বাচন করেছিলেন কারা? বাঙালী ছাত্রদের পক্ষে এই সব সমকালীন অকিঞ্চিৎকরদের জীবনী জানা একান্ত দরকার। বোধ হয় প্রকাশকের দালালদের অনুরোধেই বা উপরোধেই এটি ঘটেছিল।

কয়েক বৎসর পর অনুরূপ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ম্যাট্রিক পাস করে সেকালে ছাত্রদের ইন্টারমিডিয়েট আর্টস-এ পড়তে হতো গ্রীস ও রোমের ইতিহাস। Bury নামকরা ঐতিহাসিক—তাঁর গ্রীক ইতিহাস খুবই ভাল বই, কিন্তু যারা ম্যাট্রিক পাস করে এসে ইতিহাস পড়বে তাদের পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত, তবুও পাঠ্য ছিল সে বই, তবে ছাত্ররা পড়তো লাবণ্য মুখার্জির নোট বই। মাঝে আমেরিকান লেখক Brestead-এর Ancient world পাঠ্য হয়। যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি চিত্রাদি শোভিত। ছাত্রদের প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা হতো—গ্রীস্-রোম থাকতো স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু এক বৎসর পরে সে বই বাতিল হয়ে গেল—Bury ফিরে গেল তার পুরোনো স্থানে। Brestead-এর বই নাকচ করার কারণ বোধ হয় কলেজের

অধ্যাপকগণের নূতন করে পড়াশুনায় অনিচ্ছা। পুরাতন নোট ক্লাসে বৎসরের পর বৎসর ডিক্টেড করে এসেছেন, সে অভ্যাস ছাড়তে নারাজ। আর বৃটিশ প্রকাশকের অন্তঃটিপুনি ছিল কিনা জানি না—টেক্সট বুক সব সময়ে গুণ দেখে তো নির্বাচিত হয় না, একথা তো সর্বজনবিদিত।

লাইব্রেরি ছিল তেতলায়, একদিন কী কাজে দোতলায় অধ্যাপকদের ঘরে গিয়েছি। এমন সময়ে আমার সহকারী যুবকটি এসে একটা চিরকুট দিয়ে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল এই বইটি চাইছেন, কী বই বুঝতে পারছি নে!' আমি চিরকুট দেখেই বুঝলাম, তবুও কৌতুক করবার জন্য পাশে ইংরেজির এক তরুণ অধ্যাপককে চিরকুটটি দিয়ে শুধোলাম, 'বলুন তো অধ্যক্ষ কি বই চাইছেন?' লেখা আছে Trans. of Juv.। কে বুঝবে? আমি বললাম হেরম্ববাবু চাইছেন Juvenal-এর Translation. তারই সংক্ষিপ্ত রূপ হয়েছে Trans. of Juv.; জুভেনাল লাতিন ভাষার ব্যঙ্গ-নাট্যকার ও সাহিত্যিক—তারই অনুবাদ চাইছেন। আমি সহকারীকে বইয়ের নম্বরটা বলে দিলাম—ডিউই-এর দশমিক পদ্ধতিতে বর্গীত বলে সহজেই নম্বরটা বলে দিতে পারলাম।

একদিন অনার্সের একটি ছাত্র এসে Wordsworth-এর গ্রন্থাবলী চাইলো। বইটা বেয়ারা এনে দিল। কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছাত্রটি বইটা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী খুঁজছো?' বললে, 'অধ্যাপক Wordsworth-এর কাব্য থেকে একটা পংক্তি বললেন, সেটা খুঁজছি।' আমি বললাম, 'খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খোঁজা হচ্ছে যে!' এই বলে Concordanceটা এনে সহজেই একটা শব্দ দিয়ে পংক্তিটি বের করে তার সামনে ধরলাম। সে খুব খুশি হয়ে টুকে নিয়ে চলে গেল। Concordance ব্যবহার অনেক তরুণ শিক্ষকরাও জানতেন না। ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে এই সব কারণে আমার image ভালই হয়ে উঠেছিল।

অর্থনীতির অধ্যাপক সরোজ মিত্র ব্যারিস্টার, আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুধীর মিত্রের দাদা, মৈমনসিংহে বাড়ি; তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁকে অর্থনীতির ছাত্রদের নিয়ে সরজমিনে পারিপার্শ্বিকে অর্থনৈতিক অবস্থা তদারকির জন্য একটা সভা স্থাপনের প্রস্তাব করি। ছাত্রদের নিয়ে সভা হলো, ছাত্ররা আমাকে তার সেক্রেটারি করতে চাইলে, আমি অস্বীকার করি ও সরোজবাবুকে ঐ পদ দিতে বলি। কলেজের পিছনে ছিল বস্তি, সেই বস্তিতে যাই ও লোকদের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহে ব্রতী হই। সেখানে ছিল কতকগুলি মুচির বাস। কিছুদিন আগে পড়েছিলাম, পাটনার ছাত্ররা 'চাণক্য সোসাইটি' করেছিল এই উদ্দেশ্যে।

ছাত্র অধ্যাপকদের কাছে নানা কারণে আমার image বেড়ে যায়—জিজ্ঞাসার জবাব পায় তো সর্বদাই। এ সময়ে Modern Review পত্রিকায় আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে আরও খানিকটা মান বাড়লো, কারণ সেকালের মডার্ন রিভিউ-এর নাম ছিল দেশ-বিদেশে—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় চলতো। প্রবন্ধগুলি লিখি নানান পত্র-পত্রিকা, সরকারী প্রতিবেদনাদি পড়ার পর। এই সময় থেকে 'ভারত পরিচয়' গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা মনে ঘুরছে—তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি, আর কাকে দিয়ে কোন্ প্রবন্ধটা লেখাবো তা নিয়ে চলেছে আলোচনা বন্ধুদের সঙ্গে।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় কত বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তা আজ দেখে নিজেই বিস্মিত হচ্ছি—যেমন Railways and Indians and Anglo-Indians, Leprosy in India, Labour Problem in Bengal, Labour Problem in India, Pension System in Schools। পূর্বেই বলেছি, তথ্যাদি সংগ্রহ করতাম নানা রিপোর্ট পড়ে।

সিটি কলেজের তৎকালের অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ হচ্ছে। ইংরেজি বিভাগে হেরম্ববাবুর কথা তো পূর্বেই বলেছি। তিনি ছাড়া ছিলেন ব্রজসুন্দর রায়, রজনীকান্ত গুহ—তরুণদের কথা মনে নেই। ব্রজসুন্দরবাবু ছিলেন রংপুর ন্যাশানাল স্কুলের স্থাপয়িতা ন্যাশানালিস্ট। সেসব বিদ্যালয় উঠে গেলে, ব্রজসুন্দর সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। যেমন পেয়েছিলেন সতীশ চাটুজ্যে, রজনী গুহ। ব্রজসুন্দরের চেহারা আদৌ সুন্দর ছিল না। ইংরেজি উচ্চারণও সুশ্রাব্য নয়, কিন্তু পাণ্ডিত্য ছিল অতি গভীর—অনার্সের ভালো ছাত্ররা তাঁর অধ্যাপনায় মুগ্ধ হতো। রজনী গুহ ছিলেন লাতিন গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর সোক্রাটিসের জীবনীতে উপদেশ এবং প্লাতোর রচনার বাংলা অনুবাদ তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর স্থান দিয়েছে। তিনি মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণ, যা জার্মান পণ্ডিত শোয়েনবাক্ নানা গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে সম্পাদন করেছিলেন এবং লাতিন ভাষায় তার ভূমিকা লিখেছিলেন তাও অনুবাদ করেন রজনীকান্ত। মোট কথা অধ্যাপনা করতে করতেও কাজ করা যায়, তার প্রমাণ রেখে গেছেন রজনীকান্ত। রজনীবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, প্রমাণ পাই যখন সিটি কলেজ ছেড়ে চলে আসি।

কলেজের অনেকেরই কথা মনে পড়ছে যাঁরা আজ বিস্মৃত কিন্তু তাঁদের সময় তাঁরা শিক্ষাজগতে ছাত্রসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। উপেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ছিলেন

সংস্কৃতের অধ্যাপক। প্রায়ই দেখতাম আপনমনে পড়াশুনা করছেন ; উপেন্দ্রবাবু বিস্মৃত তবে তাঁর পুত্র অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় সাহিত্যে সুপরিচিত।

পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন জিতেন সেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো চেহারা, সত্যই সংস্কৃতজ্ঞ, নিষ্ঠাবান হিন্দু। রোজ প্রাতে গঙ্গাস্নান করে আসতেন। ছাত্রবৎসল সহৃদয়। পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সাদাসিদে, ধুতি একটা সার্ট কি পাঞ্জাবি, তার উপর একখানা চাদর, পায়ে কেড্‌স জুতো, কোনোদিন সাজগোজ করতে দেখিনি।

রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন প্রিয়দারঞ্জন রায়। ইনি এখন অতিবৃদ্ধ, আমার থেকেও, এখনো জীবিত। তাঁকে বিশেষভাবে মনে করার কারণটা বলছি। গত পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন মেলায় কলকাতা থেকে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউশন সংস্থার কর্মীরা তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে আসেন ; তাঁরা আমায় একখানি বই উপহার দিয়ে যান—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাপাঠ। বইটি বহু দশক পরে দেখলাম—পুনর্মুদ্রিত। খুলে দেখি বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন প্রিয়দারঞ্জন। ভূমিকাটি পড়ে বিস্মিত হলাম—কী গভীরভাবে গীতার মর্মার্থে প্রবেশ করেছেন দেখে। তাঁকে পত্র দিই—জবাব পাই—সহি তার। যৌবনে রসায়নাগারে কাজ করবার সময়ে এক বিস্ফোরণে একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। চিরকাল এক চক্ষু নিয়ে কাজ করে যান এবং তাঁর প্রতিভা একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তিনি পালিত অধ্যাপক পদ পান। তাঁর শিক্ষা-গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বহু তথ্যাদি দিয়ে প্রকাশ করেন। বইটা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রসায়ন বিভাগের তরুণ অধ্যাপক, বোধ হয় নাম অমর পালিত, তাঁর কথা মনে হচ্ছে অন্য সূত্রে। পালিত ও তাঁর এক বন্ধু বোধ হয় শরৎ ঘোষ—মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক—এঁরা 'নির্মলিন' নামে কাপড়কাচা সাবান বের করে খুবই সুনাম অর্জন করেন—সানলাইটের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। এই সংস্থার অন্তরালে ছিলেন মেট্রোপলিটান কলেজের আর একজন অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকার, সবাই এঁরা আজ বিস্মৃত। আজ 'নির্মলিন'-এর কথা লোকে ভুলে গেছে। মনে হচ্ছে পালিতের অকালমৃত্যু ও নানা আর্থিক অভাবহেতু 'নির্মলিন' কারখানা বন্ধ হয়ে লিকিউডেটরদের হাতে যায়। বহুকাল পরে ট্রেনে একদিন এই লিকিউডেশন অফিসের এক কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয় ; তিনি বলেছিলেন 'নির্মলিন' কারখানা বাঁচাবার জন্ম আমরা কলকাতার বহু ধনী বাঙালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলাম, সকলেই দাঁও মারতে চান—অবশেষে অ-বাঙালীর হাতে চলে যায়।

দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ হীরালাল হালদার—হেগেলের উপর গ্রন্থ লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেন—আজ তিনি বিস্মৃত। তাঁর পুত্র সুধীন্দ্র হালদার ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পাস করে বঙ্গীয় সরকারের বহু উচ্চ পদ পান, কিন্তু জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারেননি—কী ট্র্যাজেডির মাঝে মৃত্যু হয়েছিল ভাবলেও দুঃখে মন ভরে যায়। ইনি বিবাহ করেছিলেন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যাকে। সুধীন্দ্র যখন বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন এঁদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তথায় গিয়েছিলেন। দর্শন বিভাগের অন্যান্যদের মধ্যে ফণীভূষণ চটোপাধ্যায়ের নাম মনে আছে। পি. বি. চ্যাটার্জির Ethics সেকালে ছাত্রমহলে খুবই পরিচিত ছিল। বহু সংস্করণ হয় এই গ্রন্থের। Ethics-এর অপর নাম Moral Philosophy ; প্রথম বাঙালী যিনি এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ লেখেন তিনি হচ্ছেন মোহিতচন্দ্র সেন, তিনিও এই সিটি কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন।

ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পরে তিনি স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন, ইনিও এককালে সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। আমি যখন লাইব্রেরিয়ান তখন মাঝে মাঝে এখানে ক্লাস নিতে আসতেন এবং তখন লাইব্রেরিতে তাঁকে দেখি। সেক্সপীয়ারের নাটকে বোধ হয় অতিপ্রাকৃত ঘটনাদি নিয়ে গবেষণা করে ডক্টর হন। হরেন্দ্রকুমারকে পরে নানাভাবে দেখেছি—শান্তিনিকেতনে গেছেন—বিশ্বভারতীর কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে—তখন তিনি কলেজ ইন্স্পেক্টর, পরে দেখেছি 'রাজ্যপাল' রূপে সেখানে। এই অবিস্মরণীয় মানুষটির যথাযোগ্য মর্যাদা কি আমরা দিচ্ছি? ইনি খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু মনেপ্রাণে ভারতীয়। স্বামী-স্ত্রীর (স্ত্রী ছিলেন স্কুল-ইন্সপেক্ট্রেস) সঞ্চিত অর্থ বহু লক্ষ টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গিয়েছেন, কিন্তু আজ তো কাগজপত্রে এঁদের স্মরণোৎসব হতে দেখিনে তো! কেন? জানিনে। শান্তিনিকেতনে যখন কলেজ-ইন্সপেক্টর হয়ে আসতেন তখন তাঁর কাছে কত কথা শুনতাম, হুঁকো টানতে টানতে গল্প করতেন। কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাই আমেরিকায় Weight Lifting করে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা জানতে পেরে এখানে প্রবর্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে আমেরিকায় পত্র লিখে জানতে পারেন, যিনি এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি আর তা সমর্থন করছেন না ; তিনি জানিয়েছেন যে জোর করে ভার উত্তোলন কতদিন করা যাবে, একটা বয়সে তো ছাড়তেই হবে। তখন স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙে যায়। তাই বললেন, তিনি weight lifting-কে সুস্থ ব্যায়াম বলে মনে করেন না। কথাটা ভাববার মতো ; এই

শ্রেণীর ব্যায়ামবীররা অধিকাংশই দীর্ঘজীবী হন না। মনে পড়ছে স্যান্‌ডো রামমূর্তি, গোবর, বিষ্ণু ঘোষ—কেউ তো জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁদের ব্যায়াম অভ্যাস অক্ষুণ্ণ রেখে দীর্ঘায়ু হননি। ভোজনবীরদের দেখেছি—প্রৌঢ়ে উপনীত হবার পূর্বেই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয়ে শীর্ণদেহ হয়েছে। ফুটবল যাঁরা খেলেন তাঁদের স্বাস্থ্য ও আয়ু নিয়ে কি কেউ গবেষণা করেছেন? কেউ যদি জানেন আমাকে জানালে সুখী হবো!

কলকাতায় যখন আছি সেই ১৯১৭ সালের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিষয়টি জোড়াসাঁকোর লালকুঠিতে 'বিচিত্রা' ক্লাবের জন্ম-কথা। আমরা যাকে আড্ডা বলি, ক্লাবকে ঠিক সেই শ্রেণীর সংস্থা বলতে পারিনে। স্বাভাবিক ভাবে কয়েকজন সাহিত্যিকের নিজ বিষয়ের আলোচনার আড্ডা। 'আড্ডা' শব্দের ভদ্র নাম নেই, আর 'ক্লাব' শব্দেরও বাংলা প্রতিশব্দ নেই—'আড্ডা' দেশজ আর 'ক্লাব' বিদেশীজাত শব্দ। তবে এখন 'ক্লাব'টা জাতির জীবনের অঙ্গ হয়েছে। গ্রামে, শহরে, পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবকে নানা রকম ভালো কাজে ব্রতী হতে দেখা যাচ্ছে। তবে কলকাতায় প্রথম সার্থক ক্লাব বলা যেতে পারে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ক্লাব।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ। ভারতীয় শিল্পকলার রসিক হ্যাভেল সাহেব ছিলেন অধ্যক্ষ। তিনি অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাধনা, কাজকর্ম দেখে তাঁকে নিযুক্ত করেন ভাইস-প্রিন্সিপাল। তারপর হ্যাভেল বিদায় নিয়ে গেলে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন পার্সি ব্রাউন সাহেব। তিনি বিপরীত মেজাজের লোক। তাই বনিবনাই হলো না অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে—তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। তখন তাঁর পাশে এসে জুটলেন তরুণ শিল্পীর দল—নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলি প্রভৃতি কয়েকজন। মুকুল দে বিদেশ থেকে ফিরেছেন 'এচিং' শিখে—তিনিও এলেন। ছাত্রছাত্রী জুটলো—'বিচিত্রা'র পত্তন হলো। পাশাপাশি শুরু হলো সাহিত্যাদি আলোচনার ব্যবস্থা। এ কাজে সহায়তার জন্য এলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী—তখন তিনি কলিকাতাবাসী, শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে কলকাতায় আছেন। আর এলেন আশ্রমের একজন প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কৈশোরে ন্যাশানাল কলেজে পড়তে পড়তে আশ্রমে যান শিক্ষক হয়ে। তারপর একদিন আমি যেজন্য আশ্রম ছাড়ি—সে সমস্যা তাঁরও হয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকায় উন্নতির পথ দেখলেন রুদ্ধ। তাই কলকাতায় ফিরে এসে আই. এ.

বি. এ. পাস করে সরকারী অফিসে কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু কবির প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা পূর্ববৎ ছিল—তাই 'বিচিত্রা'র শিক্ষাব্যবস্থায় এসে জুটলেন। মোট কথা 'বিচিত্রা' হয়ে উঠলো সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি চর্চার কেন্দ্র। প্রসঙ্গক্রমে বলি, কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় এই সময়ে Four Arts Society স্থাপিত হয় তরুণদের প্রচেষ্টায়। সে-সবের খবর রাখতাম না।

'বিচিত্রা' জমে উঠছে। জমে উঠবার বিশেষ কারণ এখানকার লাইব্রেরী। গগনবাবুদের বিরাট গ্রন্থাগার লালবাড়িতে এলো—সদস্যদের জন্য খুলে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-সংগ্রহ যুক্ত হলো এর সঙ্গে। গগনেন্দ্রনাথদের সংগ্রহে বিশেষ ভাবে আধুনিক, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গ্রন্থাদি ছিল। একথা খুব কম লোকেই জানেন যে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ তিন ভাই ছিলেন বড় পড়ুয়া; দেশ-বিদেশের সাহিত্য-গ্রন্থ কিনতেন ও পড়তেন। আমার উপর ভার পড়লো বইগুলিকে বর্গীত করা। আমাকে সাহায্য করতে এলেন বীরেশ্বর নাগ, যিনি পূর্বে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বীরেশ্বরের বাড়ি ছিল বরিশাল, এঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যেশ্বর নাগ ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনৈক শিক্ষক। এখানে একটা কথা বলি—বরিশালের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বোধ হয় একটু বেশী মমতা ছিল—সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন বরিশালের। তারপর শরৎ-কুমার রায়, সত্যেশ্বর নাগ, বীরেশ্বর নাগ প্রভৃতি অনেকেই আসেন বরিশাল থেকে। তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথও ঐ জেলার লোক। সে বরিশাল আজ কোথাও নেই—মানুষের স্মৃতির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমি প্রতিদিন প্রাতে সাড়ে ছয়টার মধ্যে জোড়াসাঁকোয় হাজির হই। ঘণ্টা ছুই-আড়াই কাজ করে সাড়ে ন'টার মধ্যে বাসায় ফিরে স্নানআহার সেরে দশটার মধ্যে কলেজে হাজির হয়েছি। সকালে বাসা থেকে বের হয়ে সব থেকে সোজা পথ যা গলিঘুঁজি বস্তির ভিতর দিয়ে গিয়েছে সেই পথ ধরে যাই—বড় রাস্তা দিয়ে যেতে সময় বেশি লাগবে যে। এসেই কাজ শুরু কার—অর্থাৎ বই নামিয়ে বিষয় অনুযায়ী সাজাই। আসবার পরই পাঁচ নম্বর বাড়ির জনৈক ভৃত্য এক পেয়ালা চা নিয়ে হাজির হতো—অবশ্যই তা কর্তাদের নির্দেশ-মতো। কিন্তু বড়লোকের বাড়ির ভৃত্যরা জানে মজুরখাটা বাবুদের কতোটা সম্মান দিতে হবে। আসলে বড়লোকদের বাড়িতে কেরানী ও চাকরের তারতম্য ছিল বেতনে, মান-মর্যাদায় তারা কর্তাদের চোখে একই গোষ্ঠীভুক্ত। জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে আসবার পূর্বে শিলাইদহে জমিদারি সেরেস্তার কাজ করতেন, তাঁর বিজ্ঞান ও গণিত সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে রবীন্দ্রনাথ

তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে গণিত শেখাবার জন্ম তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন গৃহ-বিস্তালয়ে। জগদানন্দ তাঁর পুত্রের বয়সী মনিবপুত্রের শিক্ষক হলেও, তাঁকে সর্বদা 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে কথা বলতেন—তবে রথীন্দ্রনাথ জগদানন্দকে চিরকাল গুরুর সম্মান দিয়েছিলেন। পূর্বে বলেছি, নন্দলাল প্রমুখরা বিচিত্রা ভবনে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে কাজ করতেন, বৃত্তি পেতেন। একদিন ঐ বাড়ির জনৈক বালকপুত্র নন্দলালবাবুকে 'নন্দলাল' 'নন্দলাল' বলে ডাকছিলেন; অবনীন্দ্রনাথের কানে যেতে তিনি ডেকে তাঁকে বললেন, 'নন্দলালকে কি তুমি জন্মাতে দেখেছ যে তুমি তাঁর নাম ধরে ডাকছো?' কালে এই নাক-উঁচু ভাব কোথায় গেল! কোথায় সে অভিজাতদের বৈশিষ্ট্য! আজ পাঁচ নম্বর বাড়ি নাই। ছয় নম্বর বাড়িতে বসেছে এক সমস্যাসংকুল বিশ্ববিস্তালয়। কোথায় গেল সেই জোড়াসাঁকোর ঘরবাড়ি!

একদিন জোড়াসাঁকোয় যাবার পথে গলির মধ্যে একটা বস্তিবাড়ির ভিতরে খাটিয়ায় শায়িত এক মৃতদেহ দেখি,—মনে হলো যুবতী—দুই-একজন পুরুষ ঘোরাঘুরি করছে, বাড়ির ভিতর কোনো কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে না। বুঝলাম কোনো অবাঞ্ছিত বিধবার জীবনান্ত হয়েছে। আর একদিনের দৃশ্য। সেদিন যাচ্ছি মুক্তারামবাবু স্ট্রীট দিয়ে; এক হিন্দুস্থানী রমণী এক মৃত শিশু কোলে করে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে—তার সঙ্গে কেউ নেই মনে হলো। বিচিত্র জগৎ। কোনো মুসলমান রমণী কি ওরকম অসহায় ভাবে তার শিশুকে নিয়ে কবরস্থানে যেতো? কখনোই না।

পাঁচ নম্বরের সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সেই গৃহের দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় মাঝে মাঝে যেতাম; দেখতাম তিন ভাই পাশাপাশি বসে—সবারই পাশে গুড়গুড়ি; নল হাতে টানছেন মাঝে মাঝে। সমরেন্দ্রনাথ পড়ছেন বই বা খবরের কাগজ; অবনীন্দ্র-নাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন। গগনেন্দ্রনাথের কয়েকটা ছবির কথা মনে আছে। এক পশ্চিমা পুলিস দুটি কৃশ অর্ধনগ্ন বালক কোনো ধনীর বাগান থেকে কটা আম চুরি করেছে, সেই অপরাধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায়। আর একটি ছবি—বৃন্দাবনে হনুমানের উপদ্রবে ঐ প্রাণী মারার কথা হচ্ছে—এই সংবাদ শুনে এক মহিলা মাছ কাটতে কাটতে বলে উঠছেন, বৃন্দাবনে জীবহত্যা! আর একটি ছবি—স্বামী রুগ্ন, সর্বাঙ্গে তাগা, মাদুলি—উদর, প্লীহা যকৃতে স্ফীত, আহারাদি সম্বন্ধে চিকিৎসকের নানা নিয়ম-নিষেধ—স্ত্রী ঘরে ঢুকে বলছেন, 'এটা খেয়ে ফেলো, কেউ দেখতে পাবে না।' এই রকম ছবি আঁকছেন—

আমাকে দেখিয়ে কেমন হচ্ছে তাও জানতে চাইতেন। এঁদের মধ্যে যে সৌজন্য দেখেছিলাম—তা আজও ভুলতে পারিনি।

বাড়িতে কর্তাদের ছেলেরা ঘুরে বেড়াতেন, আমার সঙ্গে কখনো কথা বলতেন না। তাঁরা আপনাদের কোন্ জগতে থাকতেন জানি না। তবে দুটি ছোট ছেলেকে দেখতাম ঘুরঘুর করতে—এরা অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল। আজ সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা নিশ্চিহ্ন। বাংলার বহু স্মৃতিজড়িত এই গৃহে কত গুণী-জ্ঞানী এসেছিলেন একদিন। একদিন এ বাড়ির অমূল্য আর্ট সংগ্রহ চলে গেল ধনী ঘরে আহমদাবাদে। বাঙালী তাদের কদর বুঝলো না।

রবীন্দ্রনাথ জাপান সফর শেষে দেশে ফিরলে বিচিত্রার সভা জমে উঠলো। সভা সন্ধ্যায় বসতো। নিয়মিত যেতাম, কোণে বসে থাকতাম, দেখতাম শুনতাম সব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মাঝে মাঝে দেখতাম এখানে। উদীয়মান সাহিত্যিকরা তাঁকে ঘিরে কি আলোচনা করতেন জানিনে, তবে একদিন শুনি কে যেন প্রশ্ন করছেন, 'আপনি 'গোরা' পড়েছেন ?' শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন,' '"গোরা" পড়েছি। চৌষট্টিবার—চৌষট্টিবার পড়েছি।' পরে যখন শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' বের হয়, তখন পড়ে মনে হয়েছিল তাঁর 'গোরা' পাঠ সার্থক হয়েছে। 'কমল' চরিত্রটি গোরার বিকৃত প্রতিধ্বনি। রেঙ্গুনে বৌদিকে বলি, কমল তো মাদিগোরা। বৌদি শরৎচন্দ্রের ভক্ত, আমার উপর খুব ক্ষেপে উঠলেন। এই সব সভার বিস্তারিত তথ্য সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

রবীন্দ্রনাথ জাপান, মার্কিন দেশ সফর করে দেশে ফিরলেন ১৯১৭ সালে মার্চ মাসের মাঝামাঝি। তখন বিচিত্রা ক্লাব জমজমাট। কবির জন্মোৎসব খুব জাঁকজমক করে হচ্ছে। নিমন্ত্রণ হয়েছে। সন্ধ্যায় লালকুঠি বা বিচিত্রা ক্লাবে উপস্থিত হলাম, আমার সঙ্গে আছেন জীবনময় রায়; জীবনময় আশ্রমের প্রাক্তন শিক্ষক, কবির খুবই প্রিয়। আমরা দোতলায় গিয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে আহারের স্থান নির্দিষ্ট—প্রত্যেকটি বসার স্থানে সদস্যদের নাম লেখা। আমরা দেখছি কোথায় আমাদের আসন। নাম দেখলাম না। এমন সময় জামাতা নগেন্দ্রনাথ এসে বললেন—"আপনাদের স্থান বারান্দায় হচ্ছে, নন্দলাল প্রভৃতিও সেখানে বসবেন।" আমি বললাম—"নগেনবাবু, খাওয়ার জন্য আসিনি। নন্দলালবাবুরা বিচিত্রার বেতন বা বৃত্তিভোগী, আমাদের সঙ্গে সে সম্বন্ধ নয়।" এই কথা বলেই আমরা দুজনে নিচে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ

এসে বাধা দিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভগ্নীপতি কিছু একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছেন। রথীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত কয়েকজনের নাম সরিয়ে ঘরের ভিতর আমাদের স্থান করে দিলেন। এরপর আর কোনো প্রতিবাদ করিনি।

পরদিন অর্থাৎ ২৬শে বৈশাখ প্রাতে হঠাৎ শুনি রথীন্দ্রনাথ আমাদের বাসায় তাঁর মোটরে করে এসেছেন। নীচে একটা এঁদো ঘর আছে, বৈঠকখানা। একটা তক্তপোশ, তার উপর একটা মাদুর। উপর থেকে এসে দেখি রথীন্দ্রনাথ সেখানে বসে। আমি যেতেই রথীন্দ্রনাথ আমার হাত ধরে বললেন—"প্রভাত, কাল বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছিল, কিছু মনে করো না।" আমি অবাক হলাম তার সৌজন্যে, বুঝলাম কৌলিক আভিজাত্য। পরে বিশ্বভারতীর নানা কর্মোপলক্ষে কত ঠোকাঠুকি হয়েছে, কিন্তু দেখেছি তাঁর সৌজন্য,—a sweet reasonableness!

এই সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, যা থেকে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। 'রবীন্দ্রজীবনী'র পাঠকরা জানেন কবি কি ভাবে সময়মতো ঠাকুর এস্টেট পার্টিশন করে নিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর জমি-দারির অংশ সুরেন ঠাকুরের জমিদারির সঙ্গে সহমৃতা হয়নি। আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রথীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন যুবক মিলে কলকাতায় বিরাট মোটর মেরামতি ও মোটর বিক্রয়াদির কারবার খোলেন 'ওয়েলিংটন মোটর ওয়ার্কস' নামে। বিদেশে কবি এ খবর পেয়ে খুশি হয়ে উৎসাহই দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন বঙ্কিম রায় দেশে ফিরে যোগ দিতে পারে।

বঙ্কিম রায় ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনৈক শিক্ষক। তিনি আমেরিকায় গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে ব্যবসায়ের কাগজপত্র সব দেখতে দেখতে বুঝলেন যে কারবারের মধ্যে ঘুণ ধরেছে, পাপ ঢুকেছে। কবি বুঝলেন এই সংস্থার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ যদি যুক্ত থাকেন, তবে তার সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত। তিনি তখনই রথীন্দ্রনাথকে এই ব্যবসার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে ফেলবার আদেশ দিলেন। রথীন্দ্রনাথ পিতার কথা শুনলেন। ভাগ্যি শুনেছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবসায়ের ভিতর এমন সব গলদ আবিষ্কৃত হলো, যাতে করে ও-বাড়ির এক যুবককে নিরুদ্দেশে যেতে হয়। কারবার লাটে উঠলো।

কলকাতায় ব্যবসা করার উপর যবনিকা পড়ে গেলে কবি বুঝলেন পুত্রকে অন্য পথে অন্য কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। পরবৎসরই শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর সূচনা হলে রথীন্দ্রনাথ পিতার কাজে যোগ দিলেন। তারপর পঁচিশ বৎসর নিরলসভাবে বিশ্বভারতীর সেবা করলেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ না

করে গেলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপলাভ করতে পারতো না। দুঃখের বিষয়, বিশ্বভারতীর কর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ রথীন্দ্রনাথ আজ শান্তিনিকেতনে বিস্মৃত। মনে হয় সোনার তরীর কবিতার 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই'।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ রাজনীতির দমকা হাওয়া কলকাতাকে উতলা করে তুললো। খুব সংক্ষেপে বিষয়টাকে বলি। প্রথম মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর চলছে। ভারতের লোকের আশা, যুদ্ধশেষে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে, ভারতবাসীরা পাবে স্বায়ত্তশাসন অধিকার। তার জন্য পশ্চিম ভারতে লোকমান্য টিলক ও দক্ষিণ ভারতে অ্যানি বেসাণ্ট আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। বোম্বাই সরকার টিলককে ধরে মোটা অঙ্কের মুচলেকায় সহি করিয়ে তাঁকে মূক করে দেয়, আর মাদ্রাজ সরকার অ্যানি বেসাণ্টকে অন্তরীণে আটক করে তাঁর আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়। কলকাতায় স্থির হলো এই অন্তরীণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, শিলচরের উকিল কংগ্রেসকর্মী কামিনী-কুমার চন্দ এবং আরো কারা মনে পড়ছে না। বিচিত্রা ভবনের একতলায় অর্থাৎ লাইব্রেরী ঘরে এই আলোচনা হয়। স্থির হলো কবি প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দেবেন। লিখলেন গান—'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'—দিনেন্দ্র-নাথ তাঁর দল নিয়ে গান করছেন, পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন নাটোরের জমিদার কবিবন্ধু জগদিন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'।

এখন প্রশ্ন, এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ কোথায় পড়বেন! টাউন হল পাওয়া যাবে না। কর্তৃপক্ষ বললেন, একটি প্রাদেশিক সরকারের কার্যকলাপের সমা-লোচনা অন্য প্রাদেশিক সরকার সমর্থন করতে পারে না—টাউন হল পাওয়া যাবে না। রথীবাবু আমায় নিয়ে মোটরে ঘুরছেন স্থানের সন্ধানে,—ধর্মতলা স্ট্রীটে একটা বিরাট শেড দেখা গেল, কিন্তু এত নোংরা যে সেখানে সভা হতে পারে না, লোকে বসবে কোথায়! রামমোহন লাইব্রেরী হল অল্পকাল পূর্বে নির্মিত হয়েছে। সেখানকার কর্মকর্তাদের প্রধানের নাম মনে হচ্ছে ধীরেন্দ্র-নাথ পাল, তাঁরই চেষ্টায় এই হল নির্মিত হয়েছিল। তিনি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়বার অনুমতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় প্রবন্ধ পাঠ করলেন, কিন্তু সেখানে কজন শ্রোতা বসতে পারে। আরও বড় স্থানের প্রয়োজন। তখন পারসি-বণিক ম্যাডান সাহেব তাঁর আলফ্রেড থিয়েটারগৃহ সভার জন্য দিতে স্বীকৃত হলেন। সে হলটি ছিল হ্যারিসন রোডের উপর কলেজ স্ট্রীটের কাছে, এখন তা সেটি প্রেক্ষাগৃহ বা সিনেমা হল হয়েছে।

কী জনতা! রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শোনবার জন্ম কী উন্মাদনা! আমি ভলাণ্টিয়ারি করছি, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে—ভিড় সামলাবে কে! রবীন্দ্রনাথের সেই দৃপ্ত ভাষণে শ্রোতাদের মন বেশ উত্তেজিত হচ্ছিল। যখন তিনি বৃটিশ সরকারের দুঃশাসনিক ব্যবহারের নিন্দা করছিলেন, তখন শ্রোতাদের কী হর্ষ-ধ্বনি! কিন্তু যখন নিজ সমাজের মধ্যে কর্তাদের অবিচারের কথা বলছেন, তখন শ্রোতাদের নীরবতা। তারা ইংরেজকে গাল দিয়ে বা ইংরেজের বিরুদ্ধে গাল শুনে খুশি—কিন্তু সমাজপতি ও ধর্মধুরন্ধরদের অত্যাচার শুনতে তারা প্রস্তুত নয়। সামাজিক ব্যাপারে তারা মূক, আর রাজনৈতিক ব্যাপারে মুখর। আজ ভাবি, অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের মনোভাবের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

সভার উত্তেজনা কাটলো। তারপর চললো কাগজে কাগজে খেউড়—সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথকে কদিন অন্য মূর্তিতে দেখতে পেলাম। বিচিত্রায় 'ডাকঘর' নাটক অভিনয় হবে, তারই সলাপরামর্শ ও রিহার্সালের আয়োজন চলছে। আমি প্রায় রোজই সন্ধ্যায় যাই, মহড়া দেখি, কবির নিত্যনূতন সংযোগ বিয়োগ চলছে, আর গগনেন্দ্রনাথ মঞ্চ পরিকল্পনায় মশগুল হয়ে আছেন।

ডাকঘর দেখতে যাই বৌদির বোনকে সঙ্গে নিয়ে। আর তাঁর সঙ্গে যান তাঁর কোনো বোন। সেকালে তরুণীদের নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো সমাজে নিন্দিত হতো। 'ডাকঘর' নাটক অভিনয় প্রথম দেখেছিলাম ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে—বোধ হয় 'মেরী কার্পেণ্টার হলে', ১৯১৭ সালের মে মাসে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুলু সেজেছিল ঠাকুরদা। আর অমলের ভূমিকায় নামে আশামুকুল নামে এক বালক। সেই আশামুকুলই বিচিত্রায় ডাকঘরে 'অমলে'র পার্ট নেয়। তার অভিনয়ে সকলেই মুগ্ধ। ফলে কবি তাকে আশ্রমের ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। পরে সে ডাক্তারী পাস করে এলাহাবাদে থাকে; এক-বার সেখানে তার সঙ্গে দেখা হয়। আজ সে নেই, আমিই তার স্মৃতি বহন করে এই কয় পংক্তি লিখলাম। আশামুকুল অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিল। অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সে যা লিখেছিল তা পড়লে তার মনের গভীরতাটুকু দেখতে পাই।

শ্রীমতী বেসাণ্ট মুক্তি পেলেন (১৯১৭) ডিসেম্বর মাসে। কলকাতায় কন্‌গ্রেসের সভা বসবে—প্রশ্ন উঠলো কে সভাপতি হবেন! মডারেট বা যাঁদের আখ্যা দেওয়া হতো 'খয়েরখাঁ'র দল, তাঁরা চান না বেসাণ্ট প্রেসিডেণ্ট হন।

কারণ তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক চিহ্নিত, অর্থাৎ রাজনৈতিক উগ্র মতামতের জন্য অন্তরায়িত। সুতরাং তাঁকে নেত্রী করলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের গোসা হবে এবং তাঁদের আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত নাও করতে পারেন। অপরদিকে তরুণ দল চাইছে অ্যানি বেসাণ্টকে—তারা তাঁকে প্রেসিডেণ্ট করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস কমিটি ভেঙে গেল—বহরমপুরের উকিল রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন সভাপতি, তরুণ দল রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে ব্যাপারটা বলে এবং তাঁকে কন্‌গ্রেস কমিটির সভাপতি করার প্রস্তাব পেশ করে। কবি বললেন, যদি কন্‌গ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি বেসাণ্টের নেতৃত্ব না মানতে চান, তখন তিনি সংগ্রামে নামবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সুবুদ্ধি হলো—তাঁরা বেসাণ্টকেই মেনে নিলেন। তা যদি না হতো, তবে দশ বৎসর পূর্বে সুরতনগরে যে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হতো কলকাতায়। মনে পড়ছে হাই কমাণ্ডের দুর্বুদ্ধির জন্য ফজলুল হকের কন্‌গ্রেসের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়নি—যার ফলে মুসলীম লীগ বাংলা দেশে প্রবল হয়ে ওঠে এবং যার শেষ পরিণতি হয় পার্টিশনে। যাই হোক, মিসেস বেসাণ্ট আগামী কন্‌গ্রেসের প্রেসিডেণ্ট স্থির হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আর নূতন দলের কর্তৃত্ব করার প্রয়োজন হলো না।

ডিসেম্বরের শেষদিকে কন্‌গ্রেস বসছে। দশ টাকা দিয়ে একখানা টিকিট কিনলাম। প্রথম দিনের টিকিটটা দিলাম বৌদির বোনকে কন্‌গ্রেস দেখবার জন্য। সেদিন রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনে তাঁর বিখ্যাত India's prayer পাঠ করেন। আমি এসব কথা শুনি বৌদির বোনেরই কাছ থেকে ও কাগজে পড়ি। তবে দ্বিতীয় দিন আমি নিজে যাই সভা দেখতে। দেখলাম মঞ্চে বসে মিসেস বেসাণ্ট ও তাঁর পাশে বসে মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীর জননী বোরখা পরে। এই মহিলা কেন এখানে—তার ইতিহাস একটু বললে বোধ হয় ভালো হয়—আজকালকার পাঠকরা তো সেকাল থেকে অনেক দূরে!

কন্‌গ্রেস প্রতিষ্ঠার পর প্রায় বিশ বৎসর পরে মুসলীম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালের শেষদিকে অর্থাৎ বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। সেদিন Two Nations মতবাদের জন্ম বলা যেতে পারে, যার চরম পরিণতি হলো চল্লিশ বৎসর পরে রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক নিধন যজ্ঞ এবং পাকিস্তানের জন্ম। কিন্তু 'ধর্ম' দিয়ে যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না তা প্রমাণিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মে। কিন্তু শেষ কথা কে বলবে?

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তুর্কী যোগ দিয়েছে জার্মানদের সঙ্গে অর্থাৎ বৃটিশের বিরুদ্ধে। ভারতের মুসলমানরা পড়লো মুশকিলে। মহম্মদ আলী এই সময়ে

কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন, যা সরকারের বিরুদ্ধে উসকানির নামান্তর। তাই তাঁকে ও তাঁর ভাই সৌকত আলীকে সরকার বাহাদুর অন্তরীণে আবদ্ধ করেন ১৯১৫ সালের মে মাসে। তুর্কীর ভবিষ্যৎ, আলী ভ্রাতৃযুগলের অন্তরীণ হওয়া, ভারতের নয়া সংবিধান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাগজপত্রে চলছে মসীবর্ধন। সেই সময়ে মাদ্রাজে মিসেস বেসাণ্ট হোমরুল লীগ গঠন করেন ও আন্দোলন শুরু করেন, যার ফলে তিনি ও তাঁর দুই সহকর্মীকে মাদ্রাজ সরকার অন্তরীণাবদ্ধ করেন। তারপর কী ঘটে সে কথা তো পূর্বেই বলেছি! সেদিন কন্‌গ্রেস মঞ্চে মিসেস বেসাণ্ট ও আলী জননীকে উপবিষ্ট দেখে লোকের মনে ভরসা হয়—বুঝিবা হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিরাকৃত হলো—এটা ১৯১৭ সালের শেষের ঘটনা। তারপর?

সবাই ভাবছে (wishful thinking) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিরাকৃত হয়েছে লখনৌ বৈঠকে। আসলে তা হয়নি। সভায় উপস্থিত কয়েকজন লোকের মনোমতো মতবাদ সভায় গৃহীত হয়। দেশমধ্যে কোনো সাড়া জাগেনি, কিন্তু মনের মিলন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হয়নি তা পরবর্তীকালের ইতিহাস রূঢ়ভাবে সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। আজ দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার সর্বত্র ধর্মই বা স্বয়ং ঈশ্বরই মাঝপথে দাঁড়িয়ে মানুষে মানুষে দুস্তর ভেদ বাড়িয়ে চলেছেন—শয়তানের কাছে আজ ভগবান পরাস্ত।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত